রূপকথা

বাংলা ও বাঙালির কথা বলে

উৎসব সংখ্যা ২০২১

পূবালী,2020

যুগপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চর্চায় ১৮ বছরের গবেষণালব্ধ গ্রন্থ

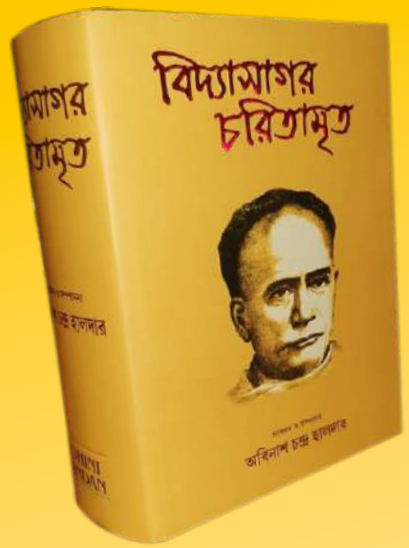

অবিনাশ চন্দ্র হালদারের

বিদ্যাসাগর চরিতামৃত

বহু দুষ্প্রাপ্য ছবি সহ

১০৮০ পৃ. | মূল্য-₹১২০০

বিশ্বনাথ কুণ্ডু-র কবিতা

Poetry Dot 6

(Picture Illustration by
French Poet Dominique de Miscault)

112 Page | ₹ 600/- $25

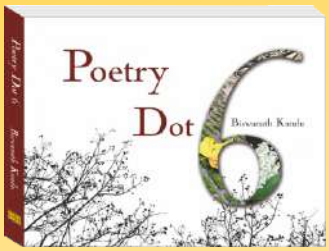

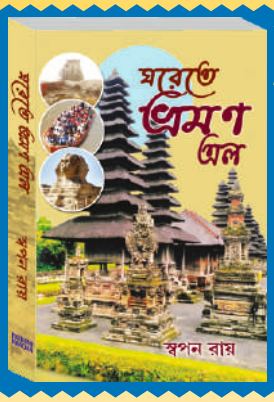

স্বপন রায়-এর ভ্রমণের গল্প

ঘরেতে ভ্রমণ অল

২৪৮ পৃষ্ঠা | ₹৩০০/-

বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দা পরিবারে নূতন জুটির আবির্ভাব

সত্য আর সিম্মির আত্মপ্রকাশ

৮৮ পৃষ্ঠা | ₹২০০/- আলাপন রায়চৌধুরী

ভাষা গবেষক নীতীশ বিশ্বাস সম্পাদিত অনন্য সাধারণ বই **ভাষা গণতন্ত্র** ₹৭০০/-

সোমনাথ ঘোষ-এর দুটি কাব্যগ্রন্থ **সন্ধ্যাবতীর কেশ** ₹২০০ ও **হে অশ্রু অলকানন্দা হও** ₹২০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে

সুবিমল সরকারের উপন্যাস
প্রেম ও পরিণতি

কবি ও ক্রিটিক তাপস বৈদ্য'র
কার্ণিভালইজম ও তপন বাগচীর কবিতা

Prof. Bela Bhattacharya's
SPREAD OF BUDDHISM AMONGST THE ASEAN REGION

ড. রীতা দে'র
ভাগবতের গল্প

মধুমিতা বেতাল-এর উপন্যাস
জঙ্গলিপি

মানস ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ
কাঁচা মাটি

বই প্রকাশের জন্য আগ্রহী ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করতে পারেন প্রকাশকের ঠিকানায়

প্রকাশক
রোহিণী নন্দন
১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০১২
৯২৩১৫০৮২৭৬ / ৮২৪০০৪৩১০৫

পরিবেশক -
দে বুক স্টোর (দীপুদা)
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩
(০৩৩) ২২৪১ ৩৩০১ / ৩৫৫৪ ৭২৫১

www.rohininandan.com

প্রথম বর্ষ শারদ সংখ্যা ২০২১

রূপকথা

বাংলা ও বাঙালির কথা বলে

প্রধান সম্পাদক
মানসকুমার ঠাকুর
নির্বাহী সম্পাদক
সৈকত হালদার
সম্পাদনা
রাই দাস
সহযোগী
মধুমিতা দাস
অক্ষরবিন্যাস
ইন্দ্রজিৎ, কুন্তল ও দেবাশিস
প্রচ্ছদ
পূবালী চ্যাটার্জী
পরিচালনা
মানসী রিসার্চ ফাউণ্ডেশন
www.manasiresearch.org
মুদ্রক
রোহিণী নন্দন
১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন
কলকাতা- ৭০০০১২
www.rohininandan.com

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৩
অন্য চোখে অন্য কথায় দুর্গাপুজো ৪
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ৬
হেমচন্দ্র ৭
উত্তরাধিকারের চোখে বিখ্যাত মনীষীরা ৯
উৎসব উদ্‌যাপন ১৬
বিশেষ রিপোর্ট ১৭
উদ্যোমী ১৮
নাট্যমঞ্চ ১৯
হৃদমাঝারে সহজ মা ২৫
নাটকের মাধ্যমে রাজনীতির কথা বলি ২৬
তারকার কথা ২৭
স্মরণে ৩২
গানের মাধ্যমে নিজের কথা বলতে চাই ৩৩
বাংলার হারানো খেলা ৩৫
পুজোয় বেড়ানোর সঙ্গী ওষুধ ৩৬

কবিতা—৩৭-৪৭

শীলা দাস, সুবিমল সরকার, সুজয় পাল, সুপ্রীতি দত্ত, মানসকুমার ঠাকুর, তনিমা সাহা, সুমন্ত চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল, শান্তনু কংসবণিক, ইন্দ্রজিৎ আইচ, তানিয়া, বর্ণালী, নারায়ণ নন্দী, কমলাকান্ত মল্লিক, শুভ্রাংশু শেখর পাত্র, প্রদীপ চন্দ্র, মৌপর্ণা চক্রবর্তী, প্রবীর মুখোপাধ্যায়, গীতা দাস, তনুশ্রী চক্রবর্তী, সন্দীপ, শুদ্ধসত্ত্ব, সন্দীপ, তাপস বৈদ্য (১০৯)

ছড়া—৪৮-৪৯

নিবন্ধ ও গল্প

প্রথম কবিতায় তাজ ৫০
একটি ভাষা ও লিপির অপমৃত্যু সবার লজ্জা ৫১
কুমুদ কুইল্যা ৫৩
ভাসান বেলায় ৫৮
একটি খুনের গল্প ৫৯
পুজোর খানা ৬১
অনলাইন ব্যবসা ৬২
অদম্য ইচ্ছাই জীবনকে জয়ের পথ দেখিয়েছে ৬৫
লিটল ম্যাগাজিনের যাত্রা কথা ৭০
অবহেলিত উচ্চারণ শাস্ত্রী নরেন বিশ্বাস ৭১-৭৯
নিষ্ঠুরতা একটি মানবিক বিপর্যয় ৮০ - ৮২

উপন্যাস

প্রেম ও পরিণতি ৮৩-১০৮

সম্পাদকীয়—

উপহারের ডালি নিয়ে রূপকথার শারদ সংখ্যা

বড়োই কঠিন সময়। মানুষের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। অসুররূপী এক অ সুখের দাপটে চারপাশের পরিস্থিতি অস্থির। এই টালমাটাল অবস্থার মধ্যেই মা দুর্গার আগমন। ভালো-মন্দ এই অন্তহীন আবর্তনের মধ্যেই বা আবর্তনের নিয়মেই শারদোৎসব দোরগোড়ায়। দীর্ঘ সময় ধরে এক দমবন্ধ করা পরিবেশে এই উৎসব যেন এক মুঠো হিমেল পরশ, ক্ষণিকের স্বস্তি। মানুষও দুঃখ ভুলে আনন্দের সলতে পাকাতে শুরু করেছে। হাজার গ্লানির মধ্যেও উৎসবের সজ্জায় বাঙালি নিজের সমস্ত সৌন্দর্য চেতনাকে উজাড় করে দিচ্ছে। সারা বছরের মালিন্যের পাশে শরতের এই আড়ম্বর হয়তো বিসদৃশ মনে হতে পারে। কিন্তু তাই বলে কি উৎসবযাপনকে দূরে সরিয়ে রাখা বাঞ্ছনীয়, একেবারেই নয়। কারণ, এর মধ্যেই নিহিত থাকে প্রাণের সুখ, এক অপার শান্তি। মা দুর্গার অস্তিত্বই সব গ্লানি, শোক, তাপ ভুলিয়ে দেয়।

এই পুজোর আবহে শারদীয়া সংখ্যা যেন বাঙালি সংস্কৃতির একটি অঙ্গ। তাই এই পুজোয় রূপকথা তার পাঠকদের কাছে তুলে ধরছে শারদ সংখ্যা। পুজোর ক'টা দিন যা সঙ্গী হবে। আমরা আন্তরিকতার অভাব রাখিনি। রূপকথা'র এই সংখ্যাকে মায়ের রূপের মতোই সাজিয়ে তোলা হয়েছে। বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার যেমন এই সংখ্যায় পাঠকদের মন জয় করার জন্য রাখা হয়েছে, তেমনই গুণীজনদের নিয়েও থাকছে বিশেষ লেখা। এছাড়া গুণগতমানের নিক থেকে বেশ কিছু মননশীল কবিতার পাশাপাশি কিছু অনবদ্য গল্পের ভাণ্ডারও রয়েছে। বাকি কথা না হয় তোলা থাক। আপনাদের সঙ্গে রূপকথার মেলবন্ধনই বাকি কথার হদিশ খুঁজে নিক। পাঠকদের মতামতের অপেক্ষায় থাকলাম।

রূপকথার মূল উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসার। বাংলা ভাষাকে জীবিকার ভাষায় পরিণত করা।

অন্য চোখে অন্য কথায় দুর্গাপুজো

সত্য নারায়ণ দাস

শারদ সংখ্যার লেখা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কারণ, এটা বাঙালির সেরা উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। দেবী দুর্গার আগমনের খুশিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। সবাই কিছু দিতে চায়, নিতে চায়, পেতে চায়। এবার এই পুজোর সূচনা নিয়ে কিছু কথা বলি। ছয় ঋতুর মধ্যে শরৎকালে দেবী দুর্গার বন্দনা করা হয়। শরৎকালেই কেন দেবীর বন্দনা! এর জন্য তো শাস্ত্রে বসন্তকাল নির্ধারিত রয়েছে। এর উত্তর অবশ্য আমরা সবাই জানি। রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধারের জন্য শরৎকালে দুর্গা বন্দনা করেন। যখন অপরাজেয় অসুরদ্বয় শুম্ভ ও নীশুম্ভ স্বর্গ অধিকার করতে উদ্যত হয়েছিল তখন দেবতাদের স্তুতির মাধ্যমে দেবী দুর্গার সৃষ্টি হয়।

এসব পুরাণের কথা। এবার আসি আধুনিক কথায়। প্রথমত, লক্ষ্যণীয় বিষয় হল দুর্গা কোনো নারীর গর্ভজাত কন্যা নয়। দেবীর অস্তিত্ব তৈরি হয় পুরুষ দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির প্রয়াসে। বিভিন্ন শক্তির সম্মিলিত শক্তি প্রবল পরাক্রমে সব বাধা উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। এর ব্যাখ্যা কী? কোনো একক ব্যক্তি তা সে যতই ক্ষমতাশালী হোক না কেন, যতক্ষণ সে একা কিছুই করতে পারে না। তবে ওই একক শক্তি যখন আরেও সমান পরিমাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির মিলিত প্রয়াসে এক সম্মিলিত প্রতিরোধ শক্তিতে পরিণত হয়, তখন তা কোনো কাজে সমর্থ হয়। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এমন অনেক রূপ দেখতে পাই যার সূত্র এই দুর্গা বন্দনার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেখি। তাই পুরাণে অনেক দেবতা অসুরের লড়াই হলেও ও অসুর পরাজিত হলেও, আজও আমরা দেবীর দুর্গার লড়াইকে এত প্রাধান্য দিই। দ্বিতীয়ত, আমরা কী দেখলাম? যখন-তখন দেবতাকে ডাকা বা উপাসনা করা। আধুনিক সভ্যতায় যাকে ডিস্টার্ব করা বলে তা হিন্দুধর্মেই সম্ভব। এটা একটা ভক্তের অধিকার। ভক্ত যখন ভক্তি দিয়ে দেবতাকে ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধে তখন তাঁর দেবতার ওপর অধিকার জন্মায়। দেবতাও অসহায়ভাবে ধরা দেন। এটা বেশি করে হিন্দু ধর্মে দেখা যায়। এখানে নিয়ম করে উপাসনা করা বা নমাজ পড়ার দরকার নেই। এই যে 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয় রে দেবতা' (রবীন্দ্রনাথ)। এই চিন্তাও দুর্গা পুজোর একটা দিক। আমাদের শক্তির প্রয়োজন হলেই বা অসহায় অনুভব করলেই সর্বপ্রথম মাকে ডাকি মনোবল বাড়ানোর জন্য। এবার একটা প্রশ্ন জাগে। সম্মিলিত পুরুষ শক্তি দিয়ে পুরুষ দেবতার সৃষ্টি হল না কেন? কেন এই সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ হতে একজন নারী শক্তির প্রয়োজন হল? বিশেষত, বিপক্ষে যখন মহাদেবের বরপ্রাপ্ত প্রবল শক্তির অসুর রয়েছে। পৌরাণিকরা বলেছেন, নারীর মোহময়ীরূপ, যৌবনের উষ্ণতা, কণ্ঠের কোমলতা, বাহুলতার পেলবতা, দৃষ্টির গভীর চঞ্চলতা, শরীরের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমা ঋষিগণের ধ্যান, রাক্ষসদের তপস্যা এমনকী দেবতার ধ্যান ভঙ্গ করেছে। সেই রূপকে দুর্গার মধ্যে দিয়ে আবাহন করা হয়েছে। আর এইভাবেই জগৎ সংসারের রক্ষক বিষ্ণু কোনওভাবে ঝুঁকি নিতে চাননি। তাই সম্মিলিত শক্তির প্রতীক একজন নারী। আজকে বিজ্ঞানীরা বলছেন, যা কিছু সৃষ্টি হয় তা একা পুরুষের দ্বারা হয় না। হয় পুরুষ ও নারীর মিলনে। তাই শেষ পর্যন্ত যে শক্তি অপরাজেয় অসুরকে নিধন করতে পেরেছিল তা ওই পুরুষ ও প্রকৃতির (নারী) মিলিত প্রয়াস। আর তাই দুর্গা শক্তি নারী শক্তিরূপে পূজিত।

এসব তত্ত্বকথা। ২০২১ সালে বসে আজকের দুর্গাপুজোয় আমরা কী দেখছি সেই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে। সত্যি বলতে, আজকের দুর্গাপুজো শুধু একটা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। যেখানে পুজো কথাটা বাদ গেছে। সরকারও দুর্গাপুজোকে ধর্ম পালনের চেয়ে শুধু হুল্লোড়ের জন্য প্রাধান্য দিতে চায়। কারণ এটাই হল অর্থনীতি। মানুষ বাইরের আড়ম্বর যেমন, পোশাকআশাক, খাওয়াদাওয়া, বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদিতে যত খরচ করবে তত সরকারের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। তাই ঠাকুর দেখার চেয়ে মণ্ডপ, আলোকসজ্জা দেখতে লোকে এত ভিড় করে। কোনও মতে ঠাকুরের দিকে একবার হাত তুলে নমস্কার

করে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়। সর্বজনীন পুজো আগের দিনে সত্যিকারের পুজো ছিল, এখন পুরোটাই ব্যবসা। কোন কোম্পানি কোন পুজো স্পনসর করছে, বাজেট কত সেই অনুযায়ী দর্শকরা ভিড় করেন। আর ব্যবসায়ী মস্তিষ্কের সর্বাধুনিক কৌশল হল নকল প্রতিযোগিতা। ছোটোবেলায় আমরা ঠাকুর দেখতে গিয়ে তার রূপ বিচার করতাম। দেখতাম মায়ের চোখ, শরীর রূপ কেমন। এসব দেখে বড়োরা বকতেন আর বলতেন সব ঠাকুর সমান। সব ঠাকুরই মা। আর মায়ের কোনো বিচার হয় না। আর এখন আমরা অর্থের বিনিময়ে মাকে রাস্তায় নামিয়েছি। মায়ের সব সন্তান সমান নয়। যে যার সামর্থ্য মত মায়ের আরাধনা করে। সেখানে এই সামর্থ্য বিচার হবে এটা ভাবা যায় না। এই বিচারের পুরস্কার নিয়ে সন্তানের কী নির্লজ্জ নাচানাচি। হায়!

এই রাজ্যে অবশ্যই এসব পালনের একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হল সাম্প্রদায়িকতা। দুর্গাপুজো হিন্দুদের সেরা পুজো হলেও সব ধর্মের মানুষ এই উৎসবে শামিল হন। ধর্ম যার যার নিজের কিন্তু উৎসব সবার। এবার অতিমারির সময়ও সবাই এগিয়ে এসেছেন। তবে এই যোগদানের ব্যাপার নিয়ে একটা হুজুক শুরু হয়েছে। প্রগতিশীলতার নামে যা শুরু হয়েছে তাতে ফায়দা তুলছে সরকার। এক্ষেত্রে বলা যায়, মহিলা পরিচালিত পুজোর কথা। এটা সবার জানা যে, চিরকাল মহিলারা পুরোহিতদের সঙ্গে কাজ করেন বা করেছেন। তাহলে মহিলা পরিচালিত বলতে বিশেষ কী আছে? শুধু চাঁদা তোলা, ঢাক বাজানো ছাড়া আর তেমন কিছু নতুনত্ব নেই। যে কাজে শারীরিক ক্ষমতা লাগে সেখানে অবশ্যই পুরুষদের ডাক পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞাপনে বড়ো করে প্রচার করা হয়, মহিলা দ্বারা পরিচালিত পুজো। আর একটা কথা শোনা যায়, প্রগতিশীল মহিলারা দুর্গাপুজোর উপাচারে একটি সামগ্রী বাদ দিয়েই পুরোহিত মশাইকে পুজো করতে বলছেন। সেটা হল পতিতাদের ঘরের মাটি। এতে মহিলাদের অপমান হয়। আর একটা বিষয় হল, বাংলার সংখ্যালঘুদের মধ্যে যাঁরা গরিষ্ঠ মানে মুসলিম যুব সমাজের পুজোয় অংশগ্রহণ। মনে রাখতে হবে আগের দিনে এই যুবকদের বাবা, ঠাকুরদা জমিদারবাড়িতে পুজোয় অংশ নিতেন। যেমন, ম্যারাপ বাঁধা, নারকেল ছাড়ানো, বেলকাঠ ভাঙা, পুজোরভোগটুকু বাদ দিয়ে ভুরিভোজের আয়োজনে ব্যস্ত থাকা, মণ্ডপ পরিষ্কারে অংশ নেওয়া। তাহলে এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু ইদানিং সরকারের তরফে ও প্রচার মাধ্যমে এই মহামিলনের বিষয়টি তুলে ধরা হচ্ছে।

এই প্রবন্ধের ইতি টানতে গেলে যেটা বলতে হয় যে, সংখ্যালঘুরা এখনও পুজো বা ঈশ্বর আরাধনাকে সর্বজনীন করতে পারেনি। নিজেদের একটা গণ্ডির মধ্যে আগলে রেখেছে। তাঁরা এটা প্রচার করে, আমরা এক ঈশ্বরবাদী, আমাদের একটাই ঈশ্বর। যা ব্রহ্ম ধর্মেরও মূল কথা। তবে হিন্দুরাও এক পরমেশ্বরে বিশ্বাসী। শুধু এই তেত্রিশ কোটি দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পুজো করে। নিজের কাছে ডাকে। এইভাবে ঈশ্বরবাদের আলোচনায় না ঢুকেও বলা যায়, এই দুর্গাপুজো হিন্দুধর্মের সর্বজনীনতাকে প্রতিষ্ঠা করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' ■

বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি

মমতা সরকার

'অন্তদীপ ভব', নিজেই নিজের দীপ হয়ে ওঠ। কীভাবে তা সম্ভব? বুদ্ধের নির্দেশিত পথে চললে তা সম্ভব। কারণ, অনেক ভিক্ষু ভিক্ষুণী এই পথে চলে বুদ্ধবাণীকে সার্থক করেছেন।

নিজের কালিমাকে দূর করে অলোকোজ্জ্বল করে তুলতে হবে। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি করতে হবে। তবে এটা বড়ো কঠিন কাজ। আমার মধ্যে কী কী কালিমা রয়েছে তাকে প্রথমে চিনতে হবে, বুঝতে হবে। সদাচার জীবনযাপন করে, নিজের মনকে একাগ্র ও শান্ত করে এটা করতে হবে। নিজের মনকে নিতান্ত রূপে নির্মল করতে পারলে তবেই আত্মশুদ্ধি সম্ভব।

জীবনে সবসময় দুটো জিনিস আমাদের ভীষণভাবে দ্বন্দ্বে ফেলে। তা হল, এটা আমার নেই বা চাই না। যখন কোনো কিছু চাই তা আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নিজের অবস্থান সব কিছুকে ভুলিয়ে দেয়। চাহিদার তীব্রতা খুব বেশি হওয়ার জন্য মানুষ চুরি, ডাকাতি, ব্যাভিচার ইত্যাদি দুষ্কর্ম করতে প্ররোচিত হয়। অর্থাৎ তৃষ্ণার কারণে মানুষ সদাচার ভুলে যায়। আর যখন আমি এটা চাই না তখন আমার দ্বেষ, বিতৃষ্ণা, বিরাগ জেগে উঠে রাগের সঞ্চার হয়। এই রাগ বাড়তে বাড়তে ঝগড়া, হাতাহাতি এমনকী খুনোখুনিতে পরিণত হয়। এই দু'টোর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হলে সদাচার জীবনযাপন করতে হবে। এই সদাচার জীবনযাপনের নাম 'শীল' পালন। মনকে একাগ্র ও শান্ত করাকে বলে 'সমাধি'। আর মনকে নিতান্তরূপে নির্মল করার নাম 'প্রজ্ঞা'। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা-এই তিন সোপান দিয়ে তৈরি হয় 'ধর্ম'। যিনি ধর্ম পালন করেন তাঁকেই বলা হয় ধার্মিক। যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধিকরণের পথে যত আশ্রয় নেবেন ততই তাঁর মধ্যে অসীম করুণা ও কৃতজ্ঞতা বোধ জাগ্রত হবে। তিনি মহৎ থেকে মহোত্তর হবেন। বুদ্ধদেব যদি দুঃখ মুক্তির পথ না দেখাতেন, আপামর মানুষের মুক্তির পথের প্রচার না করতেন তাহলে আমরা দুঃখমুক্তির উপায় খুঁজে পেতাম না। ধর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে সুখী জীবনযাপন করতে পারতাম না। এই কৃতজ্ঞতা বোধ থেকেই বুদ্ধের শরণ নিলাম। অন্যভাবে ধর্মের পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে আমরা দুঃখ থেকে মুক্ত হব। ধর্ম যদি না থাকত তাহলে হারিয়ে যেত বুদ্ধের দেখানো একমাত্র পথটি- যা বিমুক্তির দ্বারা প্রসারিত হয়েছে। ধর্মের শরণ নিয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো। সেই মতো সুদীর্ঘ জীবন গুরুশিষ্য পরম্পরায় বিশুদ্ধ রূপে বুদ্ধের শিক্ষাকে বা ধর্মকে রক্ষা করেছেন। তা নাহলে আজ আমরা এই সময়ে বুদ্ধের শিক্ষা থেকে কী পেলাম? এই সব প্রশ্ন যখন মনের মধ্যে জেগে ওঠে তখনই আমাদের মনে অসীম কৃতজ্ঞতাবোধের জন্ম হয়। তাই আমরা সহজ পথে বুদ্ধকে শরণ করতে পারি। বুদ্ধের শরণ মানে জ্ঞানীর, ধর্মের ও সত্যের শরণ। বুদ্ধদেব বলেছেন, আত্মশরণই শ্রেষ্ঠ শরণ। অর্থাৎ নিজের শরণ নিজেই নেবে। নিজের মধ্যে যতটুকু সৎ গুণ রয়েছে তার প্রতি শরণ নিতে হবে। এভাবেই যথার্থ কল্যাণ হবে।

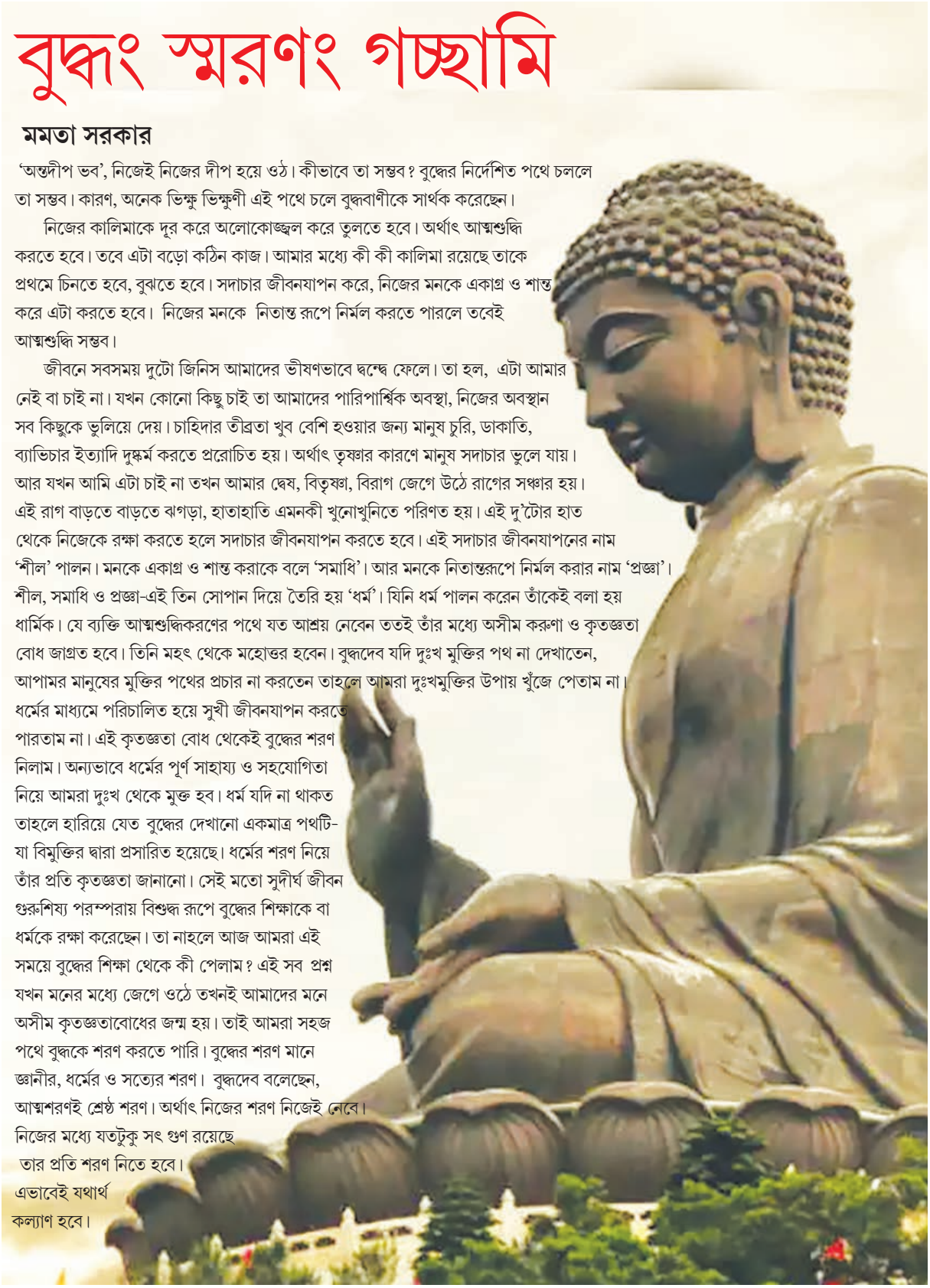

হেমচন্দ্র : এক বীরগাঁথা

হরিদাস তালুকদার

প্রখর রোদের দাবদাহে ক্লান্ত পুরুষ রমণীরা তরুচ্ছায়ে ঘেরা পাষাণ বেদিতে বিশ্রাম নিচ্ছিল। হঠাৎ দূরে হ্রেষা ধ্বনিতে সচকিত হয়ে দেখল একদল অশ্বারোহী তাদের নিকটতর হচ্ছে। দেখে মনে হল পাঠান সেনা। কাছে আসতেই চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন হল। অবাক বিস্ময়ে সকলে দেখল পাঠান সেনার সামনে যে দীর্ঘদেহী অশ্বারোহী ধাবমান, তিনি আর কেউ নন। তাদের অত্যন্ত আদরের হেমচন্দ্র।

আলোয়ার প্রদেশের এই অঞ্চলের বেশীরভাগ মানুষই মূলত বেনিয়া। হেমচন্দ্রের পিতাও তাই ছিলেন। পরিচিত স্বজনদের দেখে হেমচন্দ্র ঘাড়োর লাগাম টেনে লাফিয়ে নেমে পড়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠলেন। মধ্য তিরিশের যুবক হেমচন্দ্র প্রায় দশ বছর পর স্বদেশে ফিরেছেন। আত্মীয় বন্ধুদের আলিঙ্গনে, তাঁর দিল্লিবাস ও সমসাময়িক শাসনব্যবস্থা সকলই আলোচিত হতে হতে গ্রামের প্রান্তে পাঠান সেনারা তাঁবু ফেলল। পশ্চিমের মরুপ্রান্তরে সূর্যদেব বৈকালিক আলোয় অস্তাচলে যেতে হেমচন্দ্র স্বগৃহের উদ্দেশে গমন করলেন। পিতা যে অপেক্ষা করে আছেন।

কে এই হেমচন্দ্র? পাঠক জানেন কি? স্বপ্নসন্ধানী হেমচন্দ্র, ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন জাগানিয়া নায়ক হেমচন্দ। হিমু!

শেরশাহের মৃত্যুর পর পুত্র ইসলাম খান দিল্লির তখতে আসীন। পরাজিত মুঘল সম্রাট হুমায়ুন তখনও দিল্লির মসনদ পুনরুদ্ধারে পারস্য কান্দাহারে পরিকল্পনায় ব্যস্ত। সদ্য যুবা হেমচন্দ্র পৈতৃক ব্যবসায় তৃপ্ত না থেকে ভাগ্য অন্বেষণে দিল্লির পথে। কথায় বলে, ঈশ্বর সাহসীদের সঙ্গে সৌভাগ্যকে জুড়ে দেন। কীভাবে দিল্লীশ্বর ইসলাম খানের সঙ্গে হেমচন্দ্রের মোলাকাত, কখনইবা দিল্লির বাজারের জায়গীরদার হলেন তার খবর ইতিহাস দেয় না বটে, ইসলাম খানের শিশুপুত্রকে গুপ্তহত্যা করে লোভী আদিল খান যখন দিল্লির তখতে আসীন হলেন। তখন থেকেই বীর হেমচন্দ্রের আলোয়ার আসা। দিল্লি শাহীর টালমাটাল অবস্থান দেখে বাংলায় মহম্মদ খান, আগ্রায় ইব্রাহিম সুরি ও লাহোরে কায়ুম জঙ্গ নিজেদের স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করেন। এমনই এক সন্ধিক্ষণে অনন্যোপায় হয়ে সুলতান আদিল খান হিন্দু বীর হেমচন্দ্রের হাতে দিল্লি শাহীর প্রধানমন্ত্রীত্বের ভার অর্পণ করেন।

বছর চল্লিশের যুবক হেমচন্দ্রের তেজস্বী মন নেচে ওঠে... কৈশোরে আলোয়ারের গ্রাম্য মেলায় চারণ কবিদের গাওয়া গান 'বীর দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ চৌহানের সঙ্গে মহম্মদ ঘোরীর পরাক্রমী যুদ্ধের কাহিনী। তেরোবার মুহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের হাতে পরাস্ত হন। শেষে রাজা জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় পৃথ্বীরাজ পরাজিত হন ও বন্দি অবস্থায়ও মহম্মদ ঘোরীকে মেরে মৃত্যুর বরণ করে নেন।'---হেমচন্দ্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন নতুন স্বপ্নে।

প্রধান অমাত্য হেমচন্দ্র কখন আদিল শাহের প্রধান সেনাপতি হয়ে গেলেন ইতিহাস তার খবরও দেয়নি। হায় ভারতবাসী, এমনই ইতিহাস

বিমুখতা। সম্রাট আকবরের সভার ঐতিহাসিক বায়ুনির লেখায় পাই বাংলা, আগ্রা ও লাহারের তিন বিদ্রোহী সেনানায়ক এককভাবে হেমচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে শেষে একযোগে আক্রমণ করেন। সে যুদ্ধেও হেমচন্দ্র জয়ী হন। আগ্রার শাসনকর্তা শক্তি ও সাহসের জন্য রুস্তম নামে খ্যাত ছিলেন। তৃতীয়বারে সুবিধাজনক স্থান থেকে যুদ্ধ শুরু করেও তিনি হেমচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত ও বহিষ্কৃত হন। চতুর্থবারে পেছন থেকে আক্রমণ করেও হেমচন্দ্রের রণচাতুর্যের কাছে হার মানেন। পরাজিত সম্রাট হুমায়ুন তাজ পুনরুদ্ধারের আশায় লড়তে লড়তে ভারতে এসে পড়েন। পাঞ্জাবে তাঁর মৃত্যু হলে মুঘল সেনাপতি বৈরাম খাঁ ১৪ বছরের জালালুদ্দিনকে আকবর নাম দিয়ে সম্রাট ঘোষণা করে দেন। তখন বঙ্গদেশের সুলতান সম্রাট আদিল শাহের সঙ্গে নতুন বিক্রমে যুদ্ধে এগিয়ে এসে জৌনপুর দখল করে আগ্রার পথে অগ্রসর হচ্ছেন। হেমচন্দ্র তখন বায়নার দুর্গ অবরোধে করে ইব্রাহিম শূরীকে শেষবারের মতো ধ্বংস করতে উদ্যত। আদিল শাহের আর্তিতে সাড়া দিয়ে বায়না দুর্গের প্রান্তর ছেড়ে জৌনপুরের পথে তাঁর বাহিনী ঘোড়া ছোটাল। পেছন থেকে আক্রমণ করল ইব্রাহিম শূরী কাপুরুষের মতো, যাকে কিনা পারসিক বীর রুস্তম অভিধায় ভূষিত করা হত। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবুল ফজলের লেখায় পাই এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করে ইব্রাহিম শূরীর স্বপ্ন চিরদিনের জন্য বিলীন করে এগিয়ে যান আদিল শাহের সহায়তার জন্যে। বাংলার সুলতানের কয়েক হাজার হাতি ও বিশাল

ঘোড় সওয়ার বাহিনী দিল্লি জয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভুলে গিয়েছিলেন যে হেমচন্দ্র আসছেন। বাংলার সুলতান যে মুহূর্তে যুদ্ধজয়ের খবরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ঠিক তখনই যমুনা পার করে হেমচন্দ্রের বাহিনী বীর বিক্রমে ধুমকেতুর ন্যায় ধেয়ে এসে কচুকাঁটা করে সুলতানের সৈন্যদের ধ্বংস করল।

প্রৌঢ় হেমচন্দ্রের মনের কোণে সেই বীরগাঁথা আলোর ঝলক ফেলল। অন্যায়যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর হাতে পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়। চরের মুখে খবর আসে, বৈরাম খাঁ বালক সম্রাট আকবরের হাতে শাসনভার তুলে দিল্লির পথে ধাবমান। মুঘল সৈন্য পৌঁছনোর আগেই হেমচন্দ্রের সেনা গোয়ালিয়র ও আগ্রা অধিকার করে দিল্লির উপকণ্ঠে পৌঁছলেন। মুঘল সৈন্যের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ হল। আর একবার হেমচন্দ্র বিজয়ী হলেন। প্রভূত ধনরাশি, হাতি ও উৎকৃষ্ট আরবী ঘোড়া হেমচন্দ্রের হস্তগত হল। আদিল শাহ তখন দিল্লি থেকে দূরে। মনের কোণে লুকানো স্বপ্নরা উড়ান দিল হেমচন্দ্রের। বীর পৃথ্বীরাজের হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন, দিল্লির সিংহাসন। প্রভুভক্ত হেমচন্দ্র ভাবেন আদিল শাহও আপন ভাগিনেয়কে হত্যা করেই দিল্লির মসনদ দখল করেছিলেন। মুসলিম ইতিহাসবেত্তাদের ভাষায়, শয়তান ভর করল হিমুর ঘাড়ে। বহু যুদ্ধের বিজয়ী বীর হেমচন্দ্রকে তাঁরা এই অবজ্ঞা সূচকনামেই চিনিয়েছেন। ভ্রাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী সুলতানি ও মুঘল শাসনের পঙ্কিল আবর্তেও এই দ্বিচারিতা।... বীর হেমচন্দ্র দিল্লির সিংহাসনে আসীন হলেন।

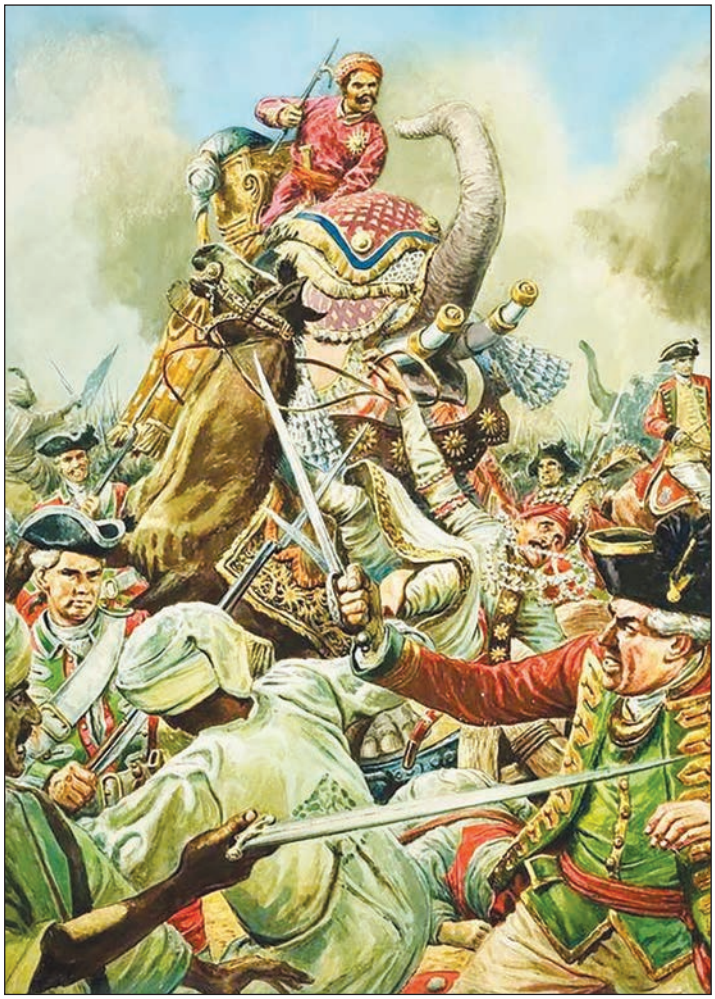

বস্তুত সারা ভারতে সম্মুখ সমরে হেমচন্দ্রের তরবারির সামনে দাঁড়ানোর মতো কেউই ছিল না। সাড়ে তিনশো বছরের মুসলিম শাসনের পরে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করলেন। আলোয়ারের বীর সন্তান হেমচন্দ্র 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করে ভারত সম্রাট হলেন। মহাকালের দুন্দুভি বেজে উঠল। মথুরা, বারাণসী, উজ্জয়িনী, অযোধ্যায় আনন্দের কলরব উঠল। ভারতের রাজছত্র উড্ডীন হল। হেমচন্দ্র যথার্থই বীর ছিলেন। কিন্তু বৈরাম খাঁ'র মতো সুহৃদ সেনাপতি তাঁর ছিল না। যখন সমস্ত মুঘল সেনানায়করা বালক জালালুদ্দিন আকবরকে পারস্যে ফিরে যেতে পরামর্শ দিচ্ছেন, একান্তে বৈরাম খাঁ অন্য চাল চাললেন।

অবশেষে পানিপথের প্রান্তরে বৈরাম খাঁ'র নেতৃত্বে মুঘল সেনা হেমচন্দ্রের সৈন্যের সঙ্গে দ্বৈরথে হাজির হল। মুঘল সেনার ত্রিশুলাকৃতি আক্রমণ। দু'ভাগকে পরাস্ত করে যখন হেমচন্দ্রের ঘোড়া মুঘল সৈন্যের কেন্দ্রভাগে প্রবেশে উদ্যত, ঠিক সেই সময়ই ইন্দ্রপতন ঘটল। হস্তিপৃষ্ঠে আসীন মুঘল সেনার তির হেমচন্দ্রের চোখে বিদ্ধ হল। তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। মুঘল আরো একবার যুদ্ধরীতি ভঙ্গ করল। যেরূপ কারবালার প্রান্তরে হজরত হোসেনের (রাঃ) সঙ্গে করেছিল এজিদের সৈন্যরা। আহত ভূপতিত হেমচন্দ্রকে ফেলে তাঁর ভাড়াটে পাঠান সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করল। তাঁর দেহরক্ষী বাহিনী আসার আগেই বৈরাম খাঁ এসে পৌঁছলেন। বালক আকবরকে আহ্বান করলেন তরবারির আঘাতে আহত হেমচন্দ্রের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করার জন্য। জানালেন এই কাফেরকে হত্যা করলে আকবর গাজী উপাধি প্রাপ্ত হবেন। ধিক মুঘলের সাহস-বীর্য। কারবালার মতই হেমচন্দ্রের খণ্ডিত মস্তক দিল্লির জনসাধারণের প্রদর্শনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। এখানেই শেষ নয়। মুঘল সৈন্য আলোয়ারে হেমচন্দ্রের পৈতৃক ভিটেয় পৌঁছে যায়। সমস্ত জয়। হেমচন্দ্রের পিতাকে মুঘল সেনাপতির নির্দেশ ছিল ইসলাম কবুল করুন অথবা মৃত্যুবরণ। আশি বছরের বৃদ্ধের মনে হল, সারাজীবনের পালিত ধর্ম শুধু প্রাণভয়ে ত্যাগ করবেন, না!

মুঘল সৈন্য আশি বছরের বৃদ্ধকেও হত্যা করলেন।

ইতিহাসের পাতায় বীর হেমচন্দ্র স্থান পাননি। পেয়েছে কাফের, পাষণ্ড, শয়তান হিমু! আশ্চর্য দেশ ভারতবর্ষ, সেলুকাসকে আলেকজান্ডার ঠিকই বলেছিলেন। সমকালীন ঐতিহাসিক মুঘল দরবারের পারিষদ আবুল ফজল ও বায়ুনি, দু'জনেই নেতিবাচকভাবেই হেমচন্দ্রের চরিত্র চিত্রন করেছেন। তবুও অবচেতনে বীর হেমচন্দ্রকে সমকালের শ্রেষ্ঠ বীরের আখ্যা দিয়েছিলেন। ইতিহাসের ধারা বিবরণীতে বেঁচে না থাকলেও ভারত আত্মায় চিরকালবীর হেমচন্দ্র অমলিন থাকবেন।

উত্তরাধিকারের চোখে বিখ্যাত মনীষীরা

আমার মাতামহের মুখে ভাত তুলে দেন বঙ্কিমচন্দ্র

দেবাশিস চ্যাটার্জি

আমাদের বাড়ি বালির পশ্চিমপাড়ে দুর্গাপুরে। আমার আদি মাতুলালয় বালি থানার বিপরীতে ডাকঘরের ঠিক পাশেই জিটি রোডের ওপরে বাচস্পতি হাউস। এই বাড়িতে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাইঝি পঙ্কজকুমারীর সঙ্গে কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের বিয়ে দেন। এই পঙ্কজকুমারী দেবী আমার মায়ের পিতামহী (ঠাকুমা)। কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারক। ওই সময়ে তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার ডিগ্রি করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ওঁনাকে নিজস্ব উদ্যোগে প্রকাশিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার সহ সম্পাদক করেন। আর নিজের ভাইঝি পঙ্কজকুমারীর সঙ্গে বিয়ে দেন। ওনাদের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন আমার মাতামহ সত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়। শোনা যায়,

তাঁর অন্নপ্রাশনের দিন বঙ্কিমচন্দ্র নিজে কোলে বসিয়ে মুখে ভাত তুলে দেন। নামকরণ করেন। ঠিক তার কিছুদিন আগে আনন্দমঠ উপন্যাসের মূল একটি চরিত্র সত্যানন্দের অনুকরণে আমার মাতামহের নাম রাখেন সত্যানন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র একটা গিনি সোনার মুদ্রায় আশীর্বাদ করেন। ১৯৬০ বা ৭০ দশকে ওই মুদ্রাটি আমি নিজের চোখে দেখেছি। তারপর আর কখনো দেখিনি। আমি খুব ছোটো বয়সে তাঁকে হারাই। পরে মা ও মাতামহীর কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক কথা শুনেছি। ৬০ বছর পরে অনেক স্মৃতিই হারিয়ে গেছে। কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমাদের দেশ' প্রবন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। আমিও পড়েছি।

এই বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এসেছিলেন। আবার আমার মায়ের ছোটো ঠাকুরদা বিবেকানন্দের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বিবেকানন্দ যে চারজন বন্ধু সহযোগে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে যান সেই চারজনের মধ্যে একজন ছিলেন আমার মায়ের ছোটো ঠাকুরদা। যিনি কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের ছোটো ভাই (নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না)। কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন। উনি যখন হাওড়ায় ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন তখন প্রায়ই বালির এই বাড়িতে আসতেন। পালামৌ গল্পের স্রষ্টা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও অনেকবার এই বাড়িতে আসেন। ১৯৯০ সালের শুরুতে একতলার বৈঠকখানায় সেসব কিছুর নিদর্শন আমি দেখেছি। তারপর আর অনেকাল ওই বাড়িতে যাওয়া হয়নি।

❋ ❋ ❋ ❋

আমার মননে কেশব চন্দ্র সেন

প্রণবকুমার সেন

রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও'র পরের সময়ে বাংলার নবজাগরণ যেসব মনীষীদের হাত ধরে এগিয়ে যায়, তার মধ্যে ছিলেন কেশব চন্দ্র সেন। যাঁর অবদান কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। আমার প্রপিতামহ প্রয়াত কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন কেশব চন্দ্র সেনের ছোটো ভাই। আমার বাবা প্রয়াত পূর্ণেন্দুকুমার সেন ছিলেন প্রাক্তন আইএনএ, লেফটেন্যান্ট। নেতাজীর সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন।

কেশব সেনের ঠাকুরদা রাম কমল সেন গরিফা থেকে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় আসেন। নিজস্ব দক্ষতায় কলকাতার সুধী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন। ওই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের মিন্ট-য়ের দেওয়ান কাজের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়। হাজার টাকা জমা রেখে তাঁকে ওই কাজে যোগ দিতে বলা হয়। রাম কমল সেন ওই পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হন। কিন্তু টাকা জোগাড় করতে পারেননি। সেই সময় তাঁর বন্ধু মতিলাল শীলের সাহায্যে তিনি দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। পরে রামকমল সেন তৎকালীন হিন্দু কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য হন। চিন্তাধারায় রক্ষণশীল হলেও বিভিন্ন সামাজিক কাজে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

রাম কমল সেনের ছেলে পেয়ারিমোহনও পরে দেওয়ান পদে যোগ দেন। তাঁর মৃত্যুর সময় তিন সন্তান নিতান্তই নাবালক ছিলেন। স্ত্রী সারদা দেবী অনেক সংগ্রাম করে সন্তানদের মানুষ করেন। সেই সময়ের কথা তাঁর জামাতা জগেন্দ্র খাস্তগিরের অনুপ্রেরণায় 'সারদা দেবীর আত্মকথা' য় লেখা রয়েছে। পেয়ারিমোহনের তিন ছেলে-নবীন চন্দ্র সেন, কেশব চন্দ্র সেন ও কৃষ্ণ বিহারী সেন। আমার প্রপিতামহ ছিলেন কৃষ্ণ বিহারী সেন। তিনি ওই সময় ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি নিজের মেজদা কেশব সেনের খুব গুণগ্রাহী ছিলেন। কেশব সেনের নানা কাজের কথা

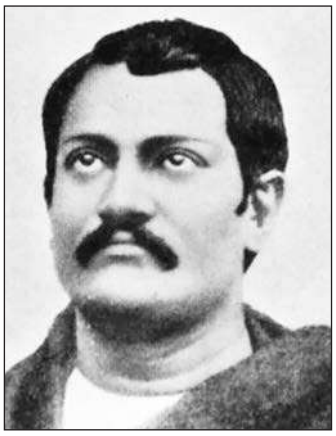

তাঁর বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায়। রামমোহন রায়ের বৈদিক অনুশাসন ও ব্রহ্ম চিন্তাধারায় যে ব্রহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় পরে সেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশব চন্দ্র সেন যোগ দেন। কেশব সেন নানা জনহিতকর কাজের মধ্যে বটবৃক্ষের মতো সবার আশ্রয়দাতা হয়ে ওঠেন। ছোটো ভাই কৃষ্ণ বিহারী সেন কেশব সেনের সব কাজ ও চিন্তাধারা নিজস্ব পত্রিকার মাধ্যমে আমজনতার মধ্যে ছড়িয়ে দেন। কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, চন্দ্রাবতী বসু প্রমুখরা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। কেশব সেন ইংরেজ শাসকদের সাহায্যে ১৪ বছরের নীচে মেয়েদের বিয়ে ও গৌরিদান প্রথা রদ করেন। এই কাজ তাঁকে সমাজসংস্কারের মর্যাদা দেয়। কেশব সেনের নানা কাজ প্রচলিত হিন্দুধর্মের মুখোশ খুলে দেয়। দাদা নবীন চন্দ্র সেন তাঁকে ত্যাজ্য ঘোষণা করেন। কেশব সেন সস্ত্রীক ঘর ছাড়েন। বন্ধু দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আশ্রয় নেন। ওই সময় রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই শিশু। ঠিক তার বছরখানেক পর কেশব সেন রাজাবাজারে তাঁর বাড়ি কমলকুটিরে চলে যান। ওই বাড়ি পরে ভিক্টোরিয়া কলেজ নামে পরিচিতি পায়। এরপর ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পদের মনোনয়নকে ঘিরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের মতবিরোধ হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন পিয়ালি ব্রাহ্মণ। তিনি ব্রাহ্মণ ছাড়া কাউকে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পদ দিতে চাননি। তাই কেশব চন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে আজকের কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিটে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ তৈরি করেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, জন্ম পরিচয় নয়, শিক্ষা ও জ্ঞানই হবে আচার্য পদের যোগ্যতা। কেশব সেন ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারের জন্য সারা দেশ ঘুরে বক্তৃতা দেন। ব্রাহ্ম সমাজের মাধ্যমে নানা গঠনমূলক কাজ করেন। জনহিতকর কাজের জন্য জনমানসে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। ছাত্র অবস্থায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। শঙ্করী প্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কেশব চন্দ্র সেনের কর্মকাণ্ড সুদূর ইংল্যান্ডেও ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ মহারানি তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতার জন্য ইংল্যান্ডে আমন্ত্রণ জানান।

কেশব চন্দ্র সেন তাঁর মেয়েদের বিদেশি শিক্ষিকা দিয়ে পড়িয়ে আধুনিকভাবে শিক্ষিত করে তোলেন। যাতে তাঁরা বাবার যোগ্য হয়ে ওঠেন। ইংরেজ সরকার ভুয়ো টেলিগ্রাম করে কেশব সেনকে সপরিবারে কোচবিহারে নিয়ে যায় ও তাঁর বড়ো মেয়ে সুনীতি দেবীর সঙ্গে কোচবিহারের মহারাজার ছেলের বিয়ে দেয়। সুনীতি দেবীর বয়স তখন ১২ কী ১৩ বছর ছিল। এই ঘটনায় নববিধানের সব সদস্যরা কেশব সেনের ওপর রেগে যান। কেশব সেন নিজেও এই ছলনা সহ্য করতে পারেননি। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম ত্যাগ করে শ্রীরামকৃষ্ণের যত মত তত পথ আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। কেশব সেনের মৃত্যুর পর তাঁর মেয়ে সুনীতা দেবী বাবার কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। কেশব সেন কলকাতার আলিপুরে ব্রিটিশ গভর্নর হাউসের আদলে রাজকীয় প্রাসাদ তৈরি করেন। যা পরে আলিপুর জাতীয় লাইব্রেরি হয়। প্রকৃত অর্থে সমাজ সংস্কারক ও মুক্ত চিন্তাধারার যে স্রোত ভগীরথের মতো রাজা রামমোহন রায় বাংলায় এনেছিলেন, তা পরে ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, কেশব চন্দ্র সেনের হাত ধরে পূর্ণ রূপ পায়।

❋ ❋ ❋ ❋

ক্ষুদিরামের বংশধর হিসাবে গর্ববোধ করি

শান্তি বসু

আমার দাদু প্রভাস চন্দ্র বসুর কাকা ছিলেন ক্ষুদিরাম বসু। সেই সম্পর্কে দেশের প্রথম শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর আমি প্রপৌত্র। ক্ষুদিরাম বসু ১৮৮৯ সালের ৩ ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরের কেশপুর থানার মৌবনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ত্রৈলক্যনাথ বসু ছিলেন নাড়াজালের তহসিলদার। তাঁর মা ছিলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। তিন কন্যার পর তিনি হলেন চতুর্থ সন্তান। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর দুই ছেলে অকালে মারা যান। অন্য ছেলের মৃত্যুর আশঙ্কায় তখনকার নিয়ম অনুযায়ী তিনি ছেলেকে বড়ো মেয়ের কাছে তিন মুঠো খুদের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। খুদের বিনিময়ে কেনা হয়েছিল বলে শিশুর নাম রাখেন ক্ষুদিরাম। ক্ষুদিরামের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর, তিনি মাকে হারান। এক বছর পর বাবাকে হারান। তখন তাঁর বড়ো দিদি অপরূপা তাঁকে দাসপুর থানার এক গ্রামে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। জামাইবাবু অমৃতলাল রায় ক্ষুদিরামকে তমলুকের হ্যামিলটন হাই স্কুলে ভরতি করে দেন। ১৯০২ ও ১৯০৩ সালে অরবিন্দ ও সিস্টার নিবেদিতা মেদিনীপুরে বেড়াতে আসেন। তাঁরা স্বাধীনতার জন্য জনসমক্ষে বক্তব্য রাখেন ও বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে গোপন অধিবেশন করেন। তখন কিশোর ক্ষুদিরাম ওই বিপ্লবী আলোচনায় অংশ নেন। পরে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে অনুশীলন সমিতির একজন স্বেচ্ছাসেবক হয়ে ওঠেন ও ভারতে ব্রিটিশ শাসক বিরোধী পুস্তিকা বিলির অপরাধে গ্রেফতার হন। ১৬ বছর বয়সে ক্ষুদিরাম থানার কাছে বোমা মজুত করতে থাকেন ও সরকারি আধিকারিকদের আক্রমণের লক্ষ্য স্থির করেন। ধীরে ধীরে আরো বেশি করে বিপ্লবী কাজে জড়িয়ে পড়েন। ক্ষুদিরাম আরেক বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকির সঙ্গে মিলে ব্রিটিশ বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে গুপ্তহত্যা করার জন্য বোমা ছুঁড়েছিলেন। কিংসফোর্ড তখন অন্য একটা গাড়িতে বসেছিলেন। ওই ঘটনার জন্য দু'জন ব্রিটিশ মহিলার মৃত্যু হয়। তাঁরা ছিলেন মিসেস কেনেডি ও তাঁর মেয়ে। প্রফুল্ল চাকি গ্রেফতারের আগেই আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম গ্রেফতার হন। দু'জন মহিলাকে হত্যা করার জন্য তাঁর বিচার হয় ও চূড়ান্তভাবে ফাঁসির আদেশ হয়। ফাঁসি হওয়ার সময় ক্ষুদিরামের বয়স ছিল ১৮ বছর ৭ মাস ১১ দিন। তিনি ছিলেন দেশের কনিষ্ঠতম বিপ্লবী। ক্ষুদিরাম বসুর জন্মস্থান মৌবনি আজ তীর্থক্ষেত্র। এখানে গড়ে উঠেছে ক্ষুদিরাম পার্ক ও অডিটোরিয়াম। পুরোটাই সরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। ওই জায়গায় প্রতি বছর ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন ও মৃত্যুদিনে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। ক্ষুদিরাম বসুর উত্তরাধিকার হিসাবে আমি চাই নতুন প্রজন্মের মধ্যে তাঁর চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়ুক।

❋ ❋ ❋ ❋

রামমোহন

দেবব্রত মুখার্জি

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য বা দেশকে নানাভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাড়াও আরও এক মহান ব্যক্তি ছিলেন। যিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে ধর্মীয়, সামাজিক পুনর্গঠন আন্দোলনে অনন্য ভূমিকা নেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়।

১৭২২ সালের ২২ মে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা রাধানগর স্যার প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী প্রতিষ্ঠা পাঠশালায়। প্রপিতামহ কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের কাঁকসা গ্রামে ফারুকশিয়ারের আমলে বাংলার সুবাদার আমিনের কাজ করতেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছ থেকে রায় বাগান উপাধি পেয়েছিলেন। সেই থেকেই পরিবারের সকলে রায় পদবী ব্যবহার করতেন। কৃষ্ণকান্তের কনিষ্ঠপুত্র ব্রজবিনোদ হলেন রামমোহনের পিতামহ ও পিতা হলেন রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। রামকান্তের মধ্যমা পত্নী তারিণী দেবীর এক কন্যা ও দুই পুত্র। যাঁরা হলেন জগমোহন ও রামমোহন। রামকান্ত পৈতৃক এজমালি ভদ্রাসন ছেড়ে পার্শ্ববর্তী নাগরপাড়া গ্রামে সপরিবারে উঠে যান। পিতা ছিলেন বৈষ্ণব ও মাতা তারিণী দেবী ছিলেন শাক্ত মতে বিশ্বাসী।

বাল্যকালেই পিতার সঙ্গে রামমোহনের ধর্ম বিষয়ে বিরোধ হয়। তাঁর আত্মজীবনী মূলক চিঠি থেকে জানা যায়, ১৬ বছর বয়সে রামমোহন হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি প্রস্তাব রচনা করেন। এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত না হলেও এই নিয়ে পিতার সঙ্গে তাঁর তীব্র মনোমালিন্য হয়। শেষে রামমোহন গৃহত্যাগ করে দেশের নানা জায়গায় ঘোরার পর দেশের বাইরে তিব্বতে চলে যান।

বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণের সময় সব জায়গার ধর্মগ্রন্থ পড়ার জন্য রামমোহন রায় প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা শিখেছিলেন। তাঁর যখন কুড়ি বছর বয়স তখন রামকান্ত তাঁকে ডেকে পাঠান। পিতা ও পুত্রের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। তার পাঁচ-ছয় বছর পরে রামকান্ত নিজের ভরণপোষণের জন্য কিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রেখে বাকি সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে দেন। তারপর রামকান্ত বর্ধমান চলে যান। তরুণ বয়সে রাজা রামমোহন রায় মহাজনের কাজ করে প্রথম অর্থ উপার্জন শুরু করেন। ১৮০৩-১৮১৪ সাল পর্যন্ত তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন। কলকাতায় প্রায়ই আসতেন। সেই সুযোগে রামমোহন জনর ডিগ্বির কাছ থেকে ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সাল থেকে রাজা রামমোহন রায় কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন। সেখান থেকেই প্রকাশ্যে তাঁর সংস্কার ও প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই সময়ে তিনি বাংলায় বেদান্ত গ্রন্থ, বেদান্তসার ও ইংরেজিতে উপনিষদ প্রকাশ করেন।

রামমোহন প্রথমেই ধর্ম সংস্কারে মন দিয়ে দেখলেন অনিবার্যভাবে অনেক বিষয় এসে পড়ে। এই সংস্কার কাজকে সংঘবদ্ধভাবে করার জন্যই তিনি আত্মীয় সভা স্থাপন করেন। এই আত্মীয় সভাতেই আলোচনাকালে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডেভিড হেয়ারের পরামর্শে আধুনিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর একবছর আগে ১৮১৬ সালে রামমোহন হেদুয়ার কাছে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এতে প্রায় ২০০জন ছাত্র হয়েছিল। এই স্কুলের শিক্ষা শেষ করে ছাত্ররা যাতে আরো পড়তে পারে সেইজন্য রামমোহন নিজের বাড়িতে আরেকটি স্কুল স্থাপন করেন। পরে ১৮২২ সালে হেদুয়ার উত্তরে একখণ্ড জমি কিনে নিজস্ব ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করেন অ্যাংলো হিন্দু স্কুল। এই স্কুলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রামমোহনের কনিষ্ঠপুত্র রামপ্রসাদ রায় পড়াতেন। রামমোহন রায় লিখেছিলেন, দেশের মানুষের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন গণিত, প্রকৃত বিজ্ঞান, রসায়ন ব্যবহারিক। আধুনিক শিক্ষার ব্যাপারে তিনি আলেকজান্ডার ডাফকেও অনেক সাহায্য করেছিলেন।

রামমোহন রায় একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করতেন। তিনি মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। হিন্দুদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মানতেন না। প্রকাশ্যে এটা নিয়ে প্রতিবাদও করতেন।রামমোহন রায় বেদের বাংলা অনুবাদ করে তার বক্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো লক্ষ্য ছিল জাতি, বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই সমাজের সকলকে সমবেত করা। তিনি নিজে কোন ধর্ম প্রচার করেননি। তবে সব ধর্মের মানুষকেই একেশ্বরবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য ১৮২৭ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় সর্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রজমোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, বিহারীলাল চৌবে, রাজনারায়ণ সেন প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট মানুষ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ছিলেন।

সতীদাহ নামে এক বর্বরতা ওই সময় আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। তার বিরুদ্ধে রামমোহন রায় কঠোর আন্দোলন করে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দেশীয় ধর্মীয় প্রথা হিসেবে সতীদাহকে বন্ধ করা যাচ্ছিল না। রামমোহন ১৮১১-১৮১২ সাল থেকেই এই প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। ১৮১২ সালে তাঁর বৌদি অলকমঞ্জুরি সতীদাহ প্রথার বলি হয়েছিলেন। প্রতিবছর অন্তত ৫০০-৬০০ মহিলাকে এভাবে পুড়িয়ে মারা হত।

লর্ড বেন্টিংয়ের সময় সতীদাহ প্রথা সার্থক বলে প্রচার করে পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু রামমোহনের একান্ত চেষ্টায় লর্ড বেন্টিং সহ সমাজের অনেকেই বুঝতে পারলেন এই প্রথা অত্যন্ত অন্যায়। অবশেষে ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতবর্ষ থেকে আইন করে এই প্রথা তুলে দিলেন। এর প্রতিক্রিয়া ভয়ঙ্কর হয়েছিল। ধর্মসভার সদস্যরা তথা গোড়া রক্ষণশীল সম্প্রদায় রামমোহনকে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছিল। বিলেতেও সতীদাহ নিবারণ বিল রাজপর্ষদ দ্বারা সমর্থিত হয়। রামমোহন শাস্ত্রের নানা শ্লোক উদ্ধৃত করে কৌলিন্য

ও বহুবিবাহ প্রথা যে স্বাস্থ্যসম্মত নয় তা দেখিয়েছেন। তিনি বিধবা বিবাহ সমর্থন করতেন। আসলে রামমোহন রায় নারী জাগরণেরও প্রথম পথিকৃৎ।

রাজা রামমোহন রায় মোট ১০টি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। এর মধ্যে ছিল আরবি, ফার্সি, ল্যাটিন, সংস্কৃত, গ্রিক, হিব্রু, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি। ১৮৩১ সালে তিনি কলকাতা থেকে প্রথম বিলেত যাত্রা করেন ও রাজা উপাধি লাভ করেন। রামমোহন রায় জীবনে তিনটি বিবাহ করেছিলেন।

১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের ব্রিষ্টল শহরে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর শেষকৃত্য কীভাবে হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়। তাঁর খ্রিস্টান বন্ধুরা সমাধিতে রাখতে চেয়েছিলেন। ডা. কার্পেন্টার বলেন, রাজা রামমোহন রায় বলেছেন যদি ইংল্যান্ডে তাঁর মৃত্যু হয় তাহলে একখণ্ড নিষ্কর জমি ক্রয় করে সেখানে যেন তাঁকে সমাহিত করা হয়। সেখানে একটি কুটির তৈরি করে কোন শ্রদ্ধাবান দরিদ্র ব্যক্তিকে যেন তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখন কুমারী ক্যাসেল এগিয়ে এসে তাঁর একখণ্ড জমি দান করেন ও ১৮ অক্টোবর রামমোহনকে সেখানে সমাহিত করা হয়।

১৯১৬ সালে রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পনা মতো মন্দির মসজিদ গির্জা সমন্বয়ে একটি স্মৃতি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেহেতু রাজা রামমোহন রায় একজন মস্ত বড়ো হোতা ছিলেন কবিগুরু তাই নিজে হাতে মন্দিরের নকশা অঙ্কন করে দিয়েছিলেন। পরে সেখানে একটি স্মৃতি মন্দির নির্মিত হয়েছে। সম্প্রতি সেখানে রামমোহন রায় নামে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাঁর বিভিন্ন অবদান আজও সকলের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে ও ভারত পথিক নামে তিনি এই সমাজে অভিহিত হন।

❋ ❋ ❋ ❋

অবহেলিত অগ্নিশ্বর

অঞ্জন দে

‘মাই লর্ড..

ঘড়িয়ালটার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ দেরাদুনের এক প্রতিবাদ সভায়। আগেরদিন দিল্লিতে লাটবাহাদুরের ওপর বোমা মেরে সে রাতারাতি ফিরে এসেছিল দেরাদুনে। তারপরে সভায় বোমা হামলার প্রতিবাদ করে ভাষণ দেয়। সেই ধরিবাজটা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে টিকটিকির কাজ করে ভুলভাল খবর দিয়ে পুরো দেড়-বছর আমাকে বাঁদর নাচ নাচিয়েছে। বড়লাট দেরাদুনে এলেন। কঠোর নিরাপত্তা। আমিও ওনার ঘরে ঢুকতে পারিনি। অথচ আমি নিজের চোখে দেখেছি ঘড়িয়ালটা বড়লাটের ঘরে অনায়াসে ঢুকছে, ব্রিটিশ পুলিশ বিভাগের এতটাই কাছের ছিল সে’- কোর্টে গুরুত্বপূর্ণ জবানবন্দিতে গর্জে উঠলেন সিআইডি ডিএসপি সুনীল ঘোষ।

কে এই ঘড়িয়াল, যার জন্য ব্রিটিশ পুলিশ বাঁদর নাচছে? আসুন, আমরা ফিরে তাকাই ১১০ বছর আগে। সময়টা ১৯১১ সাল। অশান্ত, বিপ্লবীদের আখড়া কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে নিয়ে যাচ্ছে ব্রিটিশরা। দিনটা ২৩ ডিসেম্বর, ১৯১২ সাল। সময় সকাল ১১টা বেজে ৪৫ মিনিট। হাতির পিঠে বসা সস্ত্রীক বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লি স্টেশন থেকে দিল্লির চাঁদনী চকের পথ ধরে আম-দরবারে যাচ্ছিলেন বঙ্গভঙ্গ বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য, তিল ধারণের জায়গা নেই। অসংখ্য মহিলা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ভবনের তৃতীয়তলায় শোভাযাত্রা দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন। হাজির হয়েছেন লীলাবতীও। অন্যান্যদের মতো বড়লাটকে দেখার তাঁর বড়োই সাধ। কিছুক্ষণ পর ‘শান্ত’ দিল্লিই কেঁপে উঠল বোমার ভয়ঙ্কর আওয়াজে। সামান্য আহত হলেন হার্ডিঞ্জ। মারা গেল মাহুত। তার মধ্যেই মেয়েটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।

২৪ ডিসেম্বর, ১৯১২ সাল। দেরাদুন স্টেশন সংলগ্ন এক ছোটো মাঠে বক্তৃতা দিচ্ছেন এক বছর তিরিশের যুবক। তীব্র ভাষায় নিন্দা করছেন আগেরদিন অর্থাৎ ২৩ ডিসেম্বর দিল্লিতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর উপর প্রাণঘাতী বোমা হামলার। বিপ্লবীদের ওপর তাঁর প্রচণ্ড ‘রাগ’ বেরিয়ে এল বক্তৃতার মঞ্চে। যুবকের তীব্র ভারত বিরোধী মন্তব্যে সভায় উপস্থিত বাঘা বাঘা ব্রিটিশ ও ভারতীয় পুলিশ অফিসাররা হাততালি দিচ্ছেন। সাহেবরা অভিভূত।

পরবর্তীকালে জানা যায়, বড়লাটকে দেখতে আসা সেই মেয়েটিই ছদ্মবেশে বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস। বসন্ত বিশ্বাসরা ধরা পড়ার পর, দিল্লির ঘটনার মাস্টার মাইন্ডের পরিচয় সামনে এল। আর তা জেনে হতবাক ব্রিটিশ অফিসাররা। একি শুনছেন তাঁরা! যে বাঙালি যুবক দেরাদুনে এত বিক্ষোভ দেখালেন, সে-ই কিনা মূল ষড়যন্ত্রকারী? লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁর আত্মজীবনী ‘মাই ইন্ডিয়ান ইয়ার্স ১৯১০-১৯১৬’ গ্রন্থে লিখেছেন- ‘দেরাদুনে আমি যখন স্টেশন থেকে বাংলোর দিকে যাচ্ছিলাম, তখন রাস্তার ধারে এক বাড়ির সামনে কয়েকজন ভারতীয়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাঁদের সেলাম ছিল আভূমিনত। খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম ওই সেলামকারীদের মুখপাত্র ছোকরাটি দু’দিন আগে দেরাদুনে একটা জনসভায় আমার প্রতি বোমাবর্ষণের তীব্র নিন্দা করেছে। এবং এই বিষয়ে সভায় একটি প্রস্তাবও পাস করিয়ে নিয়েছে। দীর্ঘদিন পরে প্রমাণিত হয়েছিল ওই ছেলেটিই আমাকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিল।’

ব্রিটিশ সরকার যাঁকে কোনও দিনও ধরতে পারেনি, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে যাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, যাঁকে বলা হত ‘বিপ্লবীর বিপ্লবী’ সেই তিনি হলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। তাঁর জীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন ‘পথের দাবী’ উপন্যাসের নায়ক ‘সব্যসাচী’

চরিত্রটি।

গর্জে উঠল ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়। যে করেই হোক রাসবিহারীর শির চাই। রাসবিহারীর ছবি ছাপিয়ে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হল। পুরস্কার ঘোষণা করা হল সাড়ে বারো হাজার টাকা। কিন্তু কোথায় কী ! রাসবিহারী বসুকে ধরা কি এতই সহজ ! হাজার চেষ্টাতেও ইংরেজ পুলিশ তাঁকে ধরতে পারেনি। নানা ভাষায় তিনি যেমন কথা বলতে পারতেন তেমনই নিমেষে ভোল পরিবর্তন করতে পারতেন। ব্রিটিশদের নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন রাসবিহারী বসু। কখনও লাহোর, কখনও অমৃতসর, কখনও কলকাতা, কখনও চন্দননগর ঘুরে ঘুরে বিপ্লবীদের সংগঠিত করতে লাগলেন তিনি। নামও বদলাতেন প্রায়ই। ফ্যাটবাবু, সতীন্দ্রচন্দ্র, সতীশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত এরকম নানা ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন রাসবিহারী বসু। কতবার পুলিশের সঙ্গে কথাও বলেছেন, সামনাসামনিও হয়েছেন কিন্তু কেউ তাঁকে ধরতে পারেনি।

সিআইডি ডিএসপি সুনীল ঘোষের স্বীকারোক্তিতে উঠে এসেছে তাঁর লুকোচুরি খেলা :

'মাই লর্ড

আর কী শেয়ানা দেখুন, যে মুহূর্তে জানতে পারলাম, যে এই রাসবিহারী বসুই আসল লোক, অমনি সে পালিয়ে চলে গেল চন্দননগরের ফটকগোড়ার বাড়িতে। আমরা কেমন করে আন্দাজ করতে পারব যে ছেলেটি এতদিন দাবড়ে বেড়াচ্ছিল, সে নিজের বাড়িতেই লুকিয়ে থাকবে ! তারপর যখন জানতে পারলাম তখন ফরাসি অনুমতি নিয়ে চন্দননগরে ধরতে গেলুম। সঙ্গে মিস্টার ডেনহ্যাড়ম ও চার্লস টেগার্ট। একসঙ্গে তিনটে বাড়িতে রেড করলাম। তোষক-বালিশের তুলো পর্যন্ত বার করে ফেললাম, তবু রাসবিহারীর টিকিটি পর্যন্ত পেলাম না। ফিরে আসার অনেক পরে খবর পেয়েছিলাম, সেদিন নিজের বাড়িতেই আম গাছের মগডালে পুরো একদিন কাটিয়েছিল সে। আরও অদ্ভুত, এই ঘটনার পরেও একমাস সে চন্দননগরেই ছিল, সাধু ব্রাহ্মণের বেশে, আর আমরা অন্য সব জায়গায় দৌড়েছি।'

একবার কাশীতে একটি বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন রাসবিহারী বসু। পুলিশ পুরো বাড়ি ঘিরে ফেলল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন এক উড়ে ঠাকুর। পুলিশ জিজ্ঞেস করল রাসবিহারী বসু কোথায়? উড়ে ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'তিনি ভিতরে ঘুমোচ্ছেন'। সবাই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু ঘরে কেউ নেই! ওই উড়ে ঠাকুরটিও উধাও ! উড়ে ঠাকুরের ছদ্মবেশে পুলিশকে বোকা বানিয়ে নাগালের বাইরে চলে গেলেন রাসবিহারী বসু।

একবার খবর এল কলকাতায় আছেন রাসবিহারী বসু। শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা সর্বত্রই পুলিশে ছয়লাপ। কিন্তু কোথায় রাসবিহারী ! তিনি তো তখন অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের ছদ্মবেশে শিয়ালদহ পোস্ট অফিসের দোতলায় বেহালায় সুর তুলেছেন !

পরের একদিনের ঘটনা। চন্দননগরে এসেছেন তিনি। গোপন সূত্রে খবরও পেয়ে গেল ব্রিটিশ পুলিশ। গোটা বাড়ি ঘিরে নেওয়া হল। এমন ব্যবস্থা করা হল, যাতে মাছিটিও গলতে না পারে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ কেটে গেল, তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না। এবারও বিফল হল। খবর এল, ফাঁক পেয়ে পাখি পালিয়েছে। কিন্তু কখন? পুলিশের খেয়াল পড়ল, একটি ঝাড়ুদারই শুধু বাড়ি পরিষ্কার করে বালতি আর ঝাঁটা হাতে বেরিয়ে গিয়েছিল। বোঝা গেল, সেই ময়লা গায়ের ঝাড়ুদারই 'মোস্ট ওয়ান্টেড' বিপ্লবী, রাসবিহারী বসু।

লাহোরের গাদার ষড়যন্ত্র মামলা, বেনারস ষড়যন্ত্র, দিল্লি ষড়যন্ত্র ইত্যাদিতে রাসবিহারীবসুর নাম প্রকাশ্যে আসাতে অত্যাচারী পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্টের সন্দেহভাজন হয়ে পড়লেন তিনি! স্টেশনে স্টেশনে তাঁর ছবি সহ পোস্টার লাগানো। রাসবিহারী বসু তাঁর ছবি দেখে কিছুটা বিব্রত। ১৯১৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের পত্রপত্রিকায় এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান ভ্রমণে যাচ্ছেন। এরকম সংবাদ প্রকাশিত হলে সেটা দেখে রাসবিহারী বসু জাপানে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯১৫ সালের ১২ মে কলকাতার খিদিরপুর বন্দর থেকে জাপানি জাহাজ 'সানুকি-মারু'তে চড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটাত্মীয় 'প্রিয়নাথ ঠাকুর' ছদ্মনামের পাশপোর্ট সহযোগে, টেগার্টের সামনে দিয়ে বই পড়তে পড়তে জাপান চলে গেলেন রাসবিহারী বসু। আশ্রয় নিলেন একটি জাপানি পরিবারে। রবীন্দ্রনাথের সচিব হিসেবে (মতান্তরে আত্মীয়) পি.এন.ঠাকুর (প্রিয়নাথ ঠাকুর) নাম ধরে জাপানে বসবাস শুরু করেন।

রাসবিহারী বসু জাপানে পালিয়ে আসা চিনের জাতীয়তাবাদী নেতা ড. সান ইয়াৎ সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ড. সান-ইয়াতের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি আকাসাকা শহরের রেইনানজাকাস্থ 'গেনয়োশা' গুপ্ত সংস্থার কার্যালয়ে সংস্থার পরিচালক তোয়ামামিৎসুরুর (১৮৫৫-১৯৪৪) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য সহযোগিতা করার আবেদন জানান। সেদিন থেকে ড. সান-ইয়াৎ সেন ও তোয়ামামিৎসুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন রাসবিহারী বসু। গুরু তোয়ামা এই বিপ্লবীকে জাপানে আশ্রয় ও সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সেদিন থেকে জাপান তথা বিদেশে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নতুন রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়।

তিনি জাপানে আসার ৮ মাস পর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবের পুরোধা লালা লাজপত

রায় আমেরিকা যাওয়ার পথে জাপানে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি উপস্থিত অতিথিদের কাছে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে জাপানের সহযোগিতা ও এশিয়াবাসীর হাত দিয়ে এশিয়া মহাদেশকে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এরপর রাসবিহারীর ও তাঁর সহযোগী হেরাম্বলালের ওপর নেমে আসে বিপদ। অনুষ্ঠানে জাপানস্থ ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার ৪জন চরকে পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা দু'জনের আসল পরিচয় পেয়ে ব্রিটিশ দূতাবাসকে অবহিত করেন। পরেরদিনই রাষ্ট্রদূতের বিশেষ দূত জাপানি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসে অনুরোধ জানায় যে, দু'জন বিপথগামী ভারতীয় তরুণ শত্রুশক্তি জার্মানির সাহায্যে ভারতের জনসাধারণকে বিদ্রোহী করে তুলছে। সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করছে। তাঁরা জাপান-ব্রিটিশ মৈত্রী সম্পর্কেরও শত্রু। সুতরাং ওই দু'জনকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে জাপানি কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে দুই বিপ্লবীকে ৫ দিনের মধ্যে জাপান ত্যাগের নির্দেশ দেয়। তবে ওই দু'জন নির্ধারিত শেষ সময়সীমা লঙ্ঘন করে জাপানেই থেকে যান। ফলে তাঁদের বিরুদ্ধে জারি হয় জাপান সরকারের গ্রেফতারি পরোয়ানা।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই শ্রীমতী তোশিকোর সঙ্গে রাসবিহারী বসুর বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৯২০ সালের ১৩ আগস্ট জন্ম নেয় পুত্র মাশাহিদে, যাঁর ভারতীয় নাম ভারতচন্দ্র। ১৯২২ সালের ১৪ ডিসেম্বর জন্ম হয় মেয়ে তেৎসুকো-র। ১৯২৩ সালের ২ জুলাই জাপানের নাগরিকত্ব পান রাসবিহারী। ১৯২৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে, জাপানে প্রবল ভূমিকম্প হয়। সমুদ্রের ঢেউ ৪০ ফুট উঁচু সুনামি হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ মারা যান। ৪০ হাজার মানুষ নিখোঁজ হন। এছাড়াও ৪৪ হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছিলেন। রাসবিহারীর আশ্রয়স্থলটি ধ্বংস হয়ে যায়। এই বিপর্যয়ে রাসবিহারী বসু স্ত্রী, আড়াই বছরের পুত্র ও আট মাসের কন্যাকে নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়েন। এছাড়া ওই সময়ও তাঁকে অজ্ঞাতবাসে থাকতে হচ্ছিল। এই দুর্দিনে তিনি বাংলার বিপ্লবী চন্দননগরের শ্রীশচন্দ্র ঘোষকে ১,০০০ টাকা পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। অগ্নিযুগের শীর্ষস্থানীয় বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র রাসবিহারীর মতো চন্দননগরের ডুপ্লে স্কুলে পড়েছেন। তাঁর সঙ্গে রাসবিহারীর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল।

শ্রীশচন্দ্র ভেবেছিলেন, দিল্লি-লাহৌর-বারাণসী ষড়যন্ত্রের নায়ক রাসবিহারীর বিপদের কথা শুনলে ভারতীয়রা নিশ্চয় অর্থ সাহায্য করবেন। রাসবিহারীর নামডাক আছে, সুতরাং তাঁর নাম মন্ত্রশক্তির মতো কাজ করবে। তাই ব্যক্তির পেছনে না ছুটে, তিনি রাসবিহারীর পত্রটি সংবাদপত্রে ছাপিয়ে প্রকাশ করে দেন। কিন্তু দেখা গেল, কাগজে রাসবিহারীর চিঠি বা ওই সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের পর মনিঅর্ডারে তাঁর অর্থ সাহায্য জুটল সব মিলিয়ে ১৬ টাকা। শ্রীশচন্দ্র তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। তখন তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ওদিকে, শ্রীশচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিগতভাবে টাকা চাওয়ার বিষয়টি সংবাদপত্রে প্রকাশ করায় রাসবিহারী বিরক্ত হয়েছিলেন। শ্রীশকে তিনি পত্রে লেখেন, 'আমার ভিতরটা কি কেউ দেখছ, দেশের জন্য যে সবটা পেতে দিয়ে বসে আছি সেটা কি কেউ দেখছ? তারা বোধ হয় দেখে, আমি বোমা আর রিভলবার, আমি ষড়যন্ত্রের একটা মস্ত খেলোয়াড়। তারা আমায় জানবে কেন? ঘুম না ভাঙলে তারা আমায় জানবে কেন? তাদের কাছে টাকা চাওয়া কেন?' তারপর অবশ্য শ্রীশকে সান্ত্বনা দিয়ে লেখেন, 'আচ্ছা লড়ে যাব, তোমরা অত ভয় পেয়ো না'।

শ্রীশচন্দ্র সংবাদ পেলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের জাপান সাহায্য তহবিলের সংগৃহীত অর্থ মোট ৬২১ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তখনও শ্রীশচন্দ্রের মনে হল, এক হাজার তো হল না। তাই আবার তিনি মদনমোহন মালবীয় ও লালা লাজপত রায়কে চিঠি লিখলেন। কিন্তু সে চিঠিতেও কোনও কাজ হল না। শেষে শ্রীশ রাসবিহারীর চিঠি পেয়ে তাঁর জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ ত্যাগ করলেন।

১৯৩৭ সালে রাসবিহারী বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লব বা অস্ত্র ব্যবহার ছাড়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যাবে না। তাই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন।

১৯৩৯ সালে রাসবিহারী বসু সাংহাইতে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে যান। তখন রাসবিহারী হেরাম্বলালকে বলেন, 'ভারতের স্বাধীনতা যে করেই হোক ভারতীয়দের শক্তিবলে অর্জন করতে হবে। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ জাপানিদের দখলে চলে গেলে এই আন্দোলন সম্পূর্ণই পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে একটি শুভ সংবাদ আছে, কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু এখন জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। জাপানপ্রবাসী ভারতীয় সহকর্মীরা তাঁকে জাপানে আহ্বান করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। এই বিষয়ে আমি সমর্থন দিয়েছি, তুমি কি বল?' এই প্রশ্নের জবাবে হেরাম্বলাল তাৎক্ষণিক উত্তর দিলেন, 'আমি অবশ্যই রাজি। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিস্থিতি বুঝে ১৯৪০ সালে গান্ধীকে 'গতকালের লোক' বলে অভিহিত করে 'আজকের অবিসংবাদিত নেতা' হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসুর নাম তিনি ঘোষণা করেছিলেন।

১৯৪১ সালে অনেক বছরের পরাধীন ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষের মুক্তির সুযোগ তৈরি হয়। রাসবিহারী বসু বিশ্বস্ত এম.এন রায়কে মাঞ্চুরিয়াতে দূত হিসেবে পাঠিয়ে ভারতীয়দেরকে সংগঠিত করার দায়িত্ব দেন। একই সময়ে হেরাম্বলালও একই কর্মকাণ্ড সমাপ্ত করেন সাংহাইয়ে, হংকঙে।

১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখে টোকিওতে রাসবিহারী বসুর উদ্যোগে টোকিও, ইয়োকোহামা, ওসাকা, কোবে, নাগাসাকি প্রভৃতি জায়গায় বসবাসরত ৭০ জনেরও বেশি ভারতীয় জড়ো হয়ে 'ভারতীয় স্বাধীনতা লিগে'র মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় ও লিগের পতাকা উত্তোলন করেন। সভার শিরোনাম ছিল, 'আমেরিকা-ব্রিটেন ধ্বংস করো।' সম্মেলনের পর রাসবিহারী বসু রাজকীয় সেনা বাহিনীর দফতরে উপস্থিত হয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনের উপায় হিসেবে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর অনুমতিক্রমে জাপানি সেনাবাহিনীর ছোট্ট একটি ইউনিট হিসেবে হেরাম্বলালকে তার প্রধান করে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করা হয়, যার সদস্য সংখ্যা ছিল ৩,০০০।

১৯৪৩ সালের ১৬ মে সকালে সুভাষচন্দ্র বসু জাপানের মাটিতে পা রাখেন। তাঁর আসার আগে রাসবিহারী বসু ব্যাঙ্কক সম্মেলন শেষে প্রধান সেনা দফতরের মেজর জেনারেল আরিয়োশিকে বলেন, 'সম্প্রতি আমার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না, বয়সও হয়েছে। নেতৃত্ব দেওয়ার মতো শারীরিক অবস্থাও আমার নেই। জার্মানি প্রবাসী সুভাষচন্দ্র বসুকে জাপানে আমন্ত্রণের অনুরোধ করতে চাই'।

উত্তরে আরিয়োশি অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে বলেন, 'সরাসরি জিজ্ঞেস করছি, যদি সুভাষ বসুকে জাপানে আমন্ত্রণ জানানো হয় আর তাঁকে ভারতীয় স্বাধীনতা লিগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে প্রবাসীরা সম্মতি দেন তাহলে আপনার বর্তমান অবস্থান কী হবে'?

রাসবিহারী বসু দ্রুত ও খুব সহজে উত্তর দেন, 'সুভাষচন্দ্র বসু যদি প্রেসিডেন্ট হতে সম্মত হন, তাহলে তাঁর নীচে আমি সানন্দে কাজ করব'। রাসবিহারী বসুর এই সরল স্বীকারোক্তিতে শুধু আরিয়োশি নন, আশ্চর্য হয়েছিলেন মেজর ফুজিওয়ারা, এফ-কিকান ইউনিট প্রধান ইওয়াকুরোহিদেও প্রমুখ। জার্মানি থেকে সুভাষচন্দ্র বসুকে জাপানে আমন্ত্রণ জানানো ও তাঁকে আনার ব্যবস্থা করেন রাসবিহারী বসু।

১৯৪৩ সালের ৪-৭ জুলাই সিঙ্গাপুরস্থ মহাএশিয়া মিলনায়তনে ভারতীয় স্বাধীনতা লিগের প্রধান নেতৃবৃন্দের মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট রাসবিহারী বসু ওই সভায় নতুন অতিথি হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসুকে পরিচয় করিয়ে দেন। সেইসঙ্গে লিগের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসুকে স্থলাভিষিক্ত করার জন্য নিজের ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করেন। প্রবাসে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বমান্য সম্মানিত পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার কারণে রাসবিহারী বসু তখন তাঁকে 'নেতাজি' উপাধি ঘোষণা করেন। নেতাজি রাসবিহারী বসুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দু'ঘণ্টা ব্যাপী এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন।

এই সম্মেলনে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বস্তুত 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠনে রাসবিহারি বসুর অবদান অপরিসীম। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হলে সেই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন রাসবিহারী বসু।

১৯৪৪ সালের ২১ মার্চ আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতভূমির মণিপুরে প্রবেশ করে। এই ফৌজের কার্যবলী খুব দ্রুত ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তখন রাসবিহারী বসু খুবই আনন্দিত হন। কিন্তু ১৯৪৫ সালের শুরুতে জাপান আজাদ হিন্দ ফৌজ-কে যেভাবে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা প্রত্যাখান করে নেয়। মারণব্যাধি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত, অসুস্থ রাসবিহারী বসু এই খবর শুনে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি টোকিওর নিজগৃহে মারা যান।

দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে জাপান যাত্রার পরে রাসবিহারী বসু আর ঘরে ফেরেননি। এরপর ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি জাপানেই মারা যান। ১৯৫৭ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁর বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতসহ জাপান সফরে আসেন। কথিত আছে, তিনি রাসবিহারী বসু সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর নেননি।

মৃত্যুর আগে মহাপূর্ব-এশিয়া যুদ্ধ তথা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার মূল্যায়নস্বরূপ শোওয়া সম্রাট হিরোহিতো (১৯০১-৮৯) সর্বোচ্চ রাজকীয় সম্মান-পদক রাসবিহারী বসুকে প্রদান করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে আগ্রহী হননি বলে কন্যা তেৎসুকোর ভাষ্য থেকে জানা যায়। মৃত্যুর পর সেনাবাহিনীর সদর দফতর থেকে সেটা রাসবিহারী বসুর বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হয়।

মৃত্যুর ৬৯ বছর পরে, প্রায় ব্যক্তিগত উদ্যোগেই রাসবিহারী বসুর কবরের মাটি জাপানের তামা শহরে তাঁর সমাধি মন্দির থেকে নিয়ে এসেছেন চন্দননগর পুরসভার হেরিটেজ কমিটির সদস্যরা। সেই মাটি রাখা হয় রাসবিহারীর জন্মভিটে সুবলদহ গ্রামে। অনুষ্ঠানে জাপানের ডেপুটি কনসাল জেনারেল মিটসুটাকেন্যুমাহাটা বলেছিলেন, 'রাসবিহারী বসু দেশের স্বাধীনতা আনার জন্য জাপানে লুকিয়ে থেকেছেন। ভারতের পরাধীনতার লাঞ্ছনাকে তিনি ভোলেননি। সিঙ্গাপুরে আটকে পড়ে ভারতীয় সেনাদের নিয়ে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করে তার সর্বময়কর্তা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুকে। ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ায় আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর স্বপ্ন ছিল ভারতের মুক্তি। তাঁর জন্মভিটেতে দাঁড়াতে পেরে একজন জাপানি হিসেবে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি।'

নেতাজিকে রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্ন' প্রদান করা হয়েছে ১৯৯২ সালে। নেতাজি তবুও সম্মানিত হয়েছেন, কিন্তু রাসবিহারী বসুর ভাগ্যে কোনো পুরস্কারই জোটেনি, শুধু কলকাতার এক রাস্তার পাশে নির্মিত একটি বিসদৃশ প্রস্তরমূর্তি ছাড়া।

জাপানে প্রতিদিন শোওয়ার জন্য দক্ষিণ দিকে মাথা দিয়ে ঘুমোতে দেখে এক বন্ধু তাঁকে বলেন যে, বেহারী (এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন) তুমি দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে ঘুমাও সেটা ঠিক নয়। ভারাক্রান্ত স্বরে বেহারী জবাব দেন, 'তুমি রুষ্ট হয়ো না। আমি সারা দিনের শেষে ওইদিকে ভারত মায়ের কোলে মাথা রেখে নিজেকে প্রাণবন্ত করি'। তাঁর দেহের প্রতিটি কণা ছিল দেশের জন্যে উৎসর্গীকৃত। আমাদেরই দায়িত্ব এই বেহারিকে উপযুক্ত সম্মান জানানোর।

এবার পুজোয় বাড়িতেই থাকব

অপরাজিতা আঢ্য, অভিনেত্রী

ধর্ম যার যার নিজের কিন্তু উৎসব সবার। আমার কাছে দুর্গা পুজো নিছক ধর্ম নয়, এক সর্বজনীন উৎসব। ধনী-দরিদ্র সবাই এই উৎসবে সামিল হন। পুজো ঘিরে আমার মধ্যে সবসময়ে একটা নস্টালজিয়া কাজ করে। আগমনীর দিন অর্থাৎ মহালয়াকে আমার পুজো শুরু হয়। ছোটো বেলায় মহালয়ার দিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে তুলে দিতেন ও রেডিয়োয় মহালয়া শুনতাম। মা বলেন, মহালয়া শুনলে নাকি সাত জন্মের পাপ নাশ হয়। সেই থেকে রেডিয়োয় মহালায়া শুনে আসছি। এর সঙ্গে ছোটোবেলার অনেক স্মৃতি মিশে রয়েছে। ছোটোবেলা থেকে নাচতাম। তখন থেকে ইচ্ছা ছিল মহালায়ার দিন দুর্গা সাজার ও পরে অভিনয় জগতে এসে সেই আশা পূরণ হয়, প্রথম দূরদর্শনে মহালয়ার অনুষ্ঠানে দুর্গা সাজি ও পরে অন্য বেসরকারি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে দুর্গা সাজি। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে এই বিশেষ দিনে পিতৃ তর্পণ করি। পুজোয় প্রতি বছর খুব মজা করি। পুজোর ক'দিন নতুন নতুন শাড়ি পরি, ইচ্ছেমতো খাওয়া-দাওয়া করি। এ বছর শ্বশুর মারা গেছেন, ফলে যাবতীয় আনন্দ থেকে বিরত থাকব। পুজোর ৪টে দিন বাড়িতে থাকব, টিভিতে ঠাকুর দেখব। যদিও মন্ডপে মন পড়ে থাকবে।

হ্যাঁ, করোনার প্রকোপ এখনো পুরোপুরি কাটেনি। তাই সবার কাছে অনুরোধ পুজোয় আনন্দ করুন তবে সর্তকতা মেনে। পুজো ৪ দিনের কিন্তু বাঁচতে হবে সারা জীবন। মুখে মাস্ক পরে ও হাতে স্যানিটাইজার দিয়ে উৎসবে সামিল হন।

পুজো কাটাব দেশের বাড়িতে

বিশ্বনাথ বসু, অভিনেতা

অতিমারির যতই প্রকোপ থাকুক, পুজোর ক'টা দিন মহাআনন্দে মেতে থাকি। প্রতি বছরের মতো এবারও পুজোর ৪টে দিন কাটাব দেশের বাড়ি আরবেলিয়ার। আমা দের বাড়িতে প্রায় ৩৭০ বছরের পুজো হয়। পুজোর দিনগুলোয় আত্মীয় ও প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা মারব। আমি খেতে খুব ভালোবাসি। পুজোর ৪টি দিন আমাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার স্পেশাল আইটেম হয়। একটা স্পেশাল আইটেম লুচি ও কুমড়োর ছক্কা। অন্য সময়ে কুমড়ো খাইনা কিন্তু পুজোর সময় মাস্ট। আমাদের বাড়িতে বলি হয় নবমীর দিন ও সেই প্রসাদও খাই। আমাদের বাড়িতে পুজোর আর একটা স্পেশাল আইটেম গজা ভাজা। মোটা মোটা গজা তৈরি হয় ও তার স্বাদও ভোলা যায় না।বদপুজোর সময় সাধারণত কোথায় বেড়াতে যাই না। তবে একটা অনুরোধ, পুজোয় মজা করুন তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস এখন বিশ্বদরবারে

রাজ্যের অন্যতম পুরনো হস্তশিল্প বিষ্ণু পুরের দশাবতার তাস। অ্যান্টিক শিল্প হিসাবে যার চাহিদা বিশ্বজুড়ে। পুরনো এ শিল্পের প্রচার ও প্রসারে এগিয়ে এসেছেন বিষ্ণুপুরের হস্তশিল্পী শীতল ফৌজদার। তাঁর সঙ্গে একান্ত আলাপনে সৈকত হালদার।

বাংলার প্রায় সব জেলায় রয়েছে নিজস্ব হস্তশিল্প। প্রত্যেকটি শিল্পেরও আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, পুরুলিয়ায় ছৌ মুখোশ বা মালদার গম্ভীরা। আবার মেদিনীপুর পটের জন্য বিখ্যাত। ঠিক তেমনি বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যময় কুটিরশিল্প দশাবতার তাস, যা গোল তাস নামেও পরিচিত।

বিষ্ণুপুর ঘুরতে এলে পর্যটকদের কাছে সেরা আকর্ষণ এই দশাবতার তাস। বিদেশেও বিপুল চাহিদা। এখন তো আর খেলা নয়, ঘর সাজানোর শো পিস হিসাবে লোকে দশাবতার তাস কিনে নিয়ে যান।

প্রাচীন দশাবতার শিল্পের একমাত্র কারিগর বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবার। কয়েক পুরুষ ধরে তাঁরা এই হস্তশিল্পের কাজ করে চলেছেন। এই মুহূর্তে ফৌজদার পরিবারের ৮৭তম পুরুষ শীতল ফৌজদার প্রাচীন শিল্পের প্রচার ও প্রসারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। তিনি কাজ শিখেছিলেন কাকা ভাস্কর ফৌজদারের কাছে। মূলত তাঁর প্রয়াসে সারা বিশ্ব জেনেছিল দশাবতার তাসের কথা। লন্ডন, স্কটল্যান্ড, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি নানা দেশের আমন্ত্রণে তিনি সাগর পাড়ি দেন, অনেক পুরস্কারে সম্মানিত হন। তাঁর পর এ শিল্পের প্রসারে ও ধরে রাখতে অগ্রণী ভূমিকা নেন তাঁরই যোগ্য উত্তরাধিকারী।

ফৌজদার পরিবারের ৮৭তম বংশধর শীতল ফৌজদারের কাছ থেকে জানা গেল দশাবতার তাসের পুরনো ইতিহাস। বিষ্ণুপুরের রাজাদের নানান কীর্তির অন্যতম একটা হল দশাবতার তাস। যার মূল কারিগর ফৌজদার পরিবার। এ পরিবারকে আনা হয় রাজস্থান থেকে। ১৫৫২ সালে মোঘল সম্রাট আকবর কিল্লাজাত মহলের জমিদারি দেন ওড়িশার গজপতি ও বিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বিরকে।

সেই সময় রাজা হাম্বীর মোঘল দরবারে এক বিশেষ ধরনের তাস দেখেন। যাতে সেকালের মিনিয়েচার শিল্পীরা আঁকতেন অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, গড়পতি, ধনপতি, দলপতি, নৌপতি, স্ত্রীপতি, সুরপতি, অসুরপতি, বনপতি ও অশ্বপতির ছবি। রাজা মন্ত্রী নিয়ে মূল তাস হত ১২টা। সঙ্গে থাকত ১০টা করে প্রতীক যুক্ত তাস। এ তাসকে বলা হত মোঘল তাস। যাতে সবার বড়ো হত অশ্বপতি। যা বোঝাত দিল্লির সম্রাটকে। বাকি তাসে থাকত মান অনুযায়ী মহারাজ, ক্ষুদ্র দেশীয় রাজা,সেনাপতি ও অধিপতিরা। সেকালের দিল্লির দরবারের আদব-কায়দা সারা দেশে নকল করা হত। দিল্লির সম্রাটকে নকল করতেন নবাব, মহারাজা থেকে ছোটো রাজারা। তাঁদের ধারণা ছিল এভাবে মান বাড়বে। বিষ্ণুপুরের রাজাও এই অনুকরণপ্রিয়তাকে এড়াতে পারেননি। তিনি মোঘল দরবারের ওই বিশেষ ধরনের তাস খেলা দেখেই সেই তাসকে বিষ্ণুপুরে তৈরির কথা ভাবেন। তাসে হিন্দু অবতারের ভাবনা আসে সম্ভবত ওড়িশার 'গঞ্জিফা' থেকে। এখানে হিন্দু প্রতীক জায়গা পায়। বিষ্ণুপুরী দশাবতার তাসে তা'ই দেখা যায়।

বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসের ১টা সেট ১২০টা তাস নিয়ে। মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, জগন্নাথ ও কল্কি। বিষ্ণুর এই ১০ অবতারের মূর্তি আঁকা থাকে তাসে। সব অবতারের আবার ১২টা করে তাস। তার মধ্যে ১টা রাজা ও ১টা মন্ত্রী। বাকি ১০টায় থাকে অবতারের প্রহরণ বা জ্ঞাপক চিহ্ন। যেমন, মৎস্য অবতারের মাছ, কূর্মরের কচ্ছপ, বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র, বামনের হাঁড়ি, পরশুরামের টাঙ্গি, রামের বাণ, বলরামের গদা, জগন্নাথের পদ্ম, কল্কির তরবারি। হাম্বীরের সময় থেকে ফৌজদার পরিবার এ কাজ করে আসছেন।

দশাবতার তাস তৈরি হয় সুতির কাপড়ে। সময় লাগে প্রায় ১ মাস। উপাদান হিসাবে আগে ব্যবহার করা হত প্রাকৃতিক উপাদান ও রঙ। এখন সময়ের অভাবে ব্যবহার হয় বাজারের রঙ ও উপাদান। রঙ করার জন্য ফৌজদার পরিবার তুলি তৈরি করেন ছাগলের ল্যাজের চুল দিয়ে। শিল্পীকে কাজে সাহায্য করেন আরো ১০ থেকে ১২ জন লোক। সারা বছর তাস তৈরি হয়। তাসের পাশাপাশি তাঁরা নকশা তাস, হিন্দোল পুতুল ও মুখোশ তৈরি করেন। হিন্দোল পুতুলের ভালো চাহিদা। স্থানীয় লোকেরা নিয়ে যান 'মানত পুতুল' হিসাবে।

হস্তশিল্পী শীতল জানান,রাজা-জমিদার আমলে দশাবতার তাস খেলার রমরমা ছিল। পাশাপাশি চলত নকশা তাসের খেলাও। এখন আর সেদিন নেই। কিন্তু শো পিস বা অ্যান্টিক শিল্প হিসাবে কদর রয়েছে। দেশে ও বিদেশে। তাঁর তৈরি তাস ব্যাপকহারে যাচ্ছে বিদেশে। কলকাতার বিক্রি হয় ঢাকুরিয়ার দক্ষিণাপণের 'সৃষ্টিশ্রী'তে ও বিশ্ববাংলা বিপণন কেন্দ্রে। দেশ-বিদেশে চাহিদা থাকলেও শিল্পীর অভাব রয়েছে। লুপ্তপ্রায় এ শিল্পশৈলী শিখে অনেকে স্বনির্ভর হতে পারেন।

শীতল ফৌজদার সারা বছর ওয়ার্কশপ করেন নিজের বাড়িতে ও অন্যান্য জায়গায়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন তিনি যাবতীয় রঙ, তুলি ও কাগজের ব্যবস্থা করেন। আগ্রহীরা শিখে নিতে পারেন দশাবতার তাস, নকশা তাস, হিন্দোল পুতুল, মুখোশ ইত্যাদি পছন্দের জিনিস। এই ওয়ার্কশপ থেকে পণ্য কিনে স্থানীয় এলাকায় বিক্রি করতে পারেন।

গৃহস্থের ঘরে ঘরে সৌর সরঞ্জাম পৌঁছে দিতে চান সঙ্গীতা

গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে সৌর শক্তির ব্যবহার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাইছেন সানি ডে সলিউশনের কর্ণধার সঙ্গীতা সেন। আর এই উদ্যোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য সৌরশক্তি সরঞ্জাম নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করে চলেছেন। তবে সঙ্গীতা নিজেকে কখনোই সফল উদ্যমী হিসাবে ভাবতে রাজি নন। বরং তাঁর কথায়, সবে পথ চলা শুরু করেছি। বরং নিজেকে একজন সোলার এনার্জির অনুসন্ধানী ছাত্রী হিসাবে ভাবতে পছন্দ করি। সোলার শক্তি বিষয় এখনো অনেক অজানা দিক রয়ে গেছে, যেগুলো জানতে বুঝতে ও সাধারণ মানুষের কাজে লাগাতে চাই।

সঙ্গীতা পেশায় একজন ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারিগরি পর্ষদ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ২০০৪ সালে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা কোর্স পাশ করার পর নানান শিল্প সংস্থায় অনেকদিন ধরে সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার, প্লান্ট সুপারভাইজার ও ডেপুটি ম্যানেজারের পদে কাজ করেছেন। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ লাইসেন্সিং বোর্ড থেকে ইলেক্ট্রিক্যালে লাইসেন্সিং পাশ করেছেন। বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল নিজের শক্তির অপচয় করছেন। বরং নিজের মেধাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজস্ব উদ্যোগ গড়ে তুলতে পারলে অনেক বেশি উন্নতি করা যাবে ও সেইসঙ্গে আরো ৫ জন ছেলেমেয়ের কাজের সুযোগ তৈরি করা যাবে। এ ভাবনা নিয়ে তিনি বেসরকারি সংস্থার চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবসা করার আগে নিজেকে তৈরি করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা থেকে নানা ধরনের ট্রেনিং নেন। যেমন রাজ্য যুবকেন্দ্র থেকে অটোক্যাডের ট্রেনিং নিয়েছেন, ইনস্টিটিউট অফ অটোমেশন অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে পিএলসি ট্রেনিং নিয়েছেন, ব্যবসা করার জন্য কলকাতা এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট থেকে ৪ সপ্তাহের অঁত্রেপ্রেনিওরশিপ ডেভেলপমেন্টের ট্রেনিং নিয়েছেন। ট্রেনিং চলাকালীন কো-অর্ডিনেটর বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে নানাভাবে উৎসাহ জোগান ও পথের হদিশ দেন। নিজের বিষয়ের সঙ্গে মিল থাকায় সঙ্গীতা সৌরশক্তিকে ব্যবসার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেওয়ার পরিকল্পনা করেন ও এইক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য গীতাঞ্জলী সোলার এন্টারপ্রাইজ থেকে রিনিউয়েবল এনার্জি টেকনোলজি ও সলিউশন বিষয়ে ১ মাসের ট্রেনিং নেন। এই সংস্থার কর্ণধার ও প্রশিক্ষক অনুপম বড়াল তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন। মূলত তাঁকেই তিনি পথপ্রদর্শক হিসাবে ভাবেন।

সঙ্গীতা ২০১৮ সালে ১ লাখ টাকার পুঁজি নিয়ে শুরু করেন নিজস্ব উদ্যোগ সানি ডে সলিউশন। তাঁর সংস্থায় রয়েছে ৩ জন কর্মী। ব্যবসার ক্ষেত্রে তিনি ৩ ধরনের পরিষেবা দেন — (১) সোলার প্যানেল ইনস্টলেশন, (২) সোলার প্যানেল মেনটেন্যান্স ও (৩) সোলার আইটেম সেলস অ্যান্ড সার্ভিসিং। সঙ্গীতা নিজে প্রশাসনিক ও বিপণনের কাজ দেখেন ও তাঁর সংস্থার ইনস্টলেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ব্যাক অফিস স্টাফ হিসাবে কাজ করেন বিজন গায়েন। আর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করেন অর্ণবজ্যোতি মণ্ডল। মাত্র ১ বছর ব্যবসা শুরু করলেও তাঁর সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবহণ দফতরের পাটুলি বাস টার্মিনাল, সুলেখা বাস টার্মিনাল, জনকল্যাণ বাস টার্মিনালে সোলার ইনস্টলেশনে কাজ করেছেন। পাশাপাশি কাজ করেছেন ডোমেস্টিক ক্ষেত্রে। তিনি মূলত লাইট, ফ্যান, টিভি অপারেশনের গ্রিড সিস্টেমের জন্য কাজ করেন। নিজের ব্যবসার পাশাপাশি নানান স্কুল-কলেজে সোলার এনার্জি বিষয়ে ট্রেনিং ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করেন। সঙ্গীতা জানান, প্রাকৃতিক শক্তি ক্রমশ নিঃশেষিত হওয়ায় আগামী দিনের ভরসা একমাত্র সৌরশক্তি। কিন্তু সাধারণ মানুষ এখনো এবিষয়ে সচেতন নন। তাই সৌরসামগ্রীর ব্যবহার করতে এখন আগ্রহ দেখান না। তাঁর লক্ষ্য, শিল্পসংস্থার বড় কাজ নয়, গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে সৌরশক্তির ব্যবহার। গৃহস্থালীতে কী ধরনের সৌরসামগ্রী ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে তিনি রীতিমতো গবেষণা করছেন। সঙ্গীতা জানান, আগামী দিনে তিনি এইসব ক্ষেত্রে সৌরশক্তির ব্যবহার নিয়ে কাজ করতে চান — অ্যাগ্রিকালচার, ফিশারি, সোলার পাম্প, রেইন সোলার আইটেম, গিফট সোলার ক্যাপ, সোলার টয়, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেল। গ্রামের যেসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনো বিদ্যুৎ এসে পৌঁছয়নি, সেইসব এলাকায় পৌঁছে দিতে চান সৌরশক্তির সরঞ্জাম।

নাট্যমঞ্চ

অগ্নিশ্বরের মতো চরিত্রে অভিনয় করার স্বপ্ন দেখি

প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়** মঞ্চ ও পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা। ৩ দশকের বেশি সময় ধরে দাপিয়ে নানা মাধ্যমে কাজ করে চলেছেন। স্বপ্ন দেখেন মঞ্চে নতুন কিছু করার। প্রবীণ অভিনেতার সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় সৈকত হালদার

প্রশ্ন : একদিকে ডাক্তারি আর অন্যদিকে অভিনয়। ২টো কাজ একসঙ্গে কিভাবে সামলান?

বাসুদেব মুখোপাধ্যায় : অভিনয় আমার নেশা আর ডাক্তারি আমার পেশা। ২টো আলাদা জগতের কাজের মধ্যে ভারসাম্য রাখি টাইম ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে। যখন যেখানে কাজ করি একশো ভাগ দেওয়ার চেষ্টা করি। তাই বোধহয় ২টো জায়গায় আমি সফল। দর্শকরা আমায় ভালোবাসেন।

প্রশ্ন : আচমকা অভিনয়ের জগতে কীভাবে এলেন?

উত্তর : আচমকা আসিনি, বরং বলা ভালো আমি আগে অভিনয়ে এসেছি ও পরে ডাক্তারিতে। আমরা থাকতাম মুর্শিদাবাদের শিমুলিয়া বলে একটা গ্রামে। জায়গাটা ছিল মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের মাঝামাঝি। বাড়িতে দুর্গাপুজোর সময় মঞ্চ বেঁধে নাটক হত। ছোটোবেলা থেকে সেখানে নাটক করি। পরে গ্রুপ থিয়েটারে যোগ দিই। পিএলটি-সহ নানা দলে নাটক করেছি। অভিনয় ছাড়াও নির্দেশক হিসাবে কাজ করেছি। বলাবাহুল্য এখনো করে চলেছি।

প্রশ্ন : কোন কোন নাটকে অভিনয় করে খুব খুশি হয়েছেন?

উত্তর : প্রথমে বলতে হয় 'কাবুলিওয়ালা'র কথা। এই নাটকে আমি কাবুলিওয়ালার চরিত্রে অভিনয় করি। খুব পরিশ্রম করে ওই চরিত্র ফুটিয়ে তুলি। এই নাটকের অন্তত ২৫টা শো হয়েছে। শেষ শো হয় কলকাতার মধুসূদন মঞ্চে। এ বছরে লকডাউনের আগে এই নাটক মঞ্চস্থ হয়। তপন সিংহ'র পরিচালনায় 'কাবুলিওয়ালা' চলচ্চিত্র হয় যেখানে অভিনয় করেন কিংবদন্তি অভিনেতা ছবি বিশ্বাস। নাটক দেখতে এসে অনেকেই ২জনের অভিনয়ের মধ্যে তুলনা করেন। এ ছাড়াও 'কর্ণাজুন', 'গিরিশ ঘোষ' নাটকে অভিনয় করে খুব খুশি হয়েছি। 'নটী বিনোদিনী' যাত্রাপালায় গুর্মুখ রায়ের চরিত্রে কাজ করে খুব ভালো লাগে। এ ছাড়াও সম্প্রতি সুমন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'মেফিস্টো'তে এক ছোটো চরিত্রে কাজ করে খুব আনন্দ পেয়েছি। দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা পেয়েছি। এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ থেকে ৬০টা নাটকে অভিনয় করেছি।

প্রশ্ন : আপনি কী ক্লাসিক ধাঁচের কাহিনি বেশি পছন্দ করেন?

উত্তর : ঠিক তাই। আমি সবসময়ে বলি, বাংলা সাহিত্যে এমন অমূল্য রত্ন রয়েছে যা দিয়ে অনেক ভালো সিনেমা ও নাটক হতে পারে।

প্রশ্ন : আপনার নিজের নাটকের দল কী?

উত্তর : আমাদের নাটকের দল থিয়েটার প্র্যাক্টিশনার। গত ৪ বছর হল এই দলকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। দলের প্রযোজিত জনপ্রিয় নাটক 'নতুন আলো'।

প্রশ্ন : দলের প্রযোজনায় নতুন কোনো নাটক করার কথা ভাবছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, গৌতম মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তর্দর্শন' নাটক মঞ্চস্থ করা হবে। এটা হালকা হাসির নাটক। আশা করি দর্শকদের ভালোলাগবে।

প্রশ্ন : নাটক নিয়ে কোনো স্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

উত্তর : অভিনয়ের সূত্রে অনেক গুণী মানুষের সান্নিধ্যে এসে ধন্য হয়েছি। একবার ডাঃ সরোজ গুপ্তর ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে 'শ্রীমতী ভয়ঙ্করী' নাটকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করি। ওই নাটক দেখতে এসেছিলেন অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চ থেকে বেরিয়ে তাঁকে দেখে প্রণাম করি। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বলেন, ওই ভাষায় দুয়েকটা সিনে অভিনয় করা যায় কিন্তু গোটা নাটকটা টেনে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। তাঁর কথা আজও আমার কানে বাজে। আরেকবার ওই ঠাকুরপুকুর হাসপাতালে এক অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে ডাঃ সরোজ গুপ্তর ঘরে গিয়ে দেখি অভিনেতা রবি ঘোষ আমার জন্য বসে আছেন। তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে তিনি বলেন, ভানুদা বলেছেন, ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে তাই এলাম। মহানায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। অনেকবার কথা হয়েছে কিন্তু এক সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ হয়নি। ওঁর নাতি গৌরবের সঙ্গে দুর্গায় একসঙ্গে কাজ করেছি। গৌরব আমাকে আঙ্কেল বলে ডাকে। পুলুদা (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) আমার খুব পিছনে লাগতেন। মজা করে বলতেন, তুই আমাদের ভাত মারতে এসেছিস।

প্রশ্ন : অভিনয় নিয়ে কোনো চাপা দুঃখ রয়েছে?

উত্তর : একটা আফশোস রয়েছে। অভিনেতা উৎপল দত্তের সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ পেলাম না। আমি যখন গ্রুপ থিয়েটারে চুটিয়ে অভিনয় করা শুরু করি, তখন উনি চলে গেলেন। তবে শোভাদির অনুরোধে পিএলটি'র 'কল্লোল' নাটকে উৎপলদার অভিনীত চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। যার পুরো কৃতিত্ব ছিল শোভাদির।

প্রশ্ন : সিরিয়ালে কবে এলেন?

উত্তর : ১৯৯৮ সালে অভিজিৎ দাশগুপ্তের পরিচালনায় 'প্রতিঘাত' সিরিয়ালে প্রথম অভিনয় করি। এটা ডিডি-৭ এ সম্প্রচারিত হয় ও খুব জনপ্রিয় হয়।

প্রশ্ন : আপনি অনেক সিরিয়ালে কাজ করেছেন। কোন সিরিয়ালে কাজ করে খুব আনন্দ পেয়েছেন?

উত্তর : এখানে আকাশ নীল, প্রতিবিম্ব, ইস্টিকুটুম প্রভৃতি সিরিয়ালে অভিনয় করে খুব ভালো লেগেছে। আকাশ ৮'এর 'সাহিত্যের সেরা সময়' সিরিজের অনেক পর্বে কাজ করেছি। আমি শেষ অভিনয় করি 'কৃষ্ণকলি'তে। কিছুটা একঘেঁয়েমি চলে আসায় আপাতত সিরিয়ালে কাজ করছি না। সিরিয়াল নিয়ে একটা মজার কথা বলি। একবার চেম্বার থেকে গাড়ি করে বাড়ি ফিরছি। রাস্তায় গাড়ি থামায় আমার ড্রাইভার জানায়, স্যার ওই সার্জেন্ট আপনাকে দেখছেন। তাঁর কাছে যেতে ওই সার্জেন্ট বলেন, স্যার চালিয়ে যান ভালো হচ্ছে আমি রোজ দেখছি। তখন 'ইস্টিকুটুম' সিরিয়াল চলছিল। নাটকের চেয়ে অনেক বেশি পরিচিতি পেয়েছি সিরিয়ালে কাজ করে।

কাবুলিওয়ালা নাটকে বাসুদেব ও শিশুশিল্পী

প্রশ্ন : আপনি কোনো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি প্রথম অভিনয় করি ১৯৭২ সালে 'আমি সিরাজের বেগম'এ। নাম ভূমিকায় ছিলেন বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। ওই সিনেমায় আমি একজন প্রেমিকের চরিত্রে অভিনয় করি। সন্দীপ রায়ের পরিচালনায় 'রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য' ও ফেলুদা সিরিজে কাজ করেছি।

প্রশ্ন : আপনি নানা মাধ্যমে কাজ করেছেন। আপনার পছন্দের মাধ্যম কোনটা?

উত্তর : মঞ্চ আমার সবচেয়ে পছন্দের জায়গা। নাটক আমার প্রাণ।

প্রশ্ন : আজকাল সিনেমা বা সিরিয়ালের জনপ্রিয় অভিনেতাদের নিয়ে নাটক করানো হয়। এতে কী নাটকের মান পড়ে যায়?

উত্তর : এটা ভালো কি মন্দ বলতে পারব না। বাণিজ্যিক কারণে দর্শক টানতে সিনেমা বা সিরিয়ালের জনপ্রিয় অভিনেতাদের নিয়ে নাটক করানো হয়। কিন্তু সিনেমা বা সিরিয়ালের অভিনয়ের সঙ্গে নাটকের অভিনয়ের অনেক পার্থক্য রয়েছে। মঞ্চের অভিনয়ের ধরন, ভাষা ও আঙ্গিক আলাদা। দু'য়েক জন ছাড়া সিনেমা বা সিরিয়ালের জনপ্রিয় অভিনেতারা নাটকে গিয়ে খুব বেশি সাফল্য পাননি। যাঁরা সফল হয়েছেন তাঁরা সবাই মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রী।

প্রশ্ন : লকডাউনের জন্য নাট্যকর্মীরা চরম সঙ্কটে পড়েছেন। এ বিষয়ে আপনার মত কি?

উত্তর : হ্যাঁ, লকডাউনের জন্য মঞ্চে নাটক বন্ধ থাকায় নাট্যকর্মীরা বিশেষ করে নেপথ্যকলাকুশলীরা চরম অর্থ সঙ্কটে ভুগছেন। তাঁদের সিনেমা বা সিরিয়ালে কাজের সুযোগ নেই। যেটা রয়েছে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। নাটকের কলাকুশলীদের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা তাঁদের মাথার ওপর কোনো 'পেরেন্ট বডি' নেই। যেমন সিরিয়ালের কলাকুশলীদের জন্য রয়েছে ফেডারেশন বা গিল্ড। নাটকের কলাকুশলীদের জন্য এটা গড়ে ওঠা দরকার। একসঙ্গে দলবেঁধে এগিয়ে আসতে হবে নাটকের সব দলকে। এখন নাটকের জগৎ ২টো ভাগ হয়ে গেছে। যারা সরকারি অনুদান পায় ও যারা অনুদান পায় না। যারা অনুদান পায় তারা সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে কাজ করে।

প্রশ্ন : আপনার কী মনে হয় করোনার পর নাটকের আঙ্গিকের কোনো বদল আসবে?

উত্তর : নাটক এক লাইভ পারফরম্যান্স। তা কখনো অনলাইনে সম্ভব নয়। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো যায় না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে ও প্রেক্ষাগৃহ চালু হলে আবার দর্শকরা হলে নাটক দেখতে আসবেন। তবে আতঙ্কের জন্য দর্শকের সংখ্যা অনেক কমে যাবে। সেক্ষেত্রে বড়ো প্রযোজনা করার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। হল ভাড়া দিয়ে নাটকের খরচ উঠবে না। ছোটো ছোটো স্পেসে নাটকের সংখ্যা বাড়বে। সময়ের সঙ্গে নাটকের আঙ্গিক ও ভাষা বদলায়।

প্রশ্ন : সম্প্রতি শুনলাম, এক ওয়েবপেজে আপনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা কবিতা পড়েছেন। কেমন লেগেছে?

উত্তর : ওই ওয়েব পেজে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আমার খুব প্রাণের কবিতা 'জন্ম হয় না/ মৃত্যু হয় না ' পড়েছি। সুনীলদার আমার খুব কাছের ও প্রিয় মানুষ ছিলেন। ওঁর বুধসন্ধ্যার আড্ডায় অনেকবার গেছি।
ওঁর গল্প বলার ভঙ্গি ছিল অসাধারণ। আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। একবার ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালের এক অনুষ্ঠানে ওঁর লেখা নাটক মঞ্চস্থ হয় যেখানে মুখ্য ভূমিকায় আমি অভিনয় করি। সুনীলদা ওই নাটক দেখতে এসে আমার অভিনয় দেখে বলেন, তুমি আমার চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলে।

প্রশ্ন : একজন ডাক্তার হিসাবে আপনার স্বপ্নের চরিত্র কী?

উত্তর : একজন ডাক্তার হিসাবে আদর্শ ডাক্তারের চরিত্রে অভিনয় করতে চাই। সেক্ষেত্রে আমার স্বপ্নের চরিত্র 'অগ্নিশ্বর'। ওই চরিত্রের সঙ্গে আমার মনের মিল খুঁজে পাই। এ ছাড়াও আমার ইচ্ছে করে 'জলসাঘর'এর ওই জমিদারের চরিত্রে অভিনয় করার।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক মঞ্চে অভিনয় আমার জীবনে বড়ো পাওনা : সেঁজুতি

বাংলা নাটকের এই মুহূর্তে অন্যতম অগ্রণী অভিনেত্রী **সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়**। তিনি বিখ্যাত নির্দেশক অসিত মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে। এ বছর শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন। নিজের নাট্যজীবন আর তাঁর নাট্য নির্দেশক ও সহশিল্পীদের নিয়ে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় সৈকত হালদার

প্রশ্ন : একদিকে অধ্যাপনা অন্যদিকে অভিনয়। একই সঙ্গে দু'টো কাজ কীভাবে সামলান?

সেঁজুতি মুখোপাধ্যায় : আমার কাছে দু'টো কাজের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই। বরং একটা অন্যটার পরিপূরক। মঞ্চে অভিনয় শেষে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখে বুঝতে পারি সেদিনের অভিনয় ভালো না খারাপ হল, ঠিক তেমনি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখ দেখে বুঝতে পারি পড়ানো ভালো না খারাপ হল। দু'টো কাজ আমি খুব মন দিয়ে করি। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আমি শিক্ষিকা আর বিকেল ৫টার পর থেকে মঞ্চের 'সিরিয়াস' অভিনেত্রী।

প্রশ্ন : আপনার নাটকে আসা নিশ্চয় বাবাকে দেখে?

উত্তর : ঠিক তাই। নাটক আমার রক্তে। বাবা অসিত মুখোপাধ্যায় নামি ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে নাটকের জগতে আসেন। অবশ্য এক্ষেত্রে মায়ের অনেক উৎসাহ ও অবদান ছিল। ছোটোবেলায় আমরা থাকতাম মনোহরপুকুর রোডে। বাসন্তীদেবী কলেজের ঠিক উলটো দিকে সুরতীর্থে নানা গ্রুপ থিয়েটারের নাটকের মহড়া হত। বাবা তখন ছিলেন 'গান্ধার' দলে ও পরে তৈরি করেন 'চুপকথা'। ওই সব দেখে আমার মধ্যে নাটকের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় ও ধীরেধীরে বাবার হাত ধরে নাটকের জগতে আসি।

প্রশ্ন : প্রথম অভিনয়?

উত্তর : ৭-৮ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' নাটকে প্রথম অভিনয় করি।

প্রশ্ন : বাবার নির্দেশনায় কোন কোন নাটকে অভিনয় করেন?

উত্তর : বাবার প্রযোজনায় ও নির্দেশনায় 'আকরিক', 'জন্মদিন', 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করি। সব নাটকই খুব জনপ্রিয় হয়।

প্রশ্ন : পুরোপুরি নাটকের জগতে কবে এলেন?

উত্তর : আমি নাটককে কোনোদিন পেশা করিনি। লেখাপড়ার পাশাপাশি নাটক করতাম। আমার অ্যাকাডেমিক রেকর্ড যথেষ্ট ভালো ছিল। জুলজি নিয়ে পড়েছিলাম। লেখাপড়ার শেষে কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দিই। ২০০০ সালে আচমকা বাবার মৃত্যুর পর বুঝতে পারি, নাটক ছাড়া বাঁচতে পারব না। অন্য কিছু করতে পারব না। মূলত, ওই সময় থেকে নাটককে আরো বেশি আঁকড়ে ধরি।

প্রশ্ন : বাবার 'চুপকথা' দলের কী হল?

উত্তর : বাবার প্রতিষ্ঠিত 'চুপকথা' অভিনেত্রী ডলি বসুর দখলে চলে যায়। আমরা এককথায় দল থেকে বিতাড়িত হই। এ নিয়ে আর কিছু বলতে চাই না। বরং অন্য দলে কাজ শুরু করি।

প্রশ্ন : এরপর কোন দলে নাটক করেন?

উত্তর : যোগ দিই উষা গাঙ্গুলির 'রঙ্গকর্মী' দলে। উষাদির নির্দেশনায় প্রথম অভিনয় করি 'মুক্তি' নাটকে। আমার সঙ্গে ছিলেন কেতকীদি (কেতকী দত্ত)। শুধু এই রাজ্যে নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই নাটকের শো হয়। উষাদির নির্দেশনায় বেশ কিছু হিন্দি নাটকেও অভিনয় করি। এরমধ্যে রয়েছে 'বদনাম', 'মান্টো', 'শোভা দত্ত', 'চেহেরে' আর 'শ্রী গণেশ মহিমা'। সব নাটক খুব হিট করে।

প্রশ্ন : আর কোন কোন নির্দেশকের সঙ্গে কাজ করেছেন?

উত্তর : এই সময়ের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠিত নির্দেশকের সঙ্গে কাজ করেছি। যেমন, কৌশিক সেন, সুমন মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, অবন্তী চক্রবর্তী, ডাঃ তপনজ্যোতি দাস।

প্রশ্ন : কার কাজের ধরন কেমন?

উত্তর : সবার কাজের ধরন আলাদা। কৌশিকদার (কৌশিক সেন) নির্দেশনায় 'যদুবংশ' নাটকে কাজ করি। তখন কলেজে পড়তাম। আমার সহ-অভিনেতা ছিলেন রজতাভ দত্ত ও কাঞ্চন মল্লিক। ওই নাটক ছিল ৪টে ছেলের গল্প। আমি রনিদার কাকীমার চরিত্রে অভিনয় করি। কৌশিকদা কাজের ক্ষেত্রে খুব সিরিয়াস ও ডিসিপ্লিনড। ফাঁকি বরদাস্ত করেন না। সুমন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'মেফিস্টো' ও 'রাজা লিয়র' নাটকে অভিনয় করি। গুজরাট দাঙ্গার সময় 'মেফিস্টো' প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এই নাটক ৩ বার করা হয়েছে। সুমনদা (মুখোপাধ্যায়) কাজের সময় মনে মনে সব চরিত্রের একটা ছবি এঁকে রাখেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে শিল্পীদের খুব স্বাধীনতা দেন। জোর করে কিছু কারোর ওপর চাপিয়ে দেন না। পছন্দ না হলে নিজের পছন্দের কথা জানান।

প্রশ্ন : বিভাস চক্রবর্তীর পরিচালনায় কোন নাটকে অভিনয় করেন?

উত্তর : প্রবাদপ্রতিম নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় অন্য থিয়েটারের প্রযোজনায় 'নটী কিরণশশী' নাটকে অভিনয় করি। বিভাস চক্রবর্তী হলেন 'মাস্টার ডিরেক্টর'। তাঁর কথা আর আলাদা করে কী বলব!

প্রশ্ন : দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় কী কাজ করেন?

উত্তর : দেবেশদা (চট্টোপাধ্যায়) নির্দেশনায় 'নিঃসঙ্গ সম্রাট'এ কাজ করি। সহ-অভিনেতা ছিলেন দেবশঙ্কর হালদার। এই নাটক সুপারহিট হয়। দেবেশদা কাজের ক্ষেত্রে নানা দৃশ্যকল্প তৈরি করে থাকেন। এককথায় দেবেশদা হলেন নাটকের ভাস্কর।

প্রশ্ন : পরিচালক অবন্তী চক্রবর্তীর সঙ্গে কী কী কাজ করেন?

উত্তর : অবন্তী এই সময়ের অন্যতম প্রতিভাময়ী নির্দেশক। ওঁর নির্দেশনায় অনেক অভিনয় করেছি। যেমন, পুতুলের চিঠি, ইচ্ছের অলিগলি, তিন কন্যা, রঞ্জাবতী সেন, ট্রয় প্রভৃতি।

প্রশ্ন : আর কোনো নির্দেশকের কথা বলতে চান?

উত্তর : হ্যাঁ, নির্দেশক ডাঃ তপনজ্যোতি দাসের কথা বলতে চাই। পেশায় ডাক্তার কিন্তু নেশা নাটক। ওঁর নির্দেশনায় আগে 'তথাগত' ও 'ধর্মাশোক' এ অভিনয় করছি। এখন অভিনয় করছি 'মেদেয়া' নাটকে। তপনজ্যোতি নারীকেন্দ্রিক নাটক করেন যা বাংলা সিনেমা ও নাটকে খুব কম হয়। বেশিরভাগ নাটক হয় পুরুষকেন্দ্রিক।

এক নাটকের দৃশ্যে সেঁজুতি ও সহশিল্পী

প্রশ্ন : কোন কোন সহ-অভিনেতার সঙ্গে কাজ করে খুব খুশি হয়েছেন?

উত্তর : সবার সঙ্গে কাজের অনুভূতি ও ভালোলাগা অন্যরকম। আলাদা করে কিছু বলতে চাই না। রনিদা (রজতাভ দত্ত) আমার দাদার বন্ধু। ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক দাদা-বোনের মতো। দেবুদার (দেবশঙ্কর হালদার) সঙ্গে জুটি বেঁধে অনেক নাটক করেছি, সব নাটক সুপারহিট। দেবুদা মহড়ায় যেমন থাকেন, মঞ্চেও তেমন। অনির্বাণ ভট্টাচার্যও দারুণ। তবে আমার জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা কিংবদন্তি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক মঞ্চে অভিনয় করা।

প্রশ্ন : কেমন ছিল ওই অভিজ্ঞতা?

উত্তর : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'আত্মকথা' নাটকে অভিনয় করি। ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রথম দিনের কথা আজও ভুলতে পারিনি। ওঁর গল্ফগ্রিনের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যান নাটকের প্রযোজক বিলু দত্ত। খুব টেনশনে ছিলাম। দেখা হওয়া মাত্র সাদরে অ্যাপায়ন করে কিংবদন্তি অভিনেতা আমাকে বলেন, তোমার অভিনয় দেখেছি। এটুকু বলতে পারি আমার সঙ্গে অভিনয় করে তোমার ভালো লাগবে। ওঁর একটা কথাতেই আমার টেনশন দূর হয়ে যায়। 'আত্মকথা' নাটকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও ছিলেন লিলি চক্রবর্তী ও পৌলমী চট্টোপাধ্যায়। ওই নাটকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একজন লেখকের ভূমিকায় অভিনয় করেন ও আমি ছিলাম তাঁর সহকারী। আমার চরিত্রের নাম ছিল প্রজ্ঞা। লেখক তাঁর সঙ্গে নানা নারীর সম্পর্কের কথা বলে যান ও শেষ পর্যন্ত প্রজ্ঞাও বয়সের বিশাল পার্থক্য সত্ত্বেও লেখকের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। ওঁর সঙ্গে এক মঞ্চে কাজের সুযোগ পাওয়া আমার জীবনের এক বড়ো পাওনা। বাবার মতো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও মঞ্চে খুব সাবলীল ও ফ্রি অ্যাকটিং করতেন। অভিনেয় চরিত্রকে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতেন। ওঁর সঙ্গে অভিনয় করে নিজেকে অনেক সমৃদ্ধ করেছি, যা পরে কাজে লেগেছে।

প্রশ্ন : নির্দেশক-অভিনেতা ব্রাত্য বসুর সঙ্গে কোনো নাটক করেছেন?

উত্তর : ব্রাত্যদার নির্দেশনায় নয়, ওঁর সহ-অভিনেতা হিসাবে অভিনয় করেছি দেবাশিস রায়ের নির্দেশনায় 'মূল্য' নাটকে। ব্রাত্যদা সহ-অভিনেতাদের কাজের প্রতি সবসময়ে মনোযোগ রাখেন ও তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অসাধারণ। একটা শো'তে আমাকে বলেন, আগের বার ওই দৃশ্যে তোমার যে হাসিটা দেখেছিলাম এবার সেভাবে হাসলে না কেন? এই সব ছোটোখাটো বিষয়েও সমান নজর রাখতেন।

প্রশ্ন : থিয়েটার ছাড়া আপনি কি চলচ্চিত্র ও সিরিয়ালে কাজ করেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি সুমন মুখোপাধ্যায়ের 'হারবার্ট', সুমন ঘোষের 'কাদম্বরী', অপর্ণা সেনের ' ইতি মৃণালিনী', ইন্দ্রনীল চৌধুরীর 'ফড়িং', সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ' সিনেমায় অভিনয় করেছি। অঞ্জন দত্ত ও শতরূপা সান্যালের টেলিফিল্মে অভিনয় করেছি। ছোটোপর্দায় 'পৌষ ফাগুনের পালা' মেগাসিরিয়ালে কাজ করেছি। এ ছাড়াও মুম্বইয়ে 'ধূসর' ও অমিতাভ চ্যাটার্জির 'আমি ও মনোহরা' ছবিতে অভিনয় করি। অমিতাভর ওই ছবি কেরালা চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়। বেশ কিছু ওয়েব সিরিজেও কাজ করেছি।

প্রশ্ন : নানা মাধ্যমে কাজ করেছেন, প্রিয় জায়গা কোনটা?

উত্তর : কাজের ব্যাপারে আমার কোনো ছুঁতমার্গ নেই। অভিনয়ের সুযোগ থাকলে সব জায়গায় কাজ করি। তবে আমার প্রাণের জায়গা মঞ্চ ও নাটক।

প্রশ্ন : নাটকে কি নতুন মেয়েরা এগিয়ে আসছেন?

উত্তর : মেয়েদের ক্ষেত্রে সমস্যা হল, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর তাঁদের পক্ষে আর এগোনো সম্ভব হয় না। পুরোপুরি সংসারি হওয়ার পর আর অনেকে নাটক করতে সময় পান না। আমাদের সঙ্গে যাঁরা নাটক করা শুরু করেছিলেন, অনেকে আর নাটকের সঙ্গে নেই। একটা সময় ছেলেমেয়েরা নাটকে আসতেন সিরিয়ালে সুযোগ পাওয়ার আশায়। এখন রেপার্টারি চালু হওয়ায় ও সরকারি অনুদান আসায় অনেক প্রতিভাবান ছেলেমেয়েরা নাটকচর্চাকে সিরিয়াস ভাবে নিচ্ছেন। আমার কলেজের অনেক ছেলেমেয়ে চুটিয়ে নাটক করেন।

প্রশ্ন : নাটককে কি পেশা হিসাবে নেওয়া যায়?

উত্তর : আমাদের এখানে সেই আর্থিক পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। শুধুমাত্র নাটক করে জীবন চালানো কঠিন। পাশাপাশি চলচ্চিত্র ও সিরিয়ালে অভিনয় করতে হবে। দেবশঙ্কর হালদার এই মুহূর্তে নাটকের 'স্টার'। তাঁকে দেখে অনেকে এগিয়ে আসছেন।

প্রশ্ন : নাটকের ক্ষেত্রে আপনি কলকাতা ও জেলার মধ্যে কোনো বিভাজন রয়েছে?

উত্তর : নাটককে কোনো ভৌগোলিক সীমায় বাঁধতে চাই না। ভালো নাটকের কদর সবসময়ে রয়েছে। জেলার নানা দলের প্রযোজিত নাটক কলকাতাকে টেক্কা দিতে পারে।

প্রশ্ন : করোনা- অতিমারি নাটকে কতটা প্রভাব ফেলেছে?

উত্তর : দীর্ঘদিন প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ থাকায় নাট্যকর্মীরা চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। অনেকে পেশা বদল করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে নানা নাটকের দল। এক্ষেত্রে নাট্য আকাদেমির আরো সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার দরকার ছিল। সব দল ও নাট্যকর্মীদের আর্থিক সাহায্য দিতে পারত।

প্রশ্ন : করোনার পর নাটক কি বদলে যাবে?

উত্তর : নানা জায়গায় ছোটো ছোটো স্পেস গড়ে উঠেছে। যেমন

গোবরডাঙা, অশোকনগর, দমদম ও আরো কিছু জায়গায়। ওখানে অন্তরঙ্গ নাটক হচ্ছে। কলকাতার কোনো প্রেক্ষাগৃহর মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে না। আগামীদিনে এই ধরনের জায়গায় আরো বেশি নাটক হবে। করোনার পর নাটকের আঙ্গিক ও কাহিনিতে বদল আসবে।

প্রশ্ন : সিনেমা হল খুলে গেল, এবার কি নাটকের হল খোলা উচিত নয়?

উত্তর : অবশ্যই, স্বাস্থ্যবিধি মেনে কম লোক নিয়ে অবিলম্বে নাটকের হল খোলা দরকার। তবে, শহরের বড়ো হল খোলার আগে দেখে নেওয়া দরকার সেসব কী অবস্থায় রয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের দিকে নজর দিতে হবে।

প্রশ্ন : সিনেমা-সিরিয়ালের প্রতি সরকার যতটা যত্নবান, নাটকের প্রতি ততটা নয় কেন?

উত্তর : নাটক সবসময়ে 'মাইনরিটি' শিল্প। কখনো 'মাস'এর জন্য নয়। নাটকের মাধ্যমে সমাজের ভালো-মন্দ চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়। বেশিরভাগ সময়ে নাটক প্রতিষ্ঠান বিরোধী কথা বলে, যা প্রতিষ্ঠানের পছন্দ নয়। আবার সরকারি সাহায্য ছাড়া থিয়েটার বাঁচিয়ে রাখাও সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : দর্শকদের কী বলতে চান?

উত্তর : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে হলে এসে নাটক দেখুন। ভালো নাটক দেখে মন ভালো করুন।

দর্শকদের কথা ভেবেই নাটক লিখি : উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

গত দু'দশক কলকাতায় নাটককার হিসাবে **উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের** নাম দেখে অনেক দর্শক নাটক দেখতে যান। বাংলার নাট্য ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য নাট্যককারদের তালিকায় তিনি এর মধ্যেই ঠাঁই করে নিয়েছেন। তাঁর নাট্যভাবনা ও কাজের ধারার কথা শুনলেন **সৈকত হালদার**

প্রশ্ন : আপনি কীভাবে নাটক লেখা শুরু করেন?

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় : স্কুলে পড়ার সময় থেকে আমার অভিনয় ও লেখালিখির ঝোঁক ছিল। তখন একটু-আধটু কবিতা লিখতাম। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি নিয়ে পড়ার সময় সহপাঠী-বন্ধুদের সাহচর্যে নাট্যচর্চায় উৎসাহ বাড়ে। মূলত বন্ধুদের অনুরোধে একটা নাটক লিখি।

প্রশ্ন : ওই নাটকের নাম কী?

উত্তর : 'নীলিমা'। ২০-২৫ মিনিটের এক ছোটো নাটক। আমরা বন্ধুরা মিলে অভিনয় করি। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় ওই নাটক নানা বিভাগে পুরস্কার পায়। যেমন, অভিনয়, পরিচালনা, নাটক লেখা প্রভৃতি ক্যাটেগরিতে। এভাবেই আমার নাটক লেখার সূত্রপাত।

প্রশ্ন : তারপর?

উত্তর : উৎসাহিত হয়ে আমরা বন্ধুরা মিলে অধিকারী অভিনয় কেন্দ্র নামে একটা দল তৈরি করি। এই দলের প্রযোজনায় হরিশচন্দ্র-শৈব্যা, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে 'আশ্চর্য দীপক' ও আমার লেখা 'গল্পে যা বলা হয়নি' — এই ৩টে নাটক আমরা বিজন থিয়েটারে মঞ্চস্থ করি। কিন্তু আশা অনুযায়ী দর্শক পায়নি। এমনকী নামি পত্রিকায় নাটক নিয়ে ভালো রিভিউ হয়নি।

প্রশ্ন : তখন কি ভেঙে পড়লেন?

উত্তর : না, ওই সময়ে আমি দার্জিলিঙ কলেজে চাকরি পেয়ে চলে যাই কিন্তু নাট্যচর্চা থামাইনি। ঠিক ৩ বছর পর হুগলি মহসীন কলেজে বদলি হয়ে আসি। তখন নক্ষত্র দলের শ্যামল ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়। ওঁকে আমার লেখা 'মুন্না' নাটক পড়তে দিই ও উনি উৎসাহ নিয়ে 'মুন্না' নাটক করেন। প্রথম শো হয় আকাদেমিতে। অভিনয় করেন দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বৈশাখী মার্জিত। এটাই আমার প্রথম বড়ো নাটক, যা দর্শকদের সমাদার পায়। এরপর ওই নক্ষত্র'র সম্পাদক মানিকদার (পদবি মনে নেই) মাধ্যমে নির্দেশক পঙ্কজ মুন্সীর সঙ্গে পরিচয় হয়। উনি আমার 'অন্তরাল' নাটক মঞ্চস্থ করেন। ওই নাটক সত্যেন মৈত্র স্মৃতি পুরস্কার পায়।

প্রশ্ন : তারপর আপনার নাটক কে মঞ্চস্থ করেন?

উত্তর : অসিত মুখোপাধ্যায় আমার 'আকরিক' নাটক মঞ্চস্থ করেন ও তা প্রচুর প্রশংসা পায়। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক নাটক লিখেছি।

প্রশ্ন : নাটক লেখার ক্ষেত্রে আপনার অনুপ্রেরণা কে?

উত্তর : চেকভ ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

প্রশ্ন : এ পর্যন্ত ক'টা নাটক লিখেছেন?

উত্তর : প্রায় ১৫০ ছাড়িয়ে গেছে।

প্রশ্ন : কোন কোন নাটক লিখে খুব খুশি হয়েছেন?

উত্তর : এ ভাবে বলা কঠিন। আমার প্রতিটা নাটক আমার সন্তানের মতো। কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব? তবু এর মধ্যে 'অদ্য শেষ রজনী', 'ত্রিনয়ন', 'অথৈ জল', 'মনসামঙ্গল', 'আকরিক', 'বিলে', 'এক মঞ্চ এক জীবন' প্রভৃতি নাটক লিখে খুব ভালো লেগেছে। 'অদ্য শেষ রজনী' বায়োপিক নাটক।

প্রশ্ন : আপনার নাটক নিয়ে কোন কোন নির্দেশক কাজ করেছেন?

উত্তর : পঙ্কজ মুন্সী, অসিত মুখোপাধ্যায়, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, কৌশিক সেন, সুমন মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়, অনীশ ঘোষ, বিভাস চক্রবর্তী, ঊষা গাঙ্গুলি, অমিতাভ দত্ত, ব্রাত্য বসু, সৌমিত্র মিত্র, দেবাশিস দত্ত-সহ এই সময়ের প্রতিষ্ঠিত প্রায় সব নির্দেশক আমার নাটক নিয়ে কাজ করেছেন।

প্রশ্ন : কোনো মহিলা নির্দেশক আপনার নাটক পরিচালনা করেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, সঞ্জিতা আমার 'ত্রিনয়নী' পরিচালনা করেন ও অবন্তী চক্রবর্তী

আমার 'কুসুম কুসুম' পরিচালনা করেন। এই নাটকে সুজন মুখোপাধ্যায় একক অভিনয় করেন। এ ছাড়াও বৈশাখী মার্জিত আমার 'একা' নাটকটা করেন।

প্রশ্ন : 'বহুরূপী'ও তো আপনার লেখা নাটক করে?

উত্তর : হ্যাঁ, বহুরূপী আমার লেখা এই ৩টে নাটক প্রয়োজনা করে ধৃতবানশী, পতিপক্ষ ও আয়না হরিণ।

প্রশ্ন : প্রয়াত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আপনার কোনো নাটকে অভিনয় করেছেন?

উত্তর : আমার সে সৌভাগ্য হয়নি। তবে ওঁর অনুরোধে ৩ রায় — উপেন্দ্রকিশোর রায়, সুকুমার রায় ও সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে একটা কথিকা লিখেছিলাম। জন্মদিনে ওই কথিকা তিনি পড়েছিলেন।

প্রশ্ন : নির্দেশক ও অভিনেতা ব্রাত্য বসুর সঙ্গে আপনার এত ভালো রসায়ন কীভাবে গড়ে উঠল?

উত্তর : ব্রাত্য বসুর সঙ্গে এখন পর্যন্ত আমি ৫টা কাজ করেছি। তার মধ্যে রয়েছে অদ্য শেষ রজনী, ২১ গ্রাম, ব্যোমকেশ ও অথৈ জল। আমি ওঁর ডিকশনারি সিনেমার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব গুহ'র ২টি গল্প নিয়ে এই সিনেমার কাহিনি লিখি ও চিত্রনাট্য করি। আসলে উনি নির্দেশক-অভিনেতা ছাড়াও একজন নাটককার ও লেখক হওয়ার জন্য অন্য লেখকদের সহজে বুঝতে পারেন। আমাদের দু'জনের কাজে আমি যদি ৭০ ভাগ করি, তাহলে উনি ১০০ ভাগ করে নেন। আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য এই রসায়ন গড়ে উঠেছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'অদ্য শেষ রজনী' অবলম্বনে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা নাটকের এক দৃশ্য

প্রশ্ন : আপনি কোন কোন চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লিখেছেন?

উত্তর : আমি আগেই ব্রাত্য বসুর 'ডিকশনারি'র কথা বললাম।

এ ছাড়া রাজা সেন পরিচালিত 'আত্মীয়স্বজন'এর চিত্রনাট্য আমার লেখা। পরিচালক ল্যাডলি মুখোপাধ্যায় আমার লেখা ৭-৮টা টেলিফিল্মের স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করেছেন।

প্রশ্ন : চলচ্চিত্রর চিত্রনাট্য আর লিখছেন না কেন?

উত্তর : ডিকশানির পর আর কোনো পরিচালক-প্রযোজক আমাকে লেখার জন্য ডাকেননি।

প্রশ্ন : চলচ্চিত্র না নাটক — কোন ক্ষেত্রে আপনি বেশি স্বচ্ছন্দ?

উত্তর : আমি নাটকে বেশি স্বচ্ছন্দ। নাটকে মঞ্চ, আলো, শব্দপ্রেক্ষণ, দর্শক সবকিছু মিলিয়ে এক ম্যাজিক রয়েছে। এটা লাইভ পারফরম্যান্স বলে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া জানা যায়। দর্শকদের সঙ্গে একটা সরাসরি যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন : আপনি এই সময়ের একজন সেলেব্রিটি নাট্যকার। আপনার জনপ্রিয়তার কারণ কী?

উত্তর : আমি সেলেব্রিটি বা জনপ্রিয় কিনা তা দর্শকরা বলবেন, সাংবাদিকরা বিচার করবেন। তবে মানি, দর্শকরা আমার নাটক পছন্দ করেন। আমি যখন যে নির্দেশকের জন্য নাটক লিখি ঠিক তাঁর মতো করে লেখার চেষ্টা করি। তাঁর মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করি। মেঘনাদদার জন্য যখন লিখি তখন সেখানে একটা গল্প রাখার চেষ্টা করি, আবার যখন ব্রাত্য বসুর জন্য নাটক লিখি সেখানে জটিল মনস্তত্ত্বর প্রসঙ্গ রাখি। আবার কৌশিক সেন বা সুমন মুখোপাধ্যায়ের জন্য তাঁদের উপযোগী করে নাটক লেখার চেষ্টা করি। সর্বোপরি দর্শকদের ভালোলাগার জন্য নাটক লিখি। দর্শকদের অকারণে জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করি না। সিনেমা-নাটকে শেষ কথা বলে দর্শক।

প্রশ্ন : আপনার নাটকে অনেকে অভিনয় করেছেন, কাকে আপনার বেশি ভালোলাগে?

উত্তর : খুব শক্ত প্রশ্ন। সবাই ভালো অভিনয় করেন। খুব ভালোলাগে দেবশঙ্কর হালদার, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, সঞ্জিতা ও সেঁজুতির অভিনয়। আমার লেখা ও পরিচালনায় রঙ্গিনী নাটকে একক অভিনয়ে গার্গী রায়চৌধুরী আমাকে মুগ্ধ করেন।

প্রশ্ন : আপনি একটা নাটক লিখতে কতদিন সময় নেন?

উত্তর : এটা নির্ভর করছে ওই নাটকের ওপর। কোনো নাটক লিখতে ৭ দিন লাগে, কোনো নাটক লিখতে ৬ মাস লাগে, আবার কোনো নাটক লিখতে আমার প্রায় ২ বছর লেগেছে। যেমন, অদ্য শেষ রজনী ৭ দিনে লিখেছি। বিদ্যাপতি লিখতে দেড় বছর লেগেছে।

প্রশ্ন : অনেকে মনে করেন, জনপ্রিয় সাহিত্যিকরা নাটক লিখলে নাটকের উন্নতি হত। আপনার কী মত?

উত্তর : এই ধারণার সঙ্গে আমি একমত নই। উপন্যাস বা গল্প লেখা আর নাটক লেখা এক নয়। অনেক জনপ্রিয় লেখক নাটক লিখতে এসে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি এল রায়, মাইকেলের মতো ব্যতিক্রমী প্রতিভা খুব কম পাওয়া যায়। তাঁদের এই আলোচনায় টেনে আনতে চাই না।

প্রশ্ন : আপনার কী মনে হয় আমাদের এখানে নাট্যকাররা খুব ব্রাত্য?

উত্তর : শুধু এই সময় কেন, আগেও নাট্যকাররা গুরুত্ব পাননি। অনেক জনপ্রিয় নাটক পরিবেশন করা হয় অথচ নাট্যকারের নাম আমরা জানতে পারি না। আর নতুনদের ক্ষেত্রে আরো সমস্যা তাঁদের নাম বিজ্ঞাপন বা পোস্টারে ব্যবহার করা হয় না। নির্দেশক বা অভিনেতারা ভাবেন তাঁদের জন্য নাটক চলে, ফলে আলাদাভাবে নাট্যকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার দরকার নেই।

প্রশ্ন : নতুন ছেলেমেয়েরা নাটক লেখায় এগিয়ে আসছেন না কেন?

উত্তর : একবার প্রবীণ নাট্যকার চন্দন সেন আমায় বলেছিলেন, নতুন ছেলেমেয়েরা নাটক লিখে আর দেখাতে আসেন না। অথচ আমরা নতুন নাটক লেখার পর সিনিয়র নাট্যকারদের পরামর্শ নিতাম। নতুনদের সেই মন আর নেই। তার একটাই কারণ, নাটক লিখে আর্থিক স্বচ্ছলতা পাওয়া যায় না। খুব নাম না হলে কেউ পয়সা দিতে চান না। বরং সিরিয়াল লিখে অনেক পারিশ্রমিক পাওয়া যায়। তাছাড়া এখন অনেক নির্দেশক নিজেরাই নাটক লেখেন। আলাদাভাবে অন্য কাউকে দিয়ে নাটক লেখাতে চান না। তবে নাটকের উন্নতি ও বৈচিত্র্যের জন্য নতুনদের নাটক লেখার জগতে আসা খুব দরকার।

প্রশ্ন : অতিমারি নাটকের জগতে কতটা প্রভাব ফেলল?

উত্তর : ভয়ঙ্কর ক্ষতি করেছে। আমার অন্তত ৫-৬টা নাটক পাইপলাইনে ছিল, সেসব এখনো হতে পারল না। মঞ্চে নাটক বন্ধ থাকায় সার্বিকভাবে নাট্যশিল্পী-কলাকুশলীরা চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। কী ভাবে এই ক্ষতিপূরণ হবে জানি না।

প্রশ্ন : মঞ্চে নাটক বন্ধ থাকলেও অনেক দল অনলাইনে নাট্যচর্চা করছেন। এই নিয়ে আপনার মত কী?

উত্তর : নাটক লাইভ পারফরম্যান্স, তা কখনো অনলাইনে সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় করোনার পরের অধ্যায়ে নাটকের ক্ষেত্রে কোনো বদল আসবে?

উত্তর : নাটকের আঙ্গিকের কোনো বড়ো বদল না এলেও নাটক পরিবেশনা বা মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে বদল আসতে পারে। অনেকে আতঙ্কে বড়ো প্রেক্ষাগৃহে

নাটক দেখতে আসবেন না। ছোটো ছোটো দল বড়ো প্রেক্ষাগৃহে নাটক করার সাহস দেখাবেন না। কারণ বিপুল খরচ সামলাতে পারবে না। সেক্ষেত্রে অন্তরঙ্গ, মুক্ত মঞ্চ ও ছোটো ছোটো স্পেসে নাটকের সংখ্যা বাড়বে। তবে, মঞ্চে নাটকের কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন নাট্যকর্মীদের কোনো ফোরাম গড়ে তোলা দরকার?

উত্তর : অতিমারি পরিস্থিতিতে অনেক নাট্যদল, সংগঠন নানা ভাবে নাট্যকর্মীদের সাহায্য করেছে। পাশে রয়েছে। তবে নেপথ্য কর্মীদের জন্য একটা ফোরাম থাকলে ভালো হয়।

প্রশ্ন : এই মুহূর্তে আপনার পরিকল্পনা কী?

উত্তর : পুরনো সব নাটক পুনর্নির্মাণের কাজে ব্যস্ত রয়েছি। বাংলা নাটকের ইতিহাস চর্চা করে তার ওপর নাটক লেখায় ধ্যান দিয়েছি।

প্রশ্ন : আপনি অর্থনীতির অধ্যাপক। নাটকে অর্থনীতির বিষয় রাখেন না?

উত্তর : আমার নাটক অর্থনীতি, সমাজনীতি বা রাজনীতি সব বিষয়ই থাকে। কিন্তু তা কখনো প্রচারমূলক হয় না। ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকি কিন্তু তা সূক্ষ্মভাবে বলার চেষ্টা করি।

প্রশ্ন : দর্শকদের কী বলতে চান?

উত্তর : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে ও প্রেক্ষাগৃহ চালু হলে আবার সবাই নাটক দেখতে আসুন।

হৃদমাঝারে সহজ মা

বিয়ের পর বেছে নিয়েছেন বাউলানি জীবন। লোকগানে নতুন ধারা এনে শ্রোতাদের মনে ঝড় তুলেছেন। সহজিয়া পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন সহজ মা। লিখেছেন **সৈকত হালদার**।

বাংলার লোকগানের ঐতিহ্য ও পরম্পরা অনেক পুরনো। গুণী শিল্পীর অভাব নেই। প্রত্যেকে নিজের নিজের ক্ষেত্রে স্বনামধন্য। গায়কিতে হয়ত অনন্য। কিন্তু উচ্চাঙ্গ সংগীত ও লোকগানের সংমিশ্রণে এক ফিউশন তৈরি করে বাংলা লোকগানে একটা নতুন ধারা এনেছেন বাউলানি সহজ মা। বিশ্ব-জয় করেছেন। বাজার তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছে। গুরু গোসাঁই- মা গোসাঁইয়ের সাধন পথে প্রাণের মানুষের সন্ধান করে চলেছেন। তাঁর গান শ্রোতাদের হৃদমাঝারে ঝড় তুলেছে। মা হওয়া কী মুখের কথা? আরো কঠিন সহজ মা হওয়া। কঠিন সাধনার পথ পেরিয়ে হওয়া যায় সহজিয়া। সহজ মায়ের আসল নাম শর্মিষ্ঠা বসু। তিনি ছিলেন বড়লোকের দুলালি। বাড়ির বাইরে পা রাখলে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত। ছোটোবেলায় দুঃখ-কষ্ট কী তা কোনো দিন টের পাননি।

গানের তালিম

বাউল বা লোকসঙ্গীত শিল্পী হিসাবে আজ জনপ্রিয় হলেও তাঁর গানের চর্চাটা ছিল অন্যরকম। তাঁর মায়ের গানের প্রতি অনুরাগ ছিল। ঠাকুমারও। ঠাকুমার মুখে প্রথম বাউল ও পল্লি গীতি শুনেছেন। মা ঘুম পাড়াতেন রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে। তাঁর মুখ থেকে নাকী প্রথম শব্দ বেরোয়' সা'। খাতার পাতায় বইয়ের পেছনে লিখে রাখতেন সদ্য শোনা গান। গুনগুন করতেন সুর। যতক্ষণ ঠিক সুরটা রপ্ত করতে পারতেন না, ততক্ষণ অস্থির থাকতেন। বাবার আগ্রহে গান শেখেন। মেয়ের গানের ঝোঁক দেখে বাবা পাঠিয়েছিলেন এম আর গৌতমের কাছে। ৭ বছর তালিম নেওয়ার পর সুনন্দা পট্টনায়কের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শেখেন। অজস্র ভজন শিখেছিলেন। শিক্ষিকা যে ভাবে শেখাতেন তা চটপট ধরতে পারতেন, পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে সহজ মা জানান, 'সুনন্দাদির ওখানে জগন্নাথদেবের ছবি থেকে মাঝে মাঝে মালাটা খসে পড়ত আমার মাথায়। আর পড়লেই সুনন্দাদি বলতেন, ছোটকু-টার হবে। কিছু একটা হবেই।'

লেখাপড়া ও গান

শর্মিষ্ঠা ওরফে সহজ মা'র লেখাপড়ার শুরু রানিকুঠির কাছে অশোক হলে। তারপর সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্সে। শেষে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। ইতিহাস ছিল তাঁর পছন্দের বিষয়। ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পড়েছিলেন। আর ইতিহাস পড়তে পড়তে গড়ে উঠেছিল অনুসন্ধানের আগ্রহ। তবে কলেজের শিক্ষক-ছাত্রদের তাঁর গানে বেশি আগ্রহ ছিল। নিজেও লেখাপড়ার থেকে গানে বেশি ধ্যান দিতেন। গাইতেন আধুনিক গান। গীতা দত্ত ও আশা ভোঁসলের অন্ধ ভক্ত ছিলেন। পছন্দ করতেন লতা মঙ্গেশকর ও মান্না দে'র গান।

বিয়ে, উৎপল ও বাউল

বিয়ের পর স্বামী (ওঁর ভাষায় ক্ষ্যাপা) উৎপল ফকির তাঁর জীবনটা পুরোপুরি পালটে দেন। উৎপল ফকির গোড়া থেকেই ছিলেন বাউল-ফকির গানের উপাসক- গবেষক ও কবি। গানে পুরোপুরি মন সঁপে দিলেও শর্মিষ্ঠার অস্থিরতা কম ছিল না। শেষ পর্যন্ত পথ দেখালেন উৎপল। তাঁর সঙ্গে বর্ধমান, বাঁকুড়ার আউল-বাউলের আখড়ায় গিয়ে বাউল গানের মর্ম বোঝার চেষ্টা করেছেন ও সেই সঙ্গে খুঁজেছেন জীবনের মানে। সাধন দাস বৈরাগী ও মাকুকাজুমা, তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু।

শর্মিষ্ঠা থেকে সহজ মা হয়ে ওঠা

সহজ মা জানান, 'আমার বাবা-মা'য়ের দেওয়া নাম ছিল শর্মিষ্ঠা। তা উৎপলের সঙ্গে যেদিন গুরুজী সাধন দাস বৈরাগীর কাছে দীক্ষা নিতে গেলাম, সেদিন তিনি বললেন, 'বাউল গানের সঙ্গে শর্মিষ্ঠা নামটা ঠিক খাপ খাচ্ছে না। আমাদের ঘরে দীক্ষা নেওয়ার পর আমরা শিষ্যের নাম পালটে দিই। তোর নাম রাখলাম সহজ মা। ভাবিস না, এই নামটা নিয়ে ছেলেখেলা করছি। মনে কর, তোর ঘাড়ে একটা বোঝা চাপিয়ে দিলাম। দেখি তুই কতটা সহজ হতে পারিস।' জানেন, একটা কথা আছে — ভালো-মন্দের মাঝখানে সহজ রয় অতি গোপনে। এই জায়গাটা এখন আমাকে খুঁজতে হচ্ছে। বাউল গান গাইতে নেমে, এখন বুঝছি — সহজ হওয়াটা কত কঠিন।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলেন সহজ মা।

দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁর স্বামী উৎপল দাস পোদ্দারের নামও হল উৎপল ফকির।

গানের অ্যালবাম

এইচ এম ভি থেকে তাঁর গানের প্রথম অ্যালবাম বেরোয় ২০০৫ সালে। এই অ্যালবাম বেরোনোর পেছনে একটা গল্প রয়েছে। শিল্পী জানালেন, 'একটা টিভি চ্যানেলে 'আল্লা মেহেরবান' গানটা শুনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এইচএমভি সা-রে-গা-মা'র শুভজিৎ রায়। এসে বললেন, বাউল গানের একটা ভিডিও অ্যালবাম ও ক্যাসেট করতে চান। ভাংরা, পপ গান যদি বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌঁছে যেতে পারে, তাহলে আমাদের বাউল গান কেন পৌঁছে দেওয়া যাবে না। প্রথমে ভাবা হয়েছিল অ্যালবামটা এমনভাবে করা হবে, যাতে মাটির টান থাকে। পরে ফিউশন মিউজিক দেওয়া হল। প্রায় ২ মাস লেগেছিল অ্যালবামটা তৈরি করতে। শ্যুটিং হয়েছিল আজমের শরিফ ও পুস্কর অঞ্চলে। সে বছর সেপ্টেম্বর মাসে ফোক-টেল অ্যালবামটা রিলিজ হয় ও দারুণ জনপ্রিয় হয়। এরপর তাঁকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি।' এ পর্যন্ত সহজমা'র ১৯টা গানের অ্যালবাম বেরিয়েছে। জনপ্রিয় অ্যালবামের মধ্যে রয়েছে — 'ক্ষ্যাপা-ক্ষেপির আখড়া', 'ভাব নগর', 'জয়-জয় লোকনাথ', 'অপার লালন', 'প্রাণের মানুষ', 'ধুম লেগেছে' ইত্যাদি। দেশের নানা জায়গায় ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশে অনুষ্ঠান করেছেন। অনুষ্ঠানের জন্য পেয়েছেন অনেক প্রশংসা ও সম্মান।

জীবন দর্শন

বাউল মানে ক্ষ্যাপা। ব্যাখ্যাটা নানা মুনির নানা মতেই করেন। কিন্তু সহজ মা'র স্পষ্ট কথা —'স্বামী উৎপল ফকিরের পথই আমার পথ। অদ্বৈত আচার্য্যের লেখা সেই হেঁয়ালি জানেন? 'বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল / বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল/ বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল / বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল' — আমি যে সেই বাউল। অনেক ঘুরেছি। তত্ত্বকথা শুনেছি, কিন্তু লালন ফকির, কুবের গোঁসাইদের গান প্রাণ ঢেলে গাইতে পারা আমার সেরা শিক্ষা। সেরা জীবন দর্শন। নিজের গানের ধারা নিয়ে সহজ মা'র কথা — বাউল গানের যে পরম্পরা, তা খুব শক্তিশালী। এখানে আমার ভূমিকা সামান্য। 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে' মাত্র। ধ্রুপদী গানের সঙ্গে লোকসঙ্গীতকে মিশিয়ে একটা ফিকশন গাওয়ার চেষ্টা করি, যা মানুষের হৃদয় ছোঁয়। মানুষকে ভালোলাগানো ও মানুষকে ভালোবাসাই আমাদের ধর্ম।'

স্বপ্ন ও সাধনা

সহজ মা ও উৎপল ফকির ঠিক যেন 'মেড ফর ইচ আদার'। সংসারে থেকেও তাঁরা সন্ন্যাসী। সাজ-পোশাক থেকে জীবনযাপন অতি সরল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে মাটির গন্ধ। যাদবপুরে নিজের বাড়িতেই গড়ে তুলতে চান 'ফোক আকাদেমী'। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের লোকগানের শিক্ষা দিয়ে যোগ্য শিষ্য/শিষ্যা তৈরি করতে চান। লোকগানের পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান নিজেদের গানের মাধ্যমে।

নাটকের মাধ্যমে রাজনীতির কথা বলি : সুজন মুখোপাধ্যায়

এই সময়ের নাটকের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব **সুজন মুখোপাধ্যায়**, যাঁকে সবাই নীল নামে চেনেন। এই সময়ের নাটক নিয়ে তাঁর নানান অনুভূতি জানালেন **সৈকত হালদারকে**

প্রশ্ন : এই মুহূর্তে আপনি কোন নাটকের মহড়া নিয়ে ব্যস্ত?

সুজন মুখোপাধ্যায় : আপাতত আমি 'মেফিস্টো' নাটকের মহড়ায় ব্যস্ত। নতুন বছরে মানুষের ঘুম ভাঙাতে চায় 'মেফিস্টো' (নির্দেশনা সুমন মুখোপাধ্যায়)।

প্রশ্ন : একদিকে সিরিয়াল ও অন্যদিকে সিরিয়াস নাট্যচর্চা। গ্ল্যামারের আড়ালে কি নাটকের অভিনেতা সুজন চাপে পড়ে যাচ্ছেন?

উত্তর : সিরিয়াল আমার পেটের ভাত জোগায় আর নাটক আমার মনের খিদে মেটায়। নাটকের পরিবেশে বড়ো হয়েছি, নাটক আমার রক্তে। মঞ্চ আমার প্রথম প্রেম।

প্রশ্ন : আপনার বন্ধুরা অনেকে রাজনীতিতে গেলেন। আপনাকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে দেখা যায়। এটা কি ইচ্ছা করে করেন?

উত্তর : কে বলল আমি রাজনীতিতে নেই? প্রতিবাদে মিছিলে পথ হেঁটেছি ভুলে গেলেন? সিনেমা বা সিরিয়াল আমার নিজের কথায় হয় না। কিন্তু আমার নাটক দেখলে বোঝা যাবে সেখানে রাজনীতির কথা আসে। নাটকের মাধ্যমে আমার রাজনৈতিক দর্শন প্রকাশ পায়। হ্যাঁ, যদি বলেন সক্রিয় কোনো দলীয় রাজনীতির কথা, সেক্ষেত্রে বলব সিনেমা, সিরিয়াল ও নাটক নিয়ে সারাদিন এত ব্যস্ত থাকি, অন্য কিছু ভাবার সময় পাই না। তাছাড়া যার যেখানে দক্ষতা তার সেটাই করা দরকার। আমি একমাত্র অভিনয় করতে পারি, অভিনয় মন দিয়ে করি।

প্রশ্ন : লকডাউনের সময় ও ঠিক তারপর দেখা গেল, অনেক দল নিজেদের ছোটো ছোটো স্পেসে অন্তরঙ্গ নাটক করছেন। আগামীদিনে অন্তরঙ্গ নাটক কি প্রসেনিয়ামের বিকল্প হয়ে উঠবে?

উত্তর : আমি প্রসেনিয়াম নাটকের লোক। তবে এটা ঠিক ওই সময় অনেক ছোটো ছোটো নাটকের জায়গা তৈরি হয়েছে, অন্তরঙ্গ নাটকের চর্চা অনেক বেড়েছে। তার একটাই কারণ, কম খরচে অনেক কম জায়গায় অন্তরঙ্গ নাটক করা যায়। অনেকটা শর্ট ফিল্মের মতো। অন্যদিকে, প্রসেনিয়াম নাটক করার খরচ অনেক বেশি ও বড়ো লাগে। তবে বড়ো ক্যানভাসে যে ছবি দেখতে ভালো লাগে তা কি ছোটো ক্যানভাসে ভালো লাগে? তাছাড়া উৎপাদন বেশি হলে অনেক সময় তার গুণগত মান ঠিক থাকে না। ফলে, কেউ কারোর বিকল্প হতে পারে না। প্রসেনিয়ামের গুরুত্ব সবসময়ে থাকবে। দর্শকরা প্রেক্ষাগৃহে নাটক দেখতে আসবেন।

প্রশ্ন : অনেকের অভিযোগ, 'স্টারডম' নাটকের ক্ষতি করছে। আপনি কী বলেন?

উত্তর : একটু অন্যভাবে দেখলে যাঁরা অভিযোগ করছেন, সমস্যাটা তাঁদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জেলাসি থেকে আসছে। কোনো নামি পরিচালক যদি তাঁদের সিনেমা ও সিরিয়ালে অভিনয়ের সুযোগ দেন, তাহলে কি তাঁরা অভিনয় করবেন না? সুযোগ পাচ্ছেন না বলেই এই অভিযোগ। রনিদা (রজতাভ দত্ত), খরাজদা (খরাজ মুখোপাধ্যায়) বা কাঞ্চনকে দেখার জন্যই যদি কেউ নাটক দেখতে আসে, তাহলে ক্ষতি কি? এক্ষেত্রে তো নাটকেরই উপকার হচ্ছে। অনেক কষ্ট করে ওইসব অভিনেতাদের নিজেদের জায়গা তৈরি করে নিতে হয়েছে। দর্শকরা তাঁদের স্টার তৈরি করেছেন। যদিও আমি 'স্টার' কথাটা বিশ্বাস করি না, নাটকে শিল্পী থেকে কলাকুশলী সবাই স্টার।

প্রশ্ন : আপনার নাটকের দল 'চেতনা' নিয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : আগামী বছর চেতনার ৫০ বছর পূর্তি হবে। নানা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। পুরনো নাটকের পাশাপাশি কিছু নতুন চমক থাকবে।

বিনোদন

তারকার কথা

বিন্দু মাসির জন্য সবাই মনে রাখবে

অভিনেত্রী অনামিকা সাহা একদিকে যেমন খলনায়িকা বিন্দু মাসি থেকে শুরু করে দজ্জাল শাশুড়ির ভূমিকায় নজর টানেন আবার মায়ের মমতাময়ী চরিত্রেও দর্শকদের মনে জায়গা করে নেন। বেতার নাটকেও এই অভিনেত্রী সমান জনপ্রিয়। অকপটে মনের কথা খুলে বললেন সৈকত হালদারকে।

প্রশ্ন : খলনায়িকা থেকে মমতাময়ী মা নানা ধরনের চরিত্র দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। সব চরিত্র হিট। এখন আর সেভাবে দেখা যায় না কেন?

অনামিকা : এখন আর তেমন গল্প নিয়ে ক'টা সিনেমা হচ্ছে, যেখানে আমার বয়সের উপযোগী চরিত্র রয়েছে! তেমন পরিচালকই বা কই? শিবপ্রসাদ-নন্দিনীকে দেখলাম লিলিদিকে দারুণভাবে ব্যবহার করেছে। প্রবীণদের সম্মান দিয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি বলছেন বাংলায় আর ভালো সিনেমা হচ্ছে না?

অনামিকা : না, তা বলছি না। সৃজিত মুখার্জি, কৌশিক গাঙ্গুলি, শিবপ্রসাদ-নন্দিনী ভালো ভালো সিনেমা করছেন। দর্শকদের ফের হলমুখী করছেন। কিন্তু তাঁরা কি আমার কথা ভাবছেন? চার দশকের বেশি সময় ধরে অভিনয় করছি। সবাই আমাকে চেনেন। এরপর কি আর কারোর কাছে কাজের জন্য তদ্বির করা সম্ভব? তবে আশা করি, ওই সব পরিচালকরা আমার মতো চরিত্র পেলে ডাকবেন।

প্রশ্ন : আপনার নাম অনামিকা কেন?

অনামিকা : অনেক জায়গায় উত্তর দিয়েছি। আমার আসল নাম ঊষা। স্কটিশচার্চ কলেজে পড়ার সময় বিখ্যাত নাট্যাভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তী ওই কলেজে আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। তাঁর পরিচালনায় শ্যামা নৃত্য নাট্যে সিলেক্ট হই। ওই স্টেজ শোয়েই কলামন্দিরে এক সিনেমার ভদ্রলোক আমার নাচ দেখে তাঁর সিনেমায় নেওয়ার কথা ভাবেন। ছোটোবেলা থেকে শুনে এসেছি আমার গায়ের রঙ চাপা, কোনোদিন বিয়ে হবে না। আমার ধারণা ছিল ফর্সা রঙের মেয়েরা সিনেমায় সুযোগ পায়। প্রথম যখন টলিপাড়ায় যাই তখন এক সহকারী পরিচালক বলেন, অচেনা জায়গায় তোমার নাম-ঠিকানা লোককে বলবে না। শ্যুট ব্রেকে স্টুডিওর এদিক-ওদিক ঘুরছি। তখন একজন এসে জানতে চান, তোমার নাম কী? নাম বলা বারণ বলে চুপ করে থাকি। ওই ভদ্রলোক বলেন, একি, চুপ করে আছ কেন? এত বড়ো মেয়ে নাম বলতে পারছ না! তোমার নাম নেই? তুমি কি অনামিকা? উত্তরে বলি, হ্যাঁ, অনামিকা সাহা। ব্যাস! সেই থেকে ঊষা সাহা সবার কাছে হয়ে গেল অনামিকা সাহা। লোক আমার আসল নামটাই ভুলে গেছে।

প্রশ্ন : প্রথম সিনেমা কোনটা?

অনামিকা : 'আশার আলো' সিনেমায় প্রথম সুযোগ পাই। তবে তরুণ মজুমদারের 'সংসার সীমান্ত' ছবির মাধ্যমে লোকে আমাকে চেনেন। সেখানে খলনায়িকার চরিত্রে কাজ করি। এরপর তরুণ মজুমদার 'গণদেবতা', 'খেলার পুতুল' সিনেমায় নেন। সেখানেও খলনায়িকার চরিত্রে অভিনয় করি। বাংলা ছবির ভ্যাম্প হয়ে যাই।

প্রশ্ন : গত শতকের আটের দশকে নাকি আপনার এক সিনেমা নিয়ে কলকাতায় আলোড়ন পড়ে যায়?

অনামিকা : হ্যাঁ, সেসময়ে কলকাতা শহর ছেয়ে যায় এক বিতর্কিত পোস্টারে। পোস্টারে একটি মেয়ের নগ্ন পা দেওয়া ছবি দেওয়া হয়। ওই মেয়েটি ছিলাম আমি। ছবির নাম 'অশ্লীলতার দায়ে'। ওই বিতর্কিত সাহসী রোল করে খুব নাম হয়। কিন্তু তখন আমার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। শ্বশুরমশাই বলেন, 'বউমা ওসব রোল আর করো না'। আমার বিয়ে হয় অভিনেতা বোধিসত্ত্ব মজুমদারের সঙ্গে। কিন্তু আমার অভিনয়ের খিদে ছিলই। সংসার অনেকদিন করার পর পরিস্থিতি বদলালে শ্বশুরমশাই বলেন, 'দেখ এমন কোনও চরিত্রে অভিনয় করো না, যা আমাদের সবাই মিলে একসঙ্গে বসে দেখতে খারাপ লাগে'।

প্রশ্ন: বিয়ের পর কামব্যাক কোন ছবি দিয়ে?

অনামিকা : আমার কামব্যাক 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' ছবি দিয়ে। সিঁদুরের বড়ো টিপ পরে গিয়েছিলাম অডিশন দিতে। হবে না জেনেই। কিন্তু আমি সিলেক্টেড হই। সুযোগ পাই মায়ের রোলে। যাতে অনেকদিন অভিনয় করতে পারি তাই ওই মায়ের রোলটা বেছে নিয়েছিলাম। তারপরের ঘটনা ইতিহাস। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই সিনেমা জনপ্রিয়তার রেকর্ড করেছিল। যা আজও কেউ ভাঙতে পারেনি।

প্রশ্ন : আপনি টলিউডে 'বুম্বার মা' নামে পরিচিত। এটা কীভাবে হল?

অনামিকা : বুম্বার (প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি) সঙ্গে অনেক সিনেমা করেছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওর মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছি। সব ছবি সুপারহিট। একবার অনুপ সেনগুপ্ত 'মায়ের আঁচল' সিনেমার শ্যুটিংয়ের কাজে আমাদের তারকেশ্বর নিয়ে যান। আগে থেকে সব বন্দোবস্ত ছিল। ওখানে সবাই বুম্বাকে দেখার জন্য ভিড় করে। পুলিশ ভিড় সামলাতে পারছিল না। তখন বুম্বা না বেরিয়ে আমাকে বেরোতে বলে। আশি বছরের বেশি বয়সী এক বৃদ্ধা এসে আমাকে বলেন, 'কই প্রসেনজিতের মা কই? তা তুমি বিশ্বজিতকে নিয়ে এলে না কেন'? সেই থেকে আমি টলিউডে প্রসেনজিতের মা হয়ে

যাই। ব্যাপারটা আমার ভালোই লাগে। প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা সবাইকে বিয়ের আগে নিজের হাতে রান্না করে আইবুড়ো ভাত খাইয়েছি।

প্রশ্ন : কোন ছবিতে কাজ করে খুব খুশি হয়েছেন?

অনামিকা : কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব! বেশি পরিচিত ও জনপ্রিয়তা পেয়েছি স্বপন সাহার 'ঘাতক' ছবিতে অভিনয় করে। সেই প্রথম বাংলা ছবিতে দর্শকরা ভিলেন মহিলা দেখলেন। যে ভয়ঙ্করী এলোকেশী দা-কাটারি আর তরোয়াল হাতে এগিয়ে আসে। তার মুখে মারকাটারি ডায়লগ ছিল বাম্পার হিট। আজও কোনো মাচায় গেলে দর্শকদের শোনাতে হয় বিন্দু মাসির সব বিখ্যাত সংলাপ— 'কত টাকা চাই ৫ হাজার ১০ হাজার ২০ হাজার— সাপের লেজে পা দিয়েছ। ঘুরে আমি ছোবল মারবই' বা 'আমি ছানা গুণ্ডার মেয়ে, আমার সঙ্গে পাঙ্গা নিতে আসিস না'। ঘাতকের জন্য চিরদিন দর্শকদের মনের মধ্যে থেকে যাব। সুদেষ্ণা রায় ও অভিজিৎ গুহ'র 'বেঁচে থাকার গান' সিনেমায় এক অন্যধরনের চরিত্রে কাজ করে খুব আনন্দ পেয়েছি। এটা ছিল এক বৃদ্ধাশ্রমের গল্প।

প্রশ্ন : 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ' ছবিতে দজ্জাল শাশুড়ির অভিনয়ও দর্শকরা মনে রাখবেন।

অনামিকা : হ্যাঁ, এটাও সুপারহিট হয়। ওই লোহার শিক গরম করে অনুরাধা রায়ের গায়ে চোর লিখে দেওয়া সবাই মনে রাখবেন।

প্রশ্ন : বাংলা সিনেমার প্রায় সব নায়কের সঙ্গে কাজ করেছেন। কাজের অভিজ্ঞতা কেমন?

অনামিকা : উত্তমকুমারের 'বাঘবন্দি ' ও 'দুই পুরুষ' ছবিতে কাজ করেছি। কিন্তু ওঁর সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ হয়নি। তবে সৌমিত্রদা, দীপঙ্করদা ও রঞ্জিতদার সঙ্গে কাজ করেছি। দীপঙ্করদা বেশিরভাগ সিনেমায় ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করেন, আর আমি খলনায়িকা চরিত্রে কাজ করি। রঞ্জিতদার সঙ্গে বেশিরভাগ সিনেমায় স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছি। মানুষ হিসাবে রঞ্জিতদার তুলনা হয় না। তবে সৌমিত্রদার সঙ্গে কাজ করে অভিনয়ের অনেক কিছু শিখেছি। উনি আমার গলা ওঁর নাটকে ব্যবহার করেন। এই প্রজন্মের প্রসেনজিৎ, জিৎ, দেব সবার সঙ্গে কাজ করেছি।

প্রশ্ন : সিনেমার পাশাপাশি সিরিয়াল-যাত্রায় অভিনয় করেন। কোন মাধ্যমে কাজ করতে বেশি ভালো লাগে?

অনামিকা : সিনেমাকে সবার আগে রাখতে চাই। সিরিয়ালের জনপ্রিয়তা অস্বীকার করা যায় না। গ্রামে এখনও যাত্রা জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যম। কাজ করার অন্য অনুভূতি। এসবের পাশাপাশি আমি অজস্র বেতার নাটকে অভিনয় করেছি। বেতার নাটকে অভিনয় করতে বেশি ভালো লাগে। অনেকে জানেন না, আমি অনেকের ভয়েস ডাবিং করেছি। যেমন, জুহি চাওলা, ফারহা, নীলম। এমনকী মহুয়া রায়চৌধুরীর অকাল প্রয়াণে তাঁর পুরো গলা ডাবিং করেছিলাম।

প্রশ্ন : বাংলা সিনেমাকে বাঁচাতে কী করা দরকার?

অনামিকা : বাংলা সিনেমায় সাময়িকভাবে এখন সঙ্কট তৈরি হয়েছে। দর্শকরা আর হলে সিনেমা দেখতে আসছেন না। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের চাহিদা বাড়ছে। তবে, আমি মনে করি এটা সাময়িক ব্যাপার। দর্শককে ফের হলমুখী করতে চাইলে গুরুত্ব দিতে হবে টানটান গল্পে। মানুষ চায় ভালো গল্প, সংলাপ ও অভিনয়। টলিউডকে বাঁচাতে 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ'এর মতো ছবি চাই।

আজকাল হাসির ছবি তেমন হয় না : শুভাশিস

বাংলা সিনেমা জগতের জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা শুভাশিস মুখোপাধ্যায় রূপালি পর্দার মতো ব্যক্তিজীবনেও হাসিখুশি। তাঁর সঙ্গে এক ঝলক আলাপচারিতা।

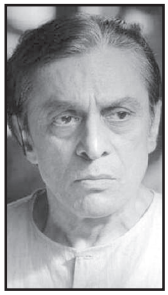

প্রশ্ন : আপনার প্রথম ছবি কোনটা?

শুভাশিস : পূর্ণেন্দু পত্রীর 'ছোটো বকুলপুরের যাত্রী'।

প্রশ্ন : প্রথম সিরিয়াল?

শুভাশিস : 'অভিনন্দন ভগীরথ'। এই সিরিয়ালের প্রধান চরিত্রে ছিলেন দীপঙ্কর দে, রবি ঘোষ।

প্রশ্ন : আর প্রথম প্রেম?

শুভাশিস : আমার প্রথম প্রেম থিয়েটার, দ্বিতীয় প্রেম সিনেমা আর তৃতীয় প্রেম টেলিভিশন।

প্রশ্ন : আপনি এত প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ছবিতে শুধুমাত্র কমেডি চরিত্রে ব্যবহার করা হয়। এটা নিয়ে কোনো অভিমান নেই?

শুভাশিস : এটা ঠিক যে, দর্শকরা 'শিল্পান্তর' বা 'হার্বার্ট' ছবিতে আমায় অন্যরূপে দেখেছেন। এসব ছবি সব ধরনের দর্শক দেখে না। তবে মূল ধারার ছবিতে কৌতুক চরিত্রে অভিনয় করতে আমার কোনো দুঃখ বা অভিমান হয় না। আমার কাজ হল দর্শকদের আনন্দ দেওয়া।

প্রশ্ন : শোনা যায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু বলেই নাকি বেশি সুযোগ পান?

শুভাশিস : নিন্দুকদের রটনা। বুম্বাদা (প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) আমার খুব ভালো বন্ধু। কাজের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেন। ওর কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রশ্ন: অভিনয়ের ক্ষেত্রে কোনো আক্ষেপ আছে?

শুভাশিস : একটাই আক্ষেপ, মহানায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে অভিনয় করার কোনো সুযোগ আসেনি। আমার স্বপ্নের নায়ক ছিলেন উত্তমকুমার।

প্রশ্ন : বাংলা ছবি থেকে কি হাসি হারিয়ে যাচ্ছে?

শুভাশিস : হাসির চাহিদা সবসময়ই রয়েছে। কিন্তু আজকাল হাসির ছবি তেমন হয় না। হাসির নামে চলে ভাঁড়ামি।

প্রশ্ন : এখন টিভিতে হাসির রিয়েলিটি শো হয়। এর মধ্যে দিয়ে কি নতুন প্রতিভা উঠে আসে?

শুভাশিস : আমার মনে হয় না এধরনের রিয়েলিটি শো থেকে কোনো প্রতিভা উঠে আসে। ওদের আর পরে খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন : এত ধকল কী করে নেন?

শুভাশিস : সৃষ্টির আনন্দে মেতে থাকি। কাজে আনন্দ থাকলে কাজটাকে পরিশ্রম বলে মনে হয় না। আর রোগা শরীরে বেশি ধকল নেওয়া যায়। আমি রোগা কিন্তু রুগ্ন নই।

প্রশ্ন : পার্টিতে যান?

শুভাশিস : হ্যাঁ, পার্টিতে যাই। কিঞ্চিৎ মদ্যপান করি। অবশ্যই মাত্রা রেখে।

প্রশ্ন : ঘন ঘন প্রেমে পড়তে ভালো লাগে?

শুভাশিস : আমি সুন্দরের পূজারি। সুন্দরের জন্যই বেঁচে থাকা। সুন্দরী দেখলে তাকিয়ে থাকি। আর ইশিতাকে দেখাই (আমার স্ত্রী)।

প্রশ্ন : ব্যক্তিজীবনেই কি কৌতুক প্রিয়?

শুভাশিস : পর্দার মতোই আমি ব্যক্তিগত জীবনে হাসিখুশি। গোমড়া মুখে হুঁকোমুখো হ্যাংলা হয়ে থাকি না। আত্মীয়-বন্ধুদের মাতিয়ে রাখি। হাসলে মন ভালো থাকে।

আমার প্রিয় নায়ক : উত্তমকুমার
নায়িকা : সুচিত্রা সেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী
গায়ক : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে
গায়িকা : লতা মঙ্গেশকর ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
খাবার : মাছ-ভাত
বেড়ানোর জায়গা : সমুদ্র ও পাহাড়
পোশাক : ধুতি ও পাঞ্জাবি

ভদ্রভাবে থাকতে ভালোবাসি : রঞ্জিত মল্লিক

রূপালি পর্দায় ৫০ বছরের সোনালি কেরিয়ার।
প্রবীণ শিল্পী রঞ্জিত মল্লিকের মুখোমুখি শোভনলাল রাহা।

প্রশ্ন : প্রথম ছবি মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ'। তখন আপনি নতুন। কীভাবে এই জগতে এলেন?

রঞ্জিত : দেখতে দেখতে ৫০ পেরিয়ে ৫১ বছর হল এই জগতে আছি। ১৯৭০ সাল। আমি তখন নবাগত। সেই প্রথম সিনেমায় অভিনয় করি। একটা ম্যাগাজিনে এই ছবির খোঁজ পেয়ে মৃণাল সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তখন আমার অভিনয়ের অভিজ্ঞতা একেবারেই ছিল না। কিন্তু আমাদের বাড়িতে গান, বাজনা ও নাটকের পরিবেশ ছিল। আর সেই কারণেই কোথাও একটা আত্মবিশ্বাস কাজ করছিল। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে সিলেক্ট হই। তবে সিনেমায় অভিনয়কে পেশা করার খুব একটা ইচ্ছে যে ছিল, তা নয়। প্রথম ছবিতে অভিনয় করে আমি ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পাই। এই পুরস্কার আমাকে খুব উৎসাহিত করে। আশপাশের লোকেরাও উৎসাহ দেন। ভাবলাম থেকে গেলেই ভালো হয়। এভাবে অভিনয়ের জগতে আমার আসা।

প্রশ্ন : মহানায়কের সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে কিছু বলুন?

রঞ্জিত : উত্তমকুমারের সঙ্গে দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল। মানুষ হিসাবে খুব হেল্পফুল ছিলেন। কেউ জানতে চাইলে তাঁকে সহজভাবে অভিনয়ও দেখিয়ে দিতেন। ওঁর সঙ্গে যখন প্রথম অভিনয় করি, বুঝতে পারছিলেন নতুন বলেই হয়তো আমি কিছুটা আড়ষ্ট। উনি নিজেই সেই আড়ষ্টতা কাটিয়ে তুলতে সাহায্য করেন। পরে ওঁর সঙ্গে গোটা পাঁচেক ছবিতে অভিনয় করি। মৌচাক তো সুপারহিট। এমনকী, ওঁর জীবনের শেষ ছবি ওগো বধূ সুন্দরী'তেও আমি কাজ করি। সেসব স্মৃতি ভোলার নয়।

প্রশ্ন : উত্তমকুমারের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেমন ছিল?

রঞ্জিত : ব্যক্তিগত সম্পর্ক বলতে, উনি তো আমার থেকে বয়সে অনেক বড়ো তাই দাদা স্থানীয় ছিলেন। আগেই বলেছি, খুব উপকারী ছিলেন। চাইতেন বাকি অভিনেতারাই যেন ভালো অভিনয় করেন। কারণ, দু'জন অভিনেতার অভিনয় ভালো হলে তবেই কোনো দৃশ্য জমে। একজন যদি কোনো কারণে দুর্বল হয়ে যান, তাহলে আরেকজন অভিনেতারও বারোটা বেজে যায়। এটাই সমস্যা। আর উনি তা জানতেন।

প্রশ্ন : সুচিত্রা সেনের সঙ্গে আপনি 'দেবী চৌধুরানী' ছবি করেছেন। উনি খুব গম্ভীর ছিলেন বলে শোনা যায়। একসঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন?

রঞ্জিত : আমার সঙ্গে মহানায়কের যেমন সম্পর্ক ছিল, তেমনই সম্পর্ক ছিল সুচিত্রা সেনের সঙ্গে। উনিও আমার সঙ্গে গল্প করে কাজটা অনেকটা স্বাভাবিক করে দেন। উনি কাউকে ডমিনেন্ট করতেন না। ওঁর সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা খুব ভালো।

প্রশ্ন :প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে চার দশক ধরে কাজ করছেন। ওর সম্পর্কে কিছু বলুন।

রঞ্জিত : বুম্বা খুব সিনসিয়ার অভিনেতা। সাংঘাতিক পেশাদারিত্ব রয়েছে ওর মধ্যে। সিনেমাকে যেমন ভালোবাসে তেমন সিনেমা নিয়ে স্বপ্নও দেখে। সিনেমাই ওর জীবন। বুম্বা নিজেকে এতো নিয়ম আর শৃঙ্খলার মধ্যে রেখেছে বলেই এখনো খুব ভালোভাবে এই জগতে রয়েছে।

প্রশ্ন : পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী তো আপনার আবিষ্কার। আপনাদের দু'জনের তো অনেক ছবি হিট। কীভাবে পরিচয় হয়?

রঞ্জিত : প্রথম উনি আমার সাক্ষাৎকার নিতে আমার বাড়িতে আসেন। ওনার চুমকি নামে একটি পত্রিকা ছিল। তখনও আমি ওনাকে চিনতাম না। চুমকি পত্রিকার লেখা পড়ে আমার খুবই ভালো লাগল। ওই লেখা থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়। তারপর একদিন বললাম, আপনি এত ভালো লেখেন যখন, সিনেমার জন্য তো চিত্রনাট্য লিখতে পারেন। তখন উনি আগ্রহী হলেন সিনেমার ব্যাপারে। আর বন্ধুর জন্য যতটুকু করতে পারে, আমি করেছি।

প্রশ্ন : পর্দায় রঞ্জিত মল্লিক মানেই এক প্রতিবাদী চরিত্র। ব্যক্তিজীবনে কেমন?

রঞ্জিত : আমি খুব সাদামাটা লোক। ভদ্রভাবে থাকতে ভালোবাসি ও ভদ্রলোকদের পছন্দ করি। রঞ্জিত মল্লিক স্পেশাল কিছু নয়, আর পাঁচটা লোকের মতোই সাধারণ মানুষ।

আমাকে সিনেমায় তেমনভাবে ডাকা হয় না : তনিমা সেন

বড়ো ও ছোটো পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তনিমা সেনের মুখোমুখি।

প্রশ্ন : অভিনয়ে কীভাবে এলেন?

তনিমা : আমরা থাকতাম উত্তর কলকাতায় খান্না সিনেমার কাছে। বাবা-মা চাইতেন আমি সৃজনশীল কিছু করি। আমার ছোটো থেকে অভিনয়ের শখ ছিল। এটা হয়তো সিনেমা দেখার প্রভাব। পাড়ায় শখের নাটকে প্রথম অভিনয় করি।

প্রশ্ন : তারপর কি গ্রুপ থিয়েটারে যোগ দেন?

তনিমা : না, আমি কোনোদিন গ্রুপ থিয়েটারে কাজ করিনি। আমার অভিনয়ের কেরিয়ার শুরু হয় অফিস ক্লাবের থিয়েটারে অভিনয় দিয়ে। এক-দেড় বছর টানা অভিনয় করেছি।

প্রশ্ন : প্রথম পেশাদার মঞ্চ?

তনিমা : প্রথম পেশাদার নাটক স্টার থিয়েটারে বালুচরী-তে। আগে সেখানে সুপ্রিয়া দেবী অভিনয় করতেন। এরপর অভিনয় করি 'কেঁচো খুড়তে কেউটে'। পরে চিরঞ্জিত এটা নিয়ে সিনেমা করেন।

প্রশ্ন : টেলিভিশনের প্রথম কাজ কোনটা?

তনিমা : কলকাতা দূরদর্শনে প্রথম কাজ করি 'যদি এমন হতো'।

প্রশ্ন : প্রথম সিরিয়াল?

তনিমা : ইন্দর সেনের মেগা সিরিয়াল জন্মভূমি।

প্রশ্ন : 'ধ্যাৎ তেরিকা' কি আপনার প্রথম জনপ্রিয় মেগা?

তনিমা : কুশল চক্রবর্তী ধ্যাৎ তেরিকায় সুযোগ দেয়। শশীকলার চরিত্রে ওই বিশেষ সংলাপ 'কী লজ্জা' খুব জনপ্রিয় হয়।

প্রশ্ন : অভিনয়ের ক্ষেত্রে কমেডি চরিত্রই কেন বেছে নেন?

তনিমা : গোড়া থেকেই আমি খুব মজা করতে, অন্যকে হাসাতে পছন্দ করি। দর্শকরা আমাকে কমেডি চরিত্রে বেশি পছন্দ করেন। অনেকে বলেছে, অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আপনার অভিনয় দেখে একটু প্রাণ খুলে হাসতে পারি। দর্শকদের মজা দেওয়াই একজন বিনোদন শিল্পীর কাজ।

প্রশ্ন : সিনেমা থেকে কি হাসি হারিয়ে যাচ্ছে?

তনিমা : অবশ্যই হারিয়ে যাচ্ছে। কৌতুকের নামে এখন ভাঁড়ামো হয়। নির্মল হাসি মনকে প্রফুল্ল করে। আজকাল রোগ সারাতে প্রয়োগ করা হয় লাফিং থেরাপি।

প্রশ্ন : বাংলা সিনেমায় যেমন হাসির রাজা ছিলেন ভানু ব্যানার্জি, এখন তেমনি হাসির রানি তনিমা সেন।

তনিমা : সেটা দর্শকরাই বলতে পারবেন।

প্রশ্ন : উত্তম-সুচিত্রা জুটির পর পরাণ-তনিমা জুটি এখন হিট। রসায়নটা কী?

তনিমা : পরাণদা আর আমার জুটির সাফল্যের রসায়ন হল দু'জনের বোঝাপড়া। কমেডির ক্ষেত্রে কোথায় শুরু করব আর কোথায় থামতে হবে এটা খুব জরুরি। চিত্রনাট্যের সংলাপে হয়তো কথাটা নেই তবু আমরা অনেক সময় তাৎক্ষণিক সংলাপ বলে দর্শকদের মজিয়ে রাখি।

প্রশ্ন : শুনেছি অনেকে আপনাকে পরাণ ব্যানার্জির স্ত্রী বলে ভুল করে?

তনিমা : সফল জুটির বিড়ম্বনা। একটা ছোট্ট ঘটনা বলি, মঞ্চে পরাণদা আর আমি অভিনয় করছি। দর্শক আসনের প্রথম সারিতে বসে আছেন আমার স্বামী। পাশে বসে দু'জন মহিলা গল্প করছেন, তনিমাদি এখন পরাণদার সঙ্গে থাকেন। রাতে আমার স্বামী গল্পটা শুনিয়ে বলেন, আমার বউ সম্পর্কে এই কথাটাও আমাকে শুনতে হল।

প্রশ্ন : চেহারা মোটা হওয়ার জন্য অভিনয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় না?

তনিমা : ক্যামেরায় আমাকে যেমন মোটাসোটা দেখায় বাস্তবে আমি তত মোটা নই। আমার শরীর যথেষ্ট নমনীয় তাই কোনো সমস্যা হয় না।

প্রশ্ন : ডায়েট করেন?

তনিমা : পর্দায় বেশি খেতে দেখালেও আমি কমই খাই। সব ধরনের রসনার স্বাদ উপভোগ করি। তবে ভাত প্রায় খাই না। মিষ্টির লোভ অবশ্য সামলাতে পারি না।

প্রশ্ন : চা না কফি কোনটা পছন্দ?

তনিমা : দুটোই। তবে সবচেয়ে পছন্দ দুধ। সারাদিন দুধ না পেলে আমার চলে না। শুনেছি ছোটোবেলায় বাচ্চারা যখন দুধ খেতে চায় না, ওই সময় আমি ঢকঢক করে দুধ খেয়ে নিতাম।

প্রশ্ন : মন খারাপ হলে কী করেন?

তনিমা : মন খারাপের সঙ্গী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান।

প্রশ্ন : অবসর সময় কী করে কাটান?

তনিমা : সময় ও সুযোগ পেলে সপরিবারে দুমদাম বেরিয়ে পড়ি অজানার খোঁজে।

প্রশ্ন : রূপচর্চা করা হয়?

তনিমা : আজ পর্যন্ত কোনওদিন সাজগোজের জন্য বিউটি পার্লারে যাইনি। বাড়িতেও রূপচর্চা করি না। ওই শুটিং-এ যা কিছু মেকআপ করি।

প্রশ্ন : নতুন ধরনের সিনেমায় অভিনয় করতে ইচ্ছে করে না?

তনিমা : বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করেছি। কিন্তু আমায় খুব বেশি সিনেমায় ডাকা হয় না। কারণটা পরিচালকরাই বলতে পারবেন। অথচ আমি সবধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে পারি।

নতুন প্রজন্মের দর্শক টানতে ছবির বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে : ঋতব্রত

বাংলা সিনেমার নতুন মুখ ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়। নাটক, ফিচার থেকে অডিয়ো মাধ্যম সব জায়গায় সমান দক্ষ। এরইমধ্যে তাঁর ছবি জাতীয় পুরস্কারের শিরোপাও ছিনিয়ে নিয়েছে। একান্ত আলাপনে ঋতব্রত অনেক কথা জানালেন।

প্রশ্ন : লেখাপড়া শেষ না চলছে?

ঋতব্রত : আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র। এবার ফাইনাল ইয়ার।

প্রশ্ন : এই ধরনের বিষয় বাছার কারণ কী যেখানে কেরিয়ারের তেমন সুযোগ নেই?

ঋতব্রত : ২০২১ সালের সংকটের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কোন বিষয় নিয়ে পড়ে কোথায় কী কেরিয়ার হবে এটা ভাবা বোকামি। শিক্ষায় এক চরম অনিশ্চয়তা নেমে এসেছে। তাছাড়া তথাকথিত কেরিয়ারমুখী কোর্স নিয়ে আমার কোনওদিন আগ্রহ ছিল না। সাহিত্য ভালোবাসি তাই তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে পড়ছি। যা আমার কাজের অনুঘটক হিসাবে কাজ করে।

প্রশ্ন : পড়াশোনা ও অভিনয়-দুটোর মধ্যে কীভাবে সমতা বজায় রাখ?

ঋতব্রত : তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকে নাটক করি। অভিনয় আমার রক্তে। পড়াশোনা ও অভিনয়-দুটো ক্ষেত্রেই আমি সিরিয়াস। সবসময়ে একটা ভারসাম্য রেখে চলি।

প্রশ্ন : সিনেমায় প্রথম অভিনয়?

ঋতব্রত : সুজয় ঘোষের পরিচালনায় কাহানি সিনেমায় প্রথম অভিনয় করি। আমার চরিত্রের নাম ছিল বিষ্ণু।

প্রশ্ন : এরপর?

ঋতব্রত : এরপর অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের 'ওপেন টি বায়োস্কোপ' ছবিতে কাজ করি। আর থেমে থাকেনি। দুর্গা সহায়, রঙবেরঙের কড়ি, পর্ণমোচী, কিশোরকুমার জুনিয়র, জেনারেশন আমি, ঘরে বাইরে আজ, গোয়েন্দা জুনিয়র, রক্ত রহস্য, দ্বিতীয় পুরুষ ও গুপী গায়েন (টেলিভিশন মুভি) ছবিতে কাজ করি।

প্রশ্ন : কোন সিনেমায় কাজ করে খুব খুশি হয়েছ?

ঋতব্রত : ওভাবে বলা যায় না। খুব ভালো লেগেছে পর্ণমোচী, দ্বিতীয় পুরুষ, গোয়েন্দা জুনিয়র, কিশোরকুমার জুনিয়র, ঘরে বাইরে আজ'য়ের মতো সিনেমায় অভিনয় করে। আমি খুব সৌভাগ্যবান যে এই বয়সে সুজয় ঘোষ, সুজিত মুখার্জি, কৌশিক গাঙ্গুলি, অপর্ণা সেনদের মতো পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। ওঁদের সঙ্গে কাজ করে কিছু না কিছু শিখেছি।

প্রশ্ন : এই বয়সে দু'টো জাতীয় পুরস্কার, কেমন অনুভূতি?

ঋতব্রত : আমি নয়, আমার অভিনীত দুটো সিনেমা- কাহানি ও দ্য ওয়াটারফল (শর্ট ফিল্ম) জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। আমার বন্ধু ঋদ্ধি সেন তো মাত্র ২১ বছর বয়সে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। যেকোনো স্বীকৃতি ও পুরস্কার পেলে ভালো লাগে। কাজের প্রতি দায়িত্ব বাড়ে।

প্রশ্ন : বাবা শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট অভিনেতা। কাজের ক্ষেত্রে তুলনা আসে না?

ঋতব্রত : বাবা আমার ফ্রেন্ড, ফিলোজাফার ও গাইড। সব সময়ে কাজের জন্য উৎসাহ দেন। এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে তুলনার মধ্যে পড়িনি।

প্রশ্ন : বাবা বকাবকি করেন?

ঋতব্রত : বাবার পরিচালনায় কোনও কাজ করিনি। বেশ কিছু সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছি, যেখানে আমি বাবার সহশিল্পী ছিলাম। বাবা সবসময়ে বলেন, পরিচালকের নির্দেশ মতো কাজ করবে। বাড়িতে সিনেমা ও নাটক নিয়ে আলোচনা হয়।

প্রশ্ন : এই মুহূর্তে কি মনে হয় সিনেমা হলের বিকল্প ওটিটি প্ল্যাটফর্ম?

ঋতব্রত : আমার সেটা মনে হয় না। লকডাউন পরিস্থিতিতে মানুষ ওটিটি মাধ্যমে ভরসা করছেন। কিন্তু হলে বসে সিনেমা দেখার মজাই আলাদা। পরিচালকরা বড়ো পর্দার কথা ভেবেই সিনেমা তৈরি করেন। আমি নিজে হলে গিয়ে সিনেমা দেখতে পছন্দ করি। আমার বিশ্বাস, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে আবার দর্শকরা হলমুখী হবেন। ওটিটি মাধ্যম কখনও সিনেমা হলের বিকল্প হতে পারে না।

প্রশ্ন : বাংলা সিনেমার দর্শক টানতে কী করা দরকার?

ঋতব্রত : দর্শক যে কখন কী চান, তা বোঝা মুশকিল। আমার মনে হয় নতুন প্রজন্মের দর্শক টানতে ছবির কনটেন্টে গুরুত্ব দিতে হবে। পারিবারিক কাহিনির পাশাপাশি রহস্য-রোমাঞ্চ বা থ্রিলারধর্মী কাহিনিতে জোর দিতে হবে।

প্রশ্ন : সিনেমার ক্ষেত্রে গ্রামের ও শহরের দর্শকদের মধ্যে বিভাজন করা হয়। এটা নিয়ে কী বলবে?

ঋতব্রত : আমি দর্শকদের নিয়ে কোনও ভৌগোলিক সীমারেখায় বিশ্বাস করি না। গ্রামের ও শহরের দর্শক বলে আলাদা কিছু হয় না। এক শ্রেণির দর্শক পছন্দ করেন জামাই ৪২০ আবার এক শ্রেণির দর্শক পছন্দ করেন সহজপাঠ। এটা রুচি বা পছন্দের ব্যাপার। সিনেমার মূল উদ্দেশ্য বিনোদনের পাশাপাশি বাণিজ্য।

প্রশ্ন : সিরিয়ালে অভিনয় করার কথা ভেবেছ?

ঋতব্রত : আমার বাবা প্রচুর সিরিয়ালে কাজ করেন। ছোটো থেকে সিরিয়াল দেখে বড়ো হয়েছি। ছোটোবেলায় রবি ওঝার জনপ্রিয় সিরিয়ালগুলো দেখতাম। সময় ও সুযোগ পেলে অবশ্যই সিরিয়ালে অভিনয় করব। একজন অভিনেতা হিসাবে সব মাধ্যমে কাজ করতে চাই।

প্রশ্ন : নতুন প্রজন্ম ফেসবুকে আসক্ত। ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়কে ফেসবুকে দেখা যায় না কেন?

ঋতব্রত : আমি সেভাবে ফেসবুকে অ্যাক্টিভ নই। ফেসবুক নিজেদের প্রচার ও গালমন্দের জায়গা হয়ে উঠেছে। এখানে ২ শতাংশও গঠনমূলক বিষয় থাকে না। একমাত্র নিজেদের নাটকের প্রচারের জন্য আমি ফেসবুকের সাহায্য নিই।

স্মরণে

বাবাকে নিয়ে আজও কৌতূহলের শেষ নেই

বাবা হিসেবে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করেছেন তাঁর বড়ো ছেলে
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সিনেমার ইতিহাসে ও বাঙালিদের মনে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। তথাকথিত নায়ক না হয়েও তিনি ছিলেন নায়কের মতোই জনপ্রিয়। শুধু রূপালি পর্দা নয়, মঞ্চ, বেতার নাটক ও অডিয়ো মাধ্যমেও তাঁর ছিল বিপুল জনপ্রিয়তা। চলে যাওয়ার চার দশক পরেও তাঁকে নিয়ে আমাদের আগ্রহের শেষ নেই।

পারিবারিক পরিচয়

১৯২০ সালের ২৬ আগস্ট ঢাকার দক্ষিণ মৈসন্ডিতে বাবার জন্ম। তাঁর ভালো নাম ছিল সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সবার কাছে পরিচিত ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নামেই। ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি'স হাই স্কুল ও পরে জগন্নাথ কলেজে লেখাপড়া করে ১৯৪১ সালে কলকাতায় আসেন। এখানে এসে তিনি আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানিতে চাকরি করেন। বালিগঞ্জ অশ্বিনী দত্ত লেনে তাঁর বোনের কাছে দু'বছর থাকার পর টালিগঞ্জের চারু অ্যাভিনিউতে পাকাপাকিভাবে থাকা শুরু করেন। আমরা তিন ভাই-বোন। আমি সবার বড়ো। ছোটো ভাইয়ের নাম পিনাকি, বোনের নাম বাসবী। আমার মা নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেকালের বিশিষ্ট গায়িকা।

বাবার অভিনয় জীবন শুরু

ঢাকায় থাকার সময় বাবা স্কুল-কলেজের মঞ্চে ও অফিসপার্টিতে শখের নাটক করতেন। প্রথম পেশাদার নাটক করেন বেতারে। তাঁর অভিনয় জীবন শুরু হয় ১৯৪৭ সালে, 'জাগরণ' ছবির মাধ্যমে। ওই বছর 'অভিযোগ' নামে তাঁর আরেকটি ছবি মুক্তি পায়। এরপর 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'বরযাত্রী' ও 'পাশের বাড়ি' ছবির মাধ্যমে একটু করে ওনার নাম হতে শুরু করে। ১৯৫৩ সালে মুক্তি পেল 'সাড়ে চুয়াত্তর'। কেদার চরিত্রে তাঁর মুখে 'মাসিমা মালপো খামু' সংলাপটা খুব জনপ্রিয় হয়। মূলত, এই সিনেমার মাধ্যমে বাবা দর্শকদের মনে পাকা জায়গা করে নেন। এর পরের বছর মুক্তি পায় 'ওরা থাকে ওধারে'। তারপর আর তাঁকে ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক ছবিতে অভিনয় করে গেছেন।

অভিনয়ের বহুমুখিতা

অনেকের ধারণা, সিরিয়াস চরিত্রে অভিনয় না করলে অভিনেতা হওয়া যায় না। এটা একেবারেই ভুল। আমার মনে হয়, এই কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা অভিনয়ের কিছু বোঝেন না। দর্শকরা কৌতুক চরিত্রে বাবাকে বেশি পছন্দ করলেও তিনি নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দেন। গল্প হলেও সত্যি, আলোর পিপাসা, অমৃতকুম্ভের সন্ধানে, নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে-এই সব সিনেমায় তিনি সিরিয়াস চরিত্রে অভিনয় করেন। নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করেন ভাগনি ও বিজয়িনী ছবিতে। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন যমালয়ের জীবন্ত মানুষ, মৃতের মর্ত্যে আগমন, স্বর্গ মর্ত্য, পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, মিস প্রিয়ংবদা, ৮০তে আসিও না, ভানু পেল লটারি, ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট। ১৯৬৭ সালে মুক্তি পাওয়া মিস প্রিয়ংবদা ছবিতে বাবা চরিত্রের দরকারে মহিলা সাজেন। তাঁর বিপরীতে ছিলেন লিলি চক্রবর্তী। মহানায়কের সঙ্গে অন্তত ৫০টা ছবিতে তিনি অভিনয় করেন। বাংলা ছাড়াও বন্দিশ, এক গাঁও কী কাহানি ও সাগিনা নামে হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেন। বাবার অভিনীত বেশি কিছু বাংলা ছবির আবার হিন্দি ভার্সনও হয়। বাবার অভিনীত আমার পছন্দের সিনেমা ৮ বছর বয়সে আমি প্রথম বাবার অভিনীত ছবি চাটুজ্যে বাড়ুজ্যে দেখি। বেশিরভাগ ছবি দেখেছি প্রেস শোয়ে। প্রথম দিকে বুঝতাম না, পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছি বাবা কত বড়ো মাপের অভিনেতা ছিলেন। তাঁর অভিনীত যমালয়ের জীবন্ত মানুষ, ৮০-তে আসিও না, গল্প হলেও সত্যি, ভানু পেল লটারি ছবিগুলো বারবার দেখেছি। সিনেমার পাশাপাশি তাঁর মঞ্চের অভিনয় দেখেও মুগ্ধ হয়েছি। আজও ভুলতে পারি না বাবার অভিনীত জয় মা কালী বোর্ডিং ও শ্যামলীর কথা। বাবা প্রায় ৩০টির মতো কৌতুক নকশার রেকর্ড করেন, প্রতিটা হিট হয়।

বাড়ি যেন চাঁদের হাট

১৯৫৮ সাল নাগাদ আমরা চলে যাই জুবিলি পার্কে। এই পাড়ায় বাবা বাড়ি কেনেন। ঠিকানা, ৪২ এ। এখানেই শেষদিন পর্যন্ত বাবা ছিলেন। এই বাড়িতে কে না আসতেন! উত্তমকুমার, রবি ঘোষ,

অনুপকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়। বিকাশ রায় বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। শুধু সিনেমার লোকজন নন, আসতেন বিখ্যাত সব খেলোয়াড়রাও। বাবা ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের ফ্যান।

বাবা হিসাবে যেমন ছিলেন

সিনেমা ও মঞ্চের অভিনয় নিয়ে বাবা এত ব্যস্ত ছিলেন যে ছোটোবেলায় আমরা তাঁকে তেমনভাবে পাইনি। আমরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই বাবা বেরিয়ে পড়তেন। আবার রাতে ঘুমিয়ে পরার পর বাড়িতে ঢুকতেন। ছেলেমেয়ে কে কোন ক্লাসে পড়ি, তারও খবর রাখতেন না। নিজের দায়িত্ব পালনে অবশ্য সচেতন ছিলেন। পর্দায় ও মঞ্চে বাবা যতই দর্শকদের হাসিয়ে বেড়ান না কেন বাড়িতে থাকতেন গম্ভীর। বাবা খুব খাদ্যরসিক ছিলেন। মাছ খেতে পছন্দ করতেন। আমাদের বাড়িতে তিন ধরনের মাছের পদ হত। ছোটো, মাঝারি ও বড়ো মাছ। সবজি তেমন পছন্দ না করলেও ভালোবাসতেন বাঁধাকপি ও লাউয়ের নানা পদ।

গুরু মানতেন ছবি বিশ্বাসকে

আমাদের গুরু ছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার আর বাবা গুরু হিসাবে মানতেন নাটকের শিশির ভাদুড়ী ও সিনেমার ছবি বিশ্বাসকে। বাড়িতে প্রায়দিনই ওই দু'জনের অভিনয়ের ধরন নিয়ে আলোচনা করতেন। ওঁদের অভিনয়ের ধারা অনুসরণ করতেন কিন্তু কখনো অনুকরণ করার চেষ্টা করেননি। বাবা ছিলেন এক পরিপূর্ণ শিল্পী। ইংরেজিতে যাকে বলে কমপ্লিট আর্টিস্ট। বাবা প্রায় ৩০০টি ছবিতে অভিনয় করেন। তাঁর শেষ ছবি ছিল 'শোরগোল'।

গানের মাধ্যমে নিজের কথা বলতে চাই

এই মুহূর্তে জনপ্রিয় তরুণ গায়িকা **অন্বেষা** নিজের লড়াই ও আগামী লক্ষ্যের কথা জানালেন সৈকতকে

মনে পড়ে 'জ্বলতে দিয়া' (প্রেম রতন ধন পায়ো) বা 'বোঝে না সে বোঝে না'র টাইটেল ট্র্যাক? কিংবা 'বনারসিয়া (রাঞ্ঝনা), 'মন বাওরে' (কানামাছি) গান? সব গান আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। সঙ্গীতরসিকদের মুখেমুখে ঘোরে। তবে, আমরা কি জানি, ওই সব ক'টা জনপ্রিয় গানের প্লেব্যাক গায়িকা একজনই? তিনি অন্বেষা দত্তগুপ্ত। যদিও তিনি পদবী ব্যবহার করেন না। কোঁকড়ানো চুলের মিষ্টি মেয়েটার পরিচিতি সা রে গা মা'র রিয়েলিটি শোয়ে। তারপর সোজা পাড়ি মুম্বই। তারপরের কাহিনি সবার জানা। বলিউড ও টলিউডের ব্যস্ত ও জনপ্রিয় গায়িকা। বাংলা ও হিন্দির পাশাপাশি ভোজপুরি, পঞ্জাবি, মারাঠি, নেপালি, গুজরাতি, তামিল, তেলেগু ও আরো নানা ভারতীয় ভাষায় প্লেব্যাক গান করেছেন। সারেগামাপার মঞ্চে সোনু নিগম অন্বেষার গান শুনে বলেছিলেন, 'এই দেশে তোমার কণ্ঠ ঝড় তুলবে একদিন। তোমার সঙ্গে ডুয়েট গাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।' বলাবাহুল্য, অন্বেষার গান সারা দেশ জুড়ে ঝড় তুলেছে। তিনি নতুনদের 'আইকন' হয়ে উঠেছেন।

কাজের জন্য বেশিরভাগ সময়ে মুম্বই থাকেন। মন পড়ে থাকে বাংলায়। বাংলা গানের প্রচার ও প্রসারে সবসময়ে নতুন নতুন আইডিয়া ভাবেন। আর গানের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করেন। চুড়ান্ত পেশাদার শিল্পী হয়েও কখনো আপোশ করেন না। সোজা কথা সোজাভাবে বলতে পছন্দ করেন। চুড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে কলকাতার বাড়ি থেকে চলভাষে মনের কথা খুলে বললেন অন্বেষা। কথোপকথনের কিছু ঝলক তুলে ধরলাম—

প্রশ্ন : দোল ও হোলি নিয়ে বাংলা ও হিন্দি সিনেমায় অনেক গান হয়েছে। আপনার পছন্দের গান কী কী?

উত্তর : বাংলায় একান্ত আপন, বসন্তবিলাপ, তিলোত্তমা প্রভৃতি নানা ছবিতে দোলের সিকোয়েন্সে গানের ব্যবহার হয়েছে। এই মুহূর্তে আমার 'বসন্ত বিলাপ' ছবির আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'ও শ্যাম-' মনে পড়ছে। হিন্দি সিনেমায় হোলির গান সব সময়ে সুপারহিট। কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব? রঙ্গ বরষে, লহু মুহ লাগ গয়া, হোলি কে দিন, জয় জয় শিব শঙ্কর, প্রভৃতি গান ইতিহাস। বরং আমার কাছে হালফিলের বলিউডের হোলির গান হিসাবে 'বলম পিচকারি'র কথা বলতে চাই। 'ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি' ছবির রণবীর কাপুর-দীপিকা পাড়ুকোনের লিপে এই গান ছাড়া যেকোনো হোলির পার্টিই অসম্পূর্ণ।

প্রশ্ন : হিন্দি না বাংলা গান – কোন গান গাইতে বেশি পছন্দ করেন?

উত্তর : গানকে কোনো ভাষার বেড়াজালে বন্দি করতে চাই না। গান ও সুরের আবেদন ইউনিভার্সাল। একজন পেশাদার গায়িকা হিসাবে ভারতের সব ভাষার গান গাইতে পছন্দ করি।

প্রশ্ন : এই মুহূর্তে বাংলা গানের চাহিদা ও শ্রোতা কি কমছে?

উত্তর : বাংলা গানের চাহিদা ও শ্রোতা কমছে এই ঠিক নয়। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দর্শক-শ্রোতাদের রুচি বদলে গেছে। গানের ভাবনা, কথা ও সুরে অনেক বৈচিত্র্য এসেছে। সিডির জমানা

ফুরিয়ে গান একটা বড়ো চ্যালেঞ্জের জায়গায় দাঁড়িয়ে। আগে গান মানে বোঝাত ফিল্মের গান। আর এখন ফিল্মের গানের চেয়ে লোকের ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিকের দিকে ঝোঁক বেড়েছে। এটা খুব ভালো লক্ষণ।

প্রশ্ন : ইন্ডিপেন্ডেন্ট গান বলতে কি আপনি বেসিক গানের কথা বলছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি মৌলিক গানের কথা বলতে চাইছি। এক সময়ে বাংলায় ছায়াছবির গানের পাশাপাশি বেসিক বাংলা গানের খুব চাহিদা ছিল। পুজোর সময় আমরা অপেক্ষা করে থাকতাম প্রিয় শিল্পীদের মুখে নতুন নতুন গান শোনার জন্য। বাংলা সিনেমায় যেমন ভাবনা, প্রয়োগ ও প্রযুক্তি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তেমনি বাংলা গানেও এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে। শ্রোতারা নতুন কিছু শুনতে পাচ্ছেন। অন্যদিকে, বলিইডে গান মানে ফিল্মি গান। গান মানে এখন ভিডিও, না হলে অনেক মানুষের কাছে এক সঙ্গে পৌঁছোন মুশকিল। মানুষ গান শোনার জন্য সময় দেন কম আজকাল, তাই এখন সিঙ্গলসের যুগ।

প্রশ্ন : এখন কী ধরনের গানের চাহিদা বেশি ?

উত্তর : সব ধরনের গানের চাহিদা রয়েছে। প্রত্যেক শিল্পীর স্টাইল যেমন আলাদা, তেমনি তাঁদের নিজস্ব ফ্যান-ফলোয়ার রয়েছে। আমার গানের সঙ্গে কি আকৃতি কক্করের গানের স্টাইল মেলে? আমি মেলোডি পছন্দ করি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখে বাণিজ্যিক গান গাইতে এসেছি।

প্রশ্ন : একসময় জীবনমুখী বা ব্যান্ডের গানের যে ধারা ছিল তা কি কমে যাচ্ছে?

উত্তর : আধুনিক বাংলা গানের জগতে নতুন ধারা এনেছিলেন কবীর সুমন ও নচিকেতা চক্রবর্তী। আমার পছন্দ নচিকাকা (নচিকেতা চক্রবর্তী)। আমি ওঁকে কাকা বলে ডাকি ও নচিকাকা আমাকে 'সোনা মেয়ে' বলে ডাকেন। নচিকাকার গানের কথা যেমন, সুরও তেমন। বাস্তবধর্মী কথার সঙ্গে রয়েছে অসম্ভব মেলোডি। নানাভাবে গান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ও এখনো করেন। আমার সঙ্গে নচিকাকার প্রথম অ্যালবাম — 'নচিকেতা এবার সফর'। যা আমার কাছে চিরস্মরণীয়।

প্রশ্ন : আপনি সিঙ্গারের পাশাপাশি একজন মিউজিক কম্পোজার। এই ভাবনা কী ভাবে এল?

উত্তর : আমি মূলত একজন সিঙ্গার হলেও, গানের নানা বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করি। অনেক ভাবনা মাথায় আসে। তার থেকে মিউজিক কম্পোজ করার কথা মাথায় আসে। ২টো ফিচার ফিল্মে গান কম্পোজ করেছি — লাইমলাইট ও বিদ্রোহিনী। নিজের কথা ও সুরে গান গাওয়ার মজাই আলাদা।

প্রশ্ন : এবার টলিউডের একঝাঁক সেলিব্রিটি ভোটের প্রার্থী হলেন। সক্রিয় রাজনীতিতে এলেন। আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

উত্তর : এটা যার যার নিজের সিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। আমি মনে করি, ২ নৌকায় পা দিয়ে চলা যায় না। যেকোনো ক্ষেত্রে সফল হতে চাইলে নিজেকে পুরোপুরি দিতে হয়। শিল্পীর জায়গাটা রাজনৈতিক মঞ্চ নয়। মানুষের জন্য নানা ভাবে কাজ করা যায়। এখন নিজের মতামত জানানোর জন্য সামাজিক মাধ্যম রয়েছে। আমি নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে নিজের বক্তব্য জানাই। গানের মাধ্যমে নিজের ভাবনার প্রকাশ করি।

প্রশ্ন : সাফল্যে কতটা খুশি?

উত্তর : আমি কতটা সফল তার বিচার করবে দর্শক- শ্রোতারা ও গণমাধ্যমে। আপনারা সবসময়ে আমার পাশে থেকেছেন। আমার কাছে সাফল্য পাওয়া মানে টিকে থাকা। কেরিয়ারে ওঠা-নামা ছিল, কিন্তু কখনো থমকে যাইনি। অনেক সমসাময়িক হারিয়ে গিয়েছেন। তাই টিকে থাকাটাই আসল কথা। ধীরে ধীরে এখন যেমন চলছে, আগামীদিনে তেমন চলবে।

প্রশ্ন : নতুন কোনো স্বপ্ন?

উত্তর : গান নিয়ে সবসময়ে নতুন কিছু করতে চাই। এই তো গান নিয়ে একটা অডিও-বুক বের করলাম। লকডাউনের সময় লিখেছিলাম। এখানে নিজের গান গাওয়ার অভিজ্ঞতার পাশাপাশি প্লেব্যাক গানের টেকনিক নিয়েও বলেছি। এটা শুধু যাঁরা গান-বাজনা করেন তাঁদের নয়, গান যারা ভালোবাসেন তাঁদেরও ভালোলাগবে।

প্রশ্ন : নতুন কোনো স্বপ্ন?

উত্তর : গান নিয়ে সবসময়ে নতুন কিছু করতে চাই। এই তো গান নিয়ে একটা অডিও-বুক বের করলাম। লকডাউনের সময় লিখেছিলাম। এখানে নিজের গান গাওয়ার অভিজ্ঞতার পাশাপাশি প্লেব্যাক গানের টেকনিক নিয়েও বলেছি। এটা শুধু যাঁরা গান-বাজনা করেন তাঁদের নয়, গান যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদেরও ভালো লাগবে।

প্রশ্ন : নতুন ছেলেমেয়ে যাঁরা 'অন্বেষা' হতে চান তাঁদের কী পরামর্শ দেবেন?

উত্তর : আমি পরামর্শ দেওয়ার কে? কাউকে অনুকরণ নয়, গড়ে তুলতে হবে নিজস্বতা। নতুন প্রতিভার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ রিয়েলিটি শো কিন্তু এটাই একমাত্র মাধ্যম নয়। আজকাল নানা চ্যানেলে রিয়েলিটি শো নিয়ে ব্যাপকভাবে বাণিজ্য হয়। চ্যানেলের টি আর পি বাড়ানোর হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা হয়। এই শো থেকে বেরিয়ে অনেকে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও গ্ল্যামার ও টাকার লোভে হারিয়ে যান। সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বাংলায় প্রতিভার অভাব নেই। ধারাবাহিক চর্চার মধ্যে থেকে নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে। মন দিয়ে গান শিখতে হবে। রাতারাতি সাফল্য পাওয়া যায় না।

বাংলার হারানো খেলা

সৃঞ্জয় ঠাকুর

সময়ের নিয়মে বাংলার বুক থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক খেলা। যা এক সময়ে গ্রাম বাংলায় খুব জনপ্রিয় ছিল। এই প্রতিবেদনে তেমনই কিছু হারানো খেলার কথা তুলে ধরা হল।

লাঠিখেলা : এই খেলা একটা ঐতিহ্যবাহী কসরত যা লাঠি দিয়ে খেলতে হয়। লাঠি আত্মরক্ষায় বা লড়াইয়ে ব্যবহার হত। এই রাজ্য ও বাংলাদেশের নানা জায়গায় এক সময় খুব জনপ্রিয় ছিল লাঠিখেলা। বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, নড়াইলে ঈদ উপলক্ষে লাঠিখেলার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এখন আর খুব একটা দেখা যায় না। এক সময়ের বলিষ্ঠ যুবকদের কাছে জনপ্রিয় এই খেলা এখন প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। ইংরেজ শাসনকালে জমিদাররা নিরাপত্তার জন্য লাঠিয়ালদের নিযুক্ত করতেন। পুজো ও মহরম সহ নানা অনুষ্ঠানে লাঠিখেলার আয়োজন হত। এই খেলার জন্য ব্যবহার করা লাঠি ৪-৫ ফুট লম্বা হয়। এক অদ্ভুত কৌশলের সঙ্গে প্রত্যেক খেলোয়াড় নিজের নিজের লাঠি দিয়ে রণকৌশল দেখায়। লাঠিখেলার আসরে লাঠির পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ঢোলক, কর্নেট, ঝুমঝুমি, কাড়া ব্যবহার হয়। যারা খেলত তাদের লাঠিয়াল বা লেঠেল বলা হয়। এখনও এই রাজ্যের মেদিনীপুর জেলায় লাঠিখেলা দেখা যায়।

এক্কাদোক্কা : এক সময়ে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল এই এক্কাদোক্কা। অঞ্চলভেদে আলাদা নাম ছিল যেমন, সাতখেলা, চিরিয়া, কুতকুত ইত্যাদি।

বাড়ির উঠোনে কিংবা খোলা জায়গায় মাটিতে আয়তাকার দাগ কেটে খেলা হত এক্কাদোক্কা। আয়তকার ঘরের মধ্যে লম্বালম্বি দাগ টেনে দু'টি ও আড়াআড়ি দাগ টেনে তৈরি করা হয় আরো চারটে খোপ। যেহেতু এক্কাদোক্কা একপায়ে ভর করে লাফিয়ে খেলতে হয়, তাই এখানে দু'ভাগ বিশিষ্ট চার নম্বর খোপটি হচ্ছে বিশ্রামকক্ষ। মাটির হাঁড়ি বা কলসির ভাঙা টুকরো দিয়ে তৈরি চাড়া বা খঁটি হচ্ছে এই খেলার উপকরণ। পর্যায়ক্রমে এক এক করে প্রতিটা ঘরে চাড়া ছুঁড়ে ফেলতে হয়। তারপর এক পায়ে লাফ দিয়ে দাগে পায়ের স্পর্শ এড়িয়ে ওই চাড়া পায়ের আঙুলের টোকার সাহায্যে ওই ঘর থেকে বের করে বাইরে আনতে হয়। চাড়া ছোঁড়ার পর নির্দিষ্ট ঘরের বাইরে পড়লে, দাগের ওপর পড়লে, পা দাগে লাগলে, বা দু'পাশের রেখা পার হয়ে গেলে খেলোয়াড় আউট হয়ে যায়। ফলে খেলার সুযোগ পায় দ্বিতীয় জন। এভাবে পর্যায়ক্রমে যে আগে সব ঘর পার হয়ে আসতে পারে সে এক্কাদোক্কা খেলায় জিতে যায়।

কানামাছি : গ্রাম বাংলায় এক সময় ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় ছিল কানামাছি। কানামাছি খেলার সময় বলতে হয় 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ'। এই খেলায় কাপড় দিয়ে একজনের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। সে অন্য বন্ধুদের ধরতে চেষ্টা করে। যার চোখ বাঁধা হয় সে হয় 'কানা'। অন্যরা মাছির মতো তার চারদিকে ঘিরে ছড়াটি বলতে বলতে তার গায়ে টোকা দেয়। চোখ বাঁধা অবস্থায় সে ওদের ধরার চেষ্টা করে। কাউকে যদি ধরতে পারে ও বলতে পারে তার নাম তবে যাকে ধরেছে তাকে 'কানা' সাজতে হয়।

গোল্লাছুট : এক সময়ে গ্রামবাংলায় খুব জনপ্রিয় ছিল গোল্লাছুট। এটা খেলার সময় চারপাশ জুড়ে হৈ হল্লোড় পড়ে যায়। এই খেলায় দুটো দল থাকে। মাটিতে এক জায়গায় গর্ত করে একটা লাঠি সেখানে পুঁতে তাকে কেন্দ্র হিসাবে ধরা হয়। এই লাঠিকে কেন্দ্র করে বৃত্ত তৈরি করে ২৫/৩০ ফুট দূরে আরো একটা রেখা টেনে সীমানা ঠিক করা হয়। খেলার শুরুতে ঠিক করা হয় প্রথম দু'জন দলপতি হবে। গোদা বলা হয় দলপতিদের। দু'টি দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। দলপতি মাটিতে পুঁতে রাখা কাঠি এক হাতে ধরে অন্য হাতে তার দলের খেলোয়াড়দের হাত ধরে থাকে। এভাবে তারা একে অন্যের হাত ধরে কেন্দ্র ছুঁয়ে ঘুরতে থাকে। তাদের লক্ষ্য হল বৃত্তের বাইরে যে কাঠি বা গাছ থাকে তা দৌড়ে স্পর্শ করা। অন্যদিকে, দৌড়ে কাঠি বা গাছ ছোঁয়ার আগে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা যদি ওই দলের কোনো খেলোয়াড়কে স্পর্শ করতে পারে তাহলে সে খেলা থেকে বাদ যাবে।

বউ-ছি : এই খেলায় দু'টো দল থাকে। সব দলে ৮ থেকে ১০ জন করে খেলোয়াড় হলে খেলা জমে ওঠে। মাঠ বা বাড়ির উঠোনে যেখানে খুশি এই খেলা খেলা যায়।

পুজোয় বেড়ানোর সঙ্গী ওষুধ

পুজোয় যেখানেই যান না কেন আচমকা শরীর খারাপ হলে পুরো আনন্দটাই কিন্তু মাটি। তাই পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল যেখানেই বেড়াতে যান সঙ্গে রাখুন কিছু দরকারি ওষুধ। এ বিষয়ে জানাচ্ছেন চিকিৎসক **ডাঃ নাসিম আখতার**

জরুরি পরামর্শ

ঘর ছেড়ে বাইরে পা রাখলেই আমরা কিছুটা হলেও বেহিসেবি হয়ে উঠি। ইচ্ছেমতো খাওয়াদাওয়া চলতেই থাকে। তাই সামলে রাখুন আপনার জিভ ও মনের বেয়াড়া সব ইচ্ছেকে। কিছু সাধারণ নিয়মবিধি মনে রাখতে হবে।

- সব সময়ে সঙ্গে রাখুন জিওলিন। এক গ্লাস জলে ২ ফোঁটা জিওলিন ফেলে খাবেন। সম্ভব হলে পর্যাপ্ত মিনারেল ওয়াটার সঙ্গে রাখুন। তবে কোল্ড ড্রিঙ্কস নৈব নৈব চ।
- পাহাড়, জঙ্গল বা সমুদ্র যেখানেই যান সঙ্গে করে গোটা ফল, বিস্কুট, মুড়ি নিয়ে যান। সেসবই সময় মতো বের করে খান। এতে পেট খারাপ হওয়ার ভয় থাকে না।
- খাওয়ার আগে রোগ-জীবাণু এড়াতে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত পরিষ্কার করবেন।
- সমুদ্রের পাড়ে সামুদ্রিক মাছ ভাজা সুস্বাদু ও উপভোগ্য হলেও এসব এড়িয়ে চলুন। কারণ, বাসি মাছ কড়া করে ভেজে রঙ ও কেমিক্যাল মাখিয়ে বিক্রি করা হয়। এইসব মাছ থেকে সংক্রমণের ভয় থাকে।

বাচ্চা থাকলে কী করবেন

সঙ্গে বাচ্চা থাকলে তাকে নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে। বাচ্চারা যখন তখন খেতে চাইবে। সেজন্য সঙ্গে রাখতে হবে বিস্কুট, ফল, গুঁড়ো দুধ, ফলের রস, চকোলেট ইত্যাদি। এছাড়া প্রাথমিক চিকিৎসায় সতর্ক থাকুন। যেমন,

- সর্দি-কাশিতে নাকে ড্রপ ও কাফ সিরাপ খাওয়ান।
- জ্বর হলে প্যারাসিটামল খাওয়ান।
- বমি হলে ডমপেরিডন ও লুজ মোশনে নরফ্লেক্সাসিন, মেট্রোনিডাজেল কম্বিনেশন খাওয়ান।
- আচমকা কেটে-ছড়ে গেলে বিটাডাইন লোশন দিয়ে কাটা অংশটা ধুয়ে নিন। এরপর অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল মলম লাগান।
- শ্বাসকষ্টের ধাত থাকলে বড়দের মতো ইনহেলার রাখুন।

বয়স্ক সঙ্গী থাকলে

বয়স্ক বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি বা অন্য কোনো আত্মীয় সঙ্গে থাকলে খেয়াল রাখুন কিছু বিষয়।

- খুব বেশি স্ট্রেস জার্নি চলবে না।
- যাঁরা নিয়মিত ওষুধ খান তাঁরা (প্রেসার, সুগার বা হার্টের)

সেসব কাছে রাখুন।

- ডায়াবেটিস রোগীদের সুগার টেস্ট নিয়মিত করার দরকার থাকলে টেস্টিং কিট নিতে ভুলবেন না।
- কাটা ফল খাবেন না।
- শরীর বুঝে ঘোরাঘুরি করবেন।
- হাঁপানি থাকলে ইনহেলার সঙ্গে রাখুন।
- বাইরে বেড়াতে গিয়ে আবেগের বসে নিজের বয়স ও পরিস্থিতি ভুলবেন না। এমন কিছু করবেন না যাতে বিপদ আসে।

কোন রোগের কী ওষুধ

জ্বর, হাত-পা ও মাথা ব্যথা হলে ৫০০ মিগ্রা প্যারাসিটামল ৩-৪ বার ভরা পেটে খেতে হবে।

কাশি ও গলা ব্যথায় দিনে ২-৩ বার গার্গেল করবেন। মাঝে মাঝে চা বা গরম জল খাবেন। খুব গলা ব্যথা হলে প্যারাসিটামল খেতে পারেন। পাহাড়ে গেলে বেশি করে শীতের পোশাক সঙ্গে রাখবেন।

পেটের সমস্যা, অম্বল, বুক জ্বালা হলে ওমোপ্রাজাল গ্রুপের ওষুধ খেতে পারেন। ওষুধ খালি পেটে বা প্রতিবার খাওয়ার অন্তত ৩০ মিনিট আগে খাবেন। আলসারের রোগীরা খালি পেটে থাকবেন না। বদহজম এড়াতে পেট খালি রেখে খাবেন। খুব অ্যাসিডিটি হলে অ্যান্টাসিড খেতে পারেন।

বমি ভাব হলে ডোমপেরিডোন খেলে উপকার পাবেন।

পাতলা পায়খানা হলে আইমোডিয়াম ক্যাপসুল খেতে পারেন। তাতেই না হলে ৬ ঘণ্টা পরে ফের একটা খেতে পারেন। সঙ্গে রাখুন ওয়ারেসের প্যাকেট। ১ লিটার জলে একটা ওয়ারেস প্যাকেট গুলে বারবার খেতে হবে। পাতলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত বা জ্বর থাকলে আমোক্সিলিন খেতে পারেন।

কবিতা

সুপ্ত আশা

শীলা দাস

আমি এক সাধারণ মেয়ে
বসে আছি পথপানে চেয়ে,
মনে মোর কত আশা
বাঁধছে এসে নতুন বাসা।
হতেম যদি একটি পাখি
ব্যাধের চোখে দিতেম ফাঁকি ।
সমাজ এ যারা দীনদুঃখী,
হতাম আমি তাদের সখী।
ভোরের আলোয় ডাকতেম ওদের
জাগো জাগো বলে,
ওরা করতো দিনকে গ্রহণ
রাতকে দূরে ফেলে ।
দুপুরবেলার নির্জনেতে
গাছের কোন ডালে বসে,
পথিক গণের ক্লান্ত মনে
রঙ লাগাতেম মিষ্টি গানে ।
হঠাৎ কোন কোলাহলে
স্বপ্নের তার গেল ছিঁড়ে
দেখি নিজের পানে চেয়ে
আমি এক সাধারণ মেয়ে।

যন্ত্রণা

সুজয় পাল

চিয়ার্স!
আজকের পার্টিতে ভরপেট মদ খাবো
একেবারে গলা অব্দি, বারণ শুনবো না
ঝিমুনি আসবে, কখনও কখনও খিস্তি
রক্তচক্ষুর মতো চোখ লাল হয়ে উঠবে
তোমারও মুখ হবে লাল, তবে লজ্জায়

মদ খেতে খেতে, যতক্ষণ না
বমি উঠে আসে, বারণ শুনবো না

জমে থাকা যন্ত্রণা উগরে না দিলে
কীসের আর উল্লাস

নিষ্ঠুর প্রেমিকার জন্য

সুবিমল সরকার

১
মৃত্যুকে ভয় করতাম না,এখন করি
এখন যে তুমি আছো,কি করে মরি।
২
স্বপ্নেই পাই শুধু মধুর সঙ্গ
স্বপ্নেই ছুঁয়ে থাকি সোনালি অঙ্গ ।
৩
জেনে গেছো জীবনের মূল তত্ত্ব
প্রেম নয়,প্রয়োজন নির্মম সত্য।
৪
কি কঠিন তোমার চোখের ভাষা
তারই মধ্যে খুঁজে ফিরি জীবনের আশা।
৫
আবেগ নারীকে করে না বিবশ
পুরুষ শুধুই থাকে প্রেমে অবশ।
৬
এ জন্মে তোমাকে পাইনি,পরজন্মে চাই
যদি হও অন্যের ঘরনী,বেছে নেব নরকে ঠাঁই ।

ছায়া

সুপ্রীতি দত্ত

কখনো পায়ে,
কখনো সারা শরীরে জরায়।
যতো ঠেলি,
সে ততো ঠেলে সজোরে।
সরাতে চায় দূরে,
তাও সরতে চায় না সে।
কখনো ডানে কখনো বাঁয়ে,
লুকোচুরি খেলে।
একদিন পড়ন্ত রোদে,
চেয়ে দেখি আলতোভাবে,
ছুঁয়েছে ছায়াটি আমার,
মিশেছে আমারি সাথে।

বিরূপ–বিভ্রান্তি

মানসকুমার ঠাকুর

হায় কবি!
তুমি কি তোমার কলমে এখনও প্রেম লেখো!
তুমি কি তোমার মনের মণিকোঠায়
কোন জায়গায় রেখেছো?
যেখানে প্রেম বললে
কবিতা চলে আসে?
তুমি কি জেনেছো!
আজ প্রেম সময় উপযোগী।
প্রেম বললে–আসে চরম বিভ্রান্তি
আসে বুক চাপা আর্তনাদ।
প্রেম শব্দের মধ্যে লুকিয়ে থাকে
এক ভয়াবহ বিষ–
যা ভালোবাসায়– বাঁধে না
যা বিশ্বাসকে ছুড়ে ফেলে দেয়
ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে–
যেখানে উপলব্ধির যন্ত্রণা
অসহনীয় অবস্থায় রূপ নেয়।
প্রেম শব্দটা যেখানে–
স্বার্থান্বেষী – সংকীর্তনে নেমেছে
যেখানে তুমি আর
প্রেমের কবিতা লিখো না।
কবি, তুমি প্রেমের অবমাননা
করো না আর–
আমরা সবাই ঠকে যাবো
বারে–বার।
প্রেমকে ওরা নিয়ে এসেছে পানশালায়
ওরা বন্দি রেখেছে জতুগৃহে
ওদের সংশয় মন
প্রেমকে ফেলেছে অবমাননায় আবহে।
আমি জানি প্রেমকে দেখতে হবে
মিলনের তীর্থক্ষেত্রে,
শুদ্ধ চিত্তে, নির্লোভ আত্মাকে পেতে
হাঁটতে হবে নির্জন পথ
হয়তো যেতে হবে কুরুক্ষেত্রে,
এ ব্যথা আমার নয়
এ ব্যথা তোমারও
তুমি সরে এসো
তোমার লেখনি নিয়ে।
মনকে বলো তুমি হতে পারবে না কাপুরুষ
কালের সঙ্গে যুদ্ধ করে তুমি হবে কালপুরুষ।

ভালোবাসার রেণুতে

তনিমা সাহা

শ্রাবণ মাসের প্রথম বৃষ্টির সিক্ত রজনী,
দিনের প্রথম থেকে শেষ আলো পর্যন্ত
অবিরাম পড়ছে ঝরে স্ফটিক ধারারা
আমি ভিজে জবুথবু, হলুদ রঙের সুতি চুড়িদারটা,
লেপ্টে আছে শরীরে–
আমি ছাড়া আছে আরো কজন, বাসস্টেডের এই শেডটাতে
পতীমায় তারাও, হয়তো ভাবনারা ধরা আছে কোনো কিছুতে,
জোরে একটা বজ্রপাত, কেঁপে উঠলাম আমি,
সেকি ঝড়ো হাওয়ার জন্য নাকি লোলুপ দৃষ্টাতঙ্কের জন্যে,
তা জানি না–
শুনেছি বৃষ্টির জলে নাকি মিশে থাকে ভালোবাসার রেণু,
ভালোলাগার গন্ধ মেখে থাকে হিমেল বাতাসের ছোঁয়ায়,
তবে – তবে আমি কেন পাইনা ছোঁয়া,
কেন অনুভবে আসে না রেণুর দল,
কেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় না আমার সত্ত্বার সাথে তার সত্ত্বা,
তা জানি না–
হঠাৎ অনুভব করলাম এক উষ্ণ স্পর্শ, কম্পিত, শিহরিত হাত দুটো–
হঠাৎই স্পর্ধা পেল পরিচিত স্পর্শে,
দেখলাম তুমি – একদিন তোমার খোঁজেই নেমেছিলাম পথে,
নাহ–আর ফিরে যেতে পারি না আমাদের ভালোবাসার নীড়ে,
তবে–ফিরে ছিল, ফিরে ছিল শুধু...
সেদিনও ছিল এমনই শ্রাবণ রজনী
তারপর করে গেছি শুধু অপেক্ষা, জানতাম একদিন তুমি ফিরবে,
এই একই পথে– আজ আমার অপেক্ষার ইতি,
আজ আমি –তুমি ডুব দেব ভালোবাসার সাগরে
বাঁধব আবার বাসা, গড়ব আবার ভালোবাসার রেণুতে ভালোবাসার নীড়।

কবে হবে খবর

সুমন্ত চক্রবর্তী

যে ছেলেটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে যায় প্রতিদিনের খবরের কাগজ ওকে আমি চিনি, দেখেছি ওদের ভাঙাচোরা সংসার , টালির চালা, গুলি বাঁশের দেয়াল্ক্র ওই রকম অনেক ঘর বাড়ির সঙ্গে ওদের বসবাস ঘরকন্যাক্র ওর মা ভাঙাচোরা শরীরে এর ওর বাড়ি ঝারপোছ বাসন মাজার কাজ করে বাবা ওর ক্ষয় রোগে মারা গেছে কিছু কাল আগে নিরক্ত শরীরের বোনটা খুদকুটো যা জোটে তা দিয়েই মা ভাইয়ের খিদে মেটায় বস্তির রুগ্ন পুরুষেরা কেউ রিকশা চালায়, কেউ বা সবজি কেনাবেচা করে, ওদের বাচ্চা গুলো নগ্ন শরীর এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়, তাদের বাবা কাকারা একদিন ছিল কোনো না কোনো কারখানার শ্রমিক বহুদিন বন্ধ কারখানা, এখন বেকার বসে দিন গুনতে, ভাবছে হয়তো খুলে যাবে একদিন কখনো বা এদিক সেদিকে মিটিং মিছিলে নেতা মন্ত্রীরা জোরালো বক্তৃতা দেয় ভরসা রাখো খুলে যাবে কারখানা, ফিরে পাবে কাজ ওই ভরসা সম্বল করে ওরা মিছিলের ভিড় থেকে বেরিয়ে আসে, ভাবে এই ভারতবর্ষ কি আবার বিশ্বসভায় কর্মে মহান হবে (আর) প্রতিদিনের খবরের কাগজ বিক্রি করা ছেলেটা যে প্রতিদিন খাবার বিক্রি করে বেড়ায় সে ভাবে– কবে হবে ওর জন্যে ভালোভাবে বেঁচে থাকার একটা কাজের খবর–একটা কাজের খবর।

শেষ প্রেম

ইন্দ্রনীল

বেশ তো ছিলে হয়ে প্রথম প্রেম,
কখনও ভোরের কুয়াশা ঘেরা পাহাড়ের ঢালে,
কখনও বা পড়ন্ত বিকালের পেয়ারা গাছের ডালে,
চাইতে বা না চাইতে,
চাইতাম তো আমি ভীষণ ভাবে।
স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে হঠাৎ ছন্দপতন
নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা...
শুধু একরাশ স্মৃতি হয়ে রয়ে যাওয়া।
... ঘড়িতে রাত বারোটা, টিভিতে চলছে আপ কি কসম
তুষার বিছানো শ্বেতশুভ্রশীতল পাহাড়ি পথে
মুমতাজের ছুটে আসা আর সাথে কাকার
ছুড়ে দেওয়া একটা আলতো উষ্ণ 'ফুঁ'
... এক ফালি ঝলকানি দেওয়া মিসড্ কল
দেখো, যেন না হয়ে যাই
তোমার শেষ প্রেম।

জোনাকিরাও আসেনা

শান্তনু কংসবণিক

জানালাগুলো দরাজ করে খুলে রাখি প্রতিদিন।
সন্ধ্যা নামে, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত আসে,
রাত গভীর হয়।
অন্ধকারে তারা ছেটানো আকাশে
কী যে ঘোরের মতো চেয়ে থাকি !
তারারা – ওরা না হয় ভিনদেশী ,
কিন্তু আগে যে সন্ধ্যারাতে জানালার ফাঁক গলে –
জোনাকিরা দিব্যি আসতো ...
তবে ওরাও যে আজকাল এ পথ মারায় না ।
আমার চার দেওয়ালে ওরা তো
ভিনদেশী ছিল না কখনো..!
ওদের ওই যৎসামান্য আলো নিয়েও তো
কোনো অভিযোগ ছিল না আমার ।
তবে, এই যে বলা নেই কওয়া নেই
হঠাৎ করেই আসা যাওয়া বন্ধ !
না, তাদের অবশ্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই
যে পৃথিবীর ন্যায় আজন্মকাল তারাও
একই কক্ষপথে চলবে !
তবুও কেন তবে ওদের উপর এত অভিমান !
এ বোধহয় মানুষের এক বড়ো দোষ –
আমরা অভিমান জমিয়ে জমিয়ে পাহাড় করি
হয়তো কখনো কখনো তা অকারণেই ।

বিশ্বযুদ্ধ

ইন্দ্রজিৎ আইচ

সন্ত্রাস যেন বিশ্বময়
খেলছে তারা পাশা
কে জিতবে কে হারবে
হারিয়েছে ভালোবাসা.....

আমার তৃতীয় চোখ বলছে
লাগবে আবার বিশ্বযুদ্ধ
জানিনা কে বাঁচবো– মরবো
আমরা সবাই বাকরুদ্ধ.....

যত আছে রাষ্ট্র সব
সব হবে ধ্বংস
এই যুদ্ধ যেন মহাযুদ্ধ
বাঁচবে না কোনো অংশ.....

করোনায় চলে গেছে
শত শত প্রাণ
যুদ্ধ যেন সম্মুখে
এগিয়ে আসছে বান.....

আমরা শিখিনি অস্ত্র শিক্ষা
জানিনা কূটনীতি আর সন্ত্রাস
আমি তুমি জানি মানবতা
মনে বড় ভয় আর ত্রাস.....

চাই না রক্ত চাই না মৃত্যু
মাঝেমধ্যে ভাবি এ কোন দেশ
নিজেকে করি শুধু প্রশ্ন
শান্তি ফিরবে কি শেষমেষ?...

বর্ণবৈষম্যে আর জাতপাত
সব কিছু চুলোয় যাক
এই সবেতেই অশান্তির শুরু
কেউ কারোর গলাবে না নাক...

আজ পৃথিবী বড় সঙ্কটময়
কোনো রকমে দিন গুজরান
জানি না কাল কার কি হবে
সবাই ডাকছে ভগবান...

আফগান জিতেছে কবুল
এখনো চলছে যুদ্ধ
সেনারা করছে শেষ লড়াই
তাই দেখে সকলে মুগ্ধ.....

এসো আমরা প্রার্থনা করি
আর যুদ্ধ নয় শান্তি চাই
জগতে ফিরুক ভালোবাসা
আমাদের বোন আমাদের ভাই।

রাইরাধা

তানিয়া

ওঠো গো রাই জলকে চলো
শ্যামের বাঁশি বাজে
বংশীধারীর হৃদয় যে আজ
বাঁধা তোমার কাছে
আলগা রেখো খোঁপার বাঁধন
নূপুর পড়ো পায়ে
কাজলা চোখের গোলকধাঁধায়
শ্যাম হারিয়ে যায়
বসে আছে শ্যাম প্রতীক্ষাতে
প্রাণযমুনার তীরে
রাই কিশোরীর মনে লাগে আজ
কম্পন ধীরে ধীরে
তুমি মম শ্যাম তুমি সুন্দর
একই দেহে তুমি
আধা নারী ও নর
সেই শ্যাম–রাই হলো যে
আজিকে অর্ধনারীশ্বর।

মা আসছে

বর্ণালী

আমরা সবাই দিন গুনছি মা আসছে !
খুঁটি পুজো, থিমের বহর
শ্রাবণ জলে ভাসলো শহর
তবু কেমন খুশির লহর
মা আসছে!

বছর ভ'রে কজন গেল?
ক্ষতিপূরণ ক'জন পেল?
হিসেব সবই এলোমেলো
মা আসছে!

ঘুমের চাদর মোড়া রাতে
চাকার লেহন অনিচ্ছাতে
তবু জাগি সু-প্রভাতে
মা আসছে!

নৌকায় না দোলায় এবার?
হুড়োহুড়ি দখল নেবার
কোন দাদারা পাচ্ছে ফেবার
মা আসছে!

অন্ধকারে পথের পাশে
ছোট্ট শিশু মুচকি হাসে
দেখবে আলোর ঝলকানি সে
মা আসছে!

শূন্য দৃষ্টি , একা বাড়ি
কাছের মানুষ বিদেশ পাড়ি
দরজায় ভয়, স্তব্ধ নাড়ি
মা আসছে!

জীবন বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে
লাখো মেয়ে করলো বিয়ে
ফিরলো ক'জন খাট সাজিয়ে
মা আসছে!

ভবিষ্যতের টিকিট বাঁধা
অসীম চাপের জটিল ধাঁধা
হচ্ছে না তো ঠিক সমাধা
মা আসছে!

(তবু) হঠাৎ কোনো পথের বাঁকে
সাইদুল তার অন্তরা কে
মন মেলানোর স্বপ্ন আঁকে
মা আসছে!

আমরা সবাই ব্যস্ত ভীষণ মা আসছে!

দুর্গা আসছে

নারায়ণ নন্দী

নদীতীরে কাশফুলগুলো আজ-মাথা নেড়ে আনন্দে হাসছে।
নীলাকাশে সাদা মেঘগুলো-তুলোর মতো ভাসছে।
জলাশয়ে পদ্ম শালুক ফুটেছে-শিশিরও ঝরে ভোরে।
বাতাসে বাজে আগমনী সুর,শারদোৎসব নেই আর দূরে।
মা আসছে এই ধরাধামে-শুনে মানব সন্তানের ডাক।
পুজো হবে, মণ্ডপে মণ্ডপে উঠবে বেজে শঙ্খ কাঁসর ঢাক।
মন্ডপগুলোও সব উঠবে সেজে,রঙিন দীপ আর ফুলমালায়।
আলপনা পড়বে মণ্ডপে-নৈবদ্য সাজিয়ে দেবো মাকে থালায়।
শরতের শিশিরে ভিজে আনন্দস্নাত আজ-প্রকৃতির দিগন্ত।
পুজোর আনন্দে কচিকাঁচারা সবাই খুশি-যেন চঞ্চল প্রাণবন্ত।
শুধু মা দুর্গা নয়,লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ-অসুরও আসেন সাথে।
মা দুর্গা মর্ত্যে এসে বরাভয় দেবে মঙ্গলের তরে-তার দশটি হাতে।
মা আসছে, মা আসছে-এই আনন্দে খুশি আজ সবার মন।
শরতের এই পুণ্যদিনে তোমার অপেক্ষায়-আছি যে মা প্রতিক্ষণ।
প্রার্থনা করি-মর্ত্যে এসে মাগো তুমি দাও গো মোদের বরাভয়।
চলছে দুর্দিন,কাটছে সময় খুব কঠিন,সব দূর হয়ে-হয় যেন জয়।

ফেরার স্বপ্ন,,,

কমলাকান্ত মল্লিক

রোজ সকালে
গীটার বাজিয়ে রেওয়াজ করতো
যে মানুষটা,
গীটারের সুমধুর ধ্বনিতে
রোজ সকালে ভাঙতো ঘুম,
আর শোনাই যায় না
সেই সুমধুর ধ্বনি,
দেখাই মেলে না সে শিল্পীর,
বেশ কিছুদিন ধরে সে শব্দ নিঝুম,
কোথায় মুখ লুকালো কি জানি!!

শোনা যায় না
তার নিপুণ আঙ্গুলে বাজানো তার,
সুসজ্জিত ঝলমলে রাতে,
পানশালার জমাট জলসায়,
আজ আর কেউ রাখে না পা,
কেউ আসে না আর।
গীটার হাতে ফেরার স্বপ্ন নিয়ে,
কি জানি কবে ফিরবে আবার!

ঘরে বসে বসে
অনলাইন ক্লাস করে ক্লান্ত মুখখানি,
আর কত ভালো লাগে
রোজ রোজ মায়ের বকুনি,
মনে হয়, ওটাই ভালো ছিল
রেগে যাওয়া অঙ্কের স্যারের
লাল মুখখানি।
ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দ্যাখে বাপন,
শেষ পিরিয়ডের ব্ল্যাক বোর্ডে
কি যেন লেখা ছিল,
ঘাড় চুলকায়, মনে পড়ে না আর,
হয়তো বা ওটাই শেষ ছিল তার
মূল্যবান স্কুলজীবন।

আর কত ভালো লাগে
ওয়ার্ক ফ্রম হোম,,,
এর থেকে ঢের ভালো ছিল
বসের বকুনি, টিফিনে গুলতানি,
আর ফুরফুরে বাতাস খেতে খেতে
লোকাল ট্রেনের অফিস জীবন।
ওরা,আমরা, এরা সবাই ,,,
আজ শুধু প্রহর গুনি,
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ঢেউ
পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ার
নির্মম সব শব্দ শুনি,,,
কারো জানা নেই
এ আশঙ্কার শেষ কোথায়,,
সব প্রশ্ন,উত্তরহীন ঘুরে বেড়ায়,
ওরা, আমরা সবাই,,
আজ প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে আছি
একই ছাদের কিনারায়,
সবাই ফিরতে চায়,
যে যার নিজের জায়গায়।

আমার গ্রাম

শুভ্রাংশু শেখর পাত্র

কতকাল তোরে আমি –
এসেছি ফেলে
তাই বলে ভাবিস নে মা ,
তোরে আমি গেছি ভুলে ।

তোরে ফেলে যাই না আমি–
যেথায় চলে
ফল্গুসম প্রাণ যে আমার
সদাই তোরই কথা বলে ।

যত বালাই থাক না পড়ে,
ভোরের বেলায় উঠি জেগে ।
তুই যে বেশেতেই থাক্ না–
মাগো, বড়ই ভালো লাগে ।

গ্রীষ্মের ঐ রোদ্রতাপে,
মাঠঘাট যখন ধূ–ধূ করে
তোরই আঁচল ধরে–
দেখতাম আমি ফিরে ফিরে ।

যখন ছল করে তুই ভয় দেখাতিস ,
আউলে দিয়ে ভ্রমর কালো কেশ
হাসতাম আমি মুখটি টিপে
দেখব বলে মাতাল –সম বেশ ।

বর্ষার দিনে উঠতাম রেগে,
কেন মা তোর নীরব চাওয়া
তোর এতই আছে তবু তুই–
দিস্ না কেন বাদল হাওয়া ।

বাদল দিনের বাদল হাওয়ায়
উঠত মন মেতে
হাঁটুজল ধেয়ে চলি –
নাইবা দিলি অন্ন, পাতে ।

আশ্বিনে তোর রূপের হাটে–
গর্বে বুক ফুলে ওঠে
সবুজ –সবুজ ধানের ক্ষেত ,
কাশের ঢেউ মাঠে –মাঠে ।

সোনালি রোদে নীলের চাদর
এমনই রূপ দেখে
যত দুঃখেই থাক না মানুষ
তোর পুজো ভুলে থাকে!

অঘ্রাণে এমন ক্ষেতভরা–
তোর পাকা ধানে
গরীব চাষীর কত স্বপ্ন–
মনে মনে!

শীতল শিশির রাত্রি–ভোর
হোক না যত আলো আঁধার
গুনগুনিয়ে ওঠে গান
দুঃখ সকল মানে হার ।

ফাল্গুনে যত ফলের মুকুল,
মৌমাছিরা গন্ধে আকুল
জ্যোৎস্না ভরা আকাশ দেখে,
ঘুম আসে না চোখে ।

চৈত্রে তোর ঝরা রূপে–
তাকিয়ে থাকি দূরে,
আসবি আবার কবে, মাগো
মোর গ্রামের পথটি ধরে ।।

ক্ষমা করো

প্রদীপ চন্দ্র

আমার সব কবিতা দিয়েও
বাঁচাতে পারিনি তোমায়,
আমার সহস্র কবিতা
তোমার অঙ্গে লেপন করেও
ঢাকেনি শালীনতা তোমার,
বর্বরতার ক্ষিদের কাছে
হেরেছি আমি,
আমার সমগ্র কবিতা,
হেরেছে সমগ্র সমাজ
ক্ষমা করো তুমি
প্রিয়াঙ্কা রেড্ডি।

মনুষত্বের কাদা ছোড়া
কথার স্লোগানে
অমানুষতার নির্ভেজাল বাস,
রঙিন মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে
হাজার হায়েনার নিঃশ্বাস
পথে পথে আজও দেখি
শত মহামানবের পদছাপ,
দেওয়ালে প্রতিশ্রুতির ছবি
যেন এক উজ্জ্বল উপহাস।

কিছু প্রলাপ, বিলাপ
আর কিছু আইনের প্রহসন
লুকিয়ে শানিত নখ
হাঁটি মোমবাতি মিছিলে আমি
কাগজে লেখা আর
প্রতিবাদ দেখাদেখি
তারপর ভুলে যাওয়া
এ আমার
জন্মগত অধিকার
আমিও তো অভ্যাসের দাস
ক্ষমা করো চিরকাল
নিজেকে আহুতি দিয়ে
নির্ভয়া
আর প্রিয়াঙ্কা রেড্ডি।

পুজো আসছে

মৌপর্ণা চক্রবর্তী

পুজো আসছে, পুজো আসছে।
হালকা কুয়াশা আর বৃষ্টিতে বেজে উঠবে,
আগমনীর সুর আসছে বাঙালির সেরা উৎসব
শারদীয়া দুর্গাপূজা।

প্রতি বছর পুজো আসে, চলে যায়
রেখে যায় স্মৃতির সোনালি আবেশ।
ফাঁকা মণ্ডপের মত হৃদয়ের কোণে
পুজোর রেশটুকু শুধু রয়ে যায়।

প্রতি বছর পুজো আসে, চলে যায়
নিস্তব্ধ রাতে কানে ভেসে আসে ঢাকের ধ্বনি।
আকাশের অতিদূর তারাটির কাছে
জ্যোৎস্নারা লুকোচুরি খেলে যায়।

প্রতি বছর পুজো আসে, চলে যায়
সকলের প্রার্থনা মঙ্গল করো মা।
সমুদ্রদানবের তাণ্ডবে লক্ষ লক্ষ নীড়
নিশ্চিহ্ন হয়ে ভেসে চলে যায়।

প্রতি বছর পুজো আসে, চলে যায়
আজ বিশ্ব মহামারীতে স্তূপীকৃত মৃতদেহ,
মা দুর্গার কাছে তাই শুধু প্রার্থনা
সব যেন ভালো হয়ে যায়।

সকলে নিজের মত করে
আকাশটুকু খুঁজে পাক,
প্রতি বছরের মত পুজো আসুক আর
আনন্দের সাক্ষী হয়ে রয়ে যাক।

সে ফুল

প্রবীর মুখোপাধ্যায়

কত ফাগুন এল গেল, সে ফুল কোথা ফোটে?
তবে কি সে ফুটবে এবার ধূসর হেমন্তে!
পাতা ঝরার প্রারম্ভে, না হীরক সায়াহ্নে ?

কোন ইশারায় ফুল সে ফোটায় দিবস ও রাত্রে
শিশির হয়ে ঝরতে থাকে জ্যোৎস্নার গাত্রে।

কিছু যখন যায় বা চেনা, এমন অবেলায়
আসুক বা সে নাই বা আসুক , খুব কি আসে যায় !

প্রেম

গীতা দাস

প্রেম তোমার স্পর্শ পরাগে
শব্দ আজ ছন্দে মুকুলিত,
তোমার বাক্য দোলায় আজ সদ্য প্রস্ফুটিত।
বিশ্বের প্রতিটা জীবের মধ্যে তুমি আছো সদা বিরাজমান।
অথচ তোমায় নিজের করে চাইলে, নিঃশব্দ অন্তর্ধান।
প্রেম তোমার প্রথম যে করেছে আবিষ্কার
তারও তোমাতে নিজস্ব কোনো অধিকার।
তোমার স্পর্শ সুখে ভরে দাও মন প্রাণ
করুণা না করে ভালোবেসে রেখো মান।
কি ভাবে তোমার সৃষ্টি প্রেম তুমি জানোনা
তুমি আজ অনন্ত অতলান্ত
তুমি চির ভাস্বর– চিরসুন্দর অপরূপ
তুমি অবিনশ্বর অনন্য–তাই কখনো হওনা ক্লান্ত।

বিরাট বিষয়

তনুশ্রী চক্রবর্তী

শোন শোন বন্ধুগণ শোন সর্বজন
ভাগবত কথা শোন সুন্দর সুজন।।
যে কথাতে প্রাণপুরে প্রাণের প্রকাশ
প্রাণেতে প্রাণেতে হয় সর্বলোকে বাস।।

মহামুনি বশিষ্টের নাম এবে করি
তারি সাথে পরাশর নামে গল্প ধরি।।
বশিষ্টের পুত্রের পুত্র পরাশর যে
মহাপণ্ডিত তিনিই সভাসদ মাঝে।।
একদিন মুনি নদী পারাপার কালে
ধীবর কন্যার রূপ ফিরিল যে ভালে
পদ্মগন্ধা নাম হল মৎস্যগন্ধার
এই পদ্মগন্ধা সত্যবতী নাম যার ।।
দেখো কত গল্প আছে গল্পের ভিতর
এই গল্প মুনি যুগে আশীর্বাদী বর ।।

জন্ম দিল এক দ্বীপে পুত্র সত্যবতী
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে হল পরিচিতি।।
মহামুনি পরাশরের ঔরসে জাত
তিনিই হলেন বেদব্যাস নামে খ্যাত।।

যেইরূপে হল তার নাম বেদব্যাস
বেদের বিভাগ করে করেন বিকাশ।।
তিনিই রচনা করেন মহাভারত
সব মহাকাব্য মধ্যে প্রধান বিদিত।।

রচনা করেন তিনি আঠেরো পুরাণ
শ্রীমদ্ভগবতগীতার সর্বোচ্চ স্থান।।

কাব্য রচনা করেও মিটে নাই সাধ
কোথা যেন ফাঁক আছে মনেতে বিষাদ।।

মহর্ষি নারদ আসি উপদেশ দেন
শ্রীহরির গুণ ও লীলা করো বর্ণন।।

নিজের জীবন দিয়ে নারদ জানান
'সবার কষ্ট দূর করেন ভগবান'।।

এবারে শুনিব চলো নারদ কাহিনী
নারদের কথা মোরা সকলেই জানি।।
কোনো এক জন্মে জন্ম নিল দাসী গর্ভে
পাপ গেল দূরে ---ঋষিদের সঙ্গ লাভে ।।
সেই ঋষিদের উচ্ছিষ্ট ভোজন ক'রে
হরি কথা শুনে তার পাপ যায় দূরে।।
ঋষিগণ উপদেশ দেন তারে যত
বলে হরি নাম করো তুমি অবিরত।।
হরি হরি ব'লে তিনি হরি দেখা পান
নিত্য দেহ ছাড়ি নারদ পার্ষদ হন।।
এই লীলা কাহিনী বলিল ব্যাসদেবে
ব্যাসদেব রচিল তা নিজ অনুভবে।।

এই মহাগ্রন্থ তিনি করিয়া রচনা
শুকদেবকে শোনালেন তাঁর সাধনা।।

ষোলোটা বছর যিনি মাতৃ গর্ভে রয়
শুকদেব তাঁর নাম জানো তো নিশ্চয়!
ব্যাসদেব পুত্র তিনি মহা জ্ঞানীগুনী
মাতৃগর্ভেই তিনি পরম আত্মজ্ঞানী।।

মায়ার এই সংসারে বন্ধন যত
এড়িয়ে চলেন দেব সত্য অবিরত
ষোলোটা বছর পর পিতার আদেশে
ভূমিষ্ঠ হলেন পুত্র পিতৃবর আশ্বাসে
পিতা তাঁরে বর দেন হলেও ভূমিষ্ঠ
মায়ার এ সংসারে হবে না সে পুষ্ট।।

ভূমিষ্ঠ হয়েই যুবা গৃহত্যাগ করে
পথে পড়ে জলাশয় দেখে সবে তারে
স্নানরত রমনীর উলঙ্গ যুবক
জলকেলি করে তারা চলেছে যুবক।।

পিতা ব্যাসদেব তার পিছু পিছু যায়
ব্যাসদেবে দেখি রমণীরা লজ্জা পায় ।।
ব্যাসদেব ভাবে মনে অদ্ভুত ব্যাপার

বিপরীত ধর্মী মন কেন এ বিচার?
তিনি বৃদ্ধ যুবা পুত্র উল্টো তার ফল
রমণীর ব্যাখ্যা শুনি হলেন চঞ্চল

রমণীরা বলে শুন ওহে মুনিবর
যুবক হলেও তাঁর নেই সংসার
জ্ঞানময় পুরুষ যুবক শুকদেব
ভেদাভেদ জ্ঞান নেই সব দেবদেব
সংস্কারমুক্ত তিনি মায়াময় ছিন্ন
আত্মজ্ঞানী পুরুষ তিনি ঈশ্বর অভিন্ন।

আরো আছে গল্প গাঁথা গল্প পরিচয়
যেরূপে হল এই ভাগবত নির্ণয় ।।

হস্তিনাপুরের রাজা শিব পরীক্ষিত
অর্জুন পৌত্র তিনি বিশাল পণ্ডিত ।
মাতৃগর্ভেই যিনি কৃষ্ণ দর্শন পান
তিনিই আবার ব্রহ্ম অভিশাপ পান
যেভাবে এ শাপ মুক্ত হন পরীক্ষিত
সে কথা বর্ণনা করি শুন সেই গীত

শিকারে ঘুরে ঘুরে সে তৃষ্ণার্ত যখন
শমীক মুনির আশ্রমে পৌঁছান তখন ।
সে জল প্রার্থনা করে মুনির নিকট
মুনি ছিল ধ্যানমগ্ন , হইল বিভ্রাট
ক্রোধে রাজা মরা সাপ দিলেন যখন
মুনির পুত্র শৃঙ্গী জ্বলে উঠল তখন
পিতার অপমান তার সহ্য না হয়
অভিশাপ দেন শিশু রাজারে তথায়
সপ্তমদিনেই রাজা হারাবেন প্রাণ
শুনো রাজা হবে তব সর্পদংশন।।

গর্জন শুনি মুনির ধ্যানভঙ্গ হয়
আহা আহা একি করো জানো কে নিশ্চয়!
মুনি কয় পুত্রে শাপ দিও না কো আর
কয় 'নিক্ষিপ্ত হলে শর ফিরে না আর'
ঋষিপুত্র বাক্য কি ব্যর্থ হয় কখনো ?
হাস্যচ্ছলে শিশু মিথ্যা বলেনি কখনো---
ব্রহ্ম শাপ মহাশাপ অন্যথা না হয়!

মাথা পেতে নেন রাজা সহজ আশ্রয়।।
রাজ্য তিনি তুলে দিলেন পুত্রের হাতে
পুত্র তাঁর জন্মেজয় জানে ধরণীতে।।

সংসার ছেড়ে রাজা গঙ্গাতীরে যান
হাজির হন সেথায় ঋষি ও ব্রাহ্মণ
নানা জনে নানা কথা বাক্যব্যয় করে
পরীক্ষিত রাজা পথের-সন্ধান করে
জীবনের শেষ মুহূর্তের পূর্ণ রূপ
কিভাবে সমাদৃত করেন অভিরূপ

যথাকালে উপস্থিত হন শুকদেব
পিঙ্গল জটাধারী মহাদেবাদিদেব
ষোড়শবর্ষীয় এক উলঙ্গ কিশোর
ঋষিদেরও শ্রদ্ধা হল তার উপর
শুকদেবেরে দেখি রাজাও আহ্লাদিত
হলেন উপস্থিত লোকহিত নিমিত্ত ---
রাজা ক'ন শুকদেবে-- উপায় কি তার ?
কৃষ্ণ চরণে মন নিঃশেষ হবার ?

এই প্রশ্ন একা কি বা রাজার সন্ধান
এই প্রশ্ন ধ্বনিত হয় আবহমান

সকলেই উদ্গ্রীব শোনার আকাঙ্ক্ষায়
স্থাবর জঙ্গম যেন ফিরে ফিরে চায়।।

ভাগবত রচনা করেন মহামুনি
সবার সামনে এল এই যে কাহিনী।।

ভাগবতপুরাণ বর্ণনা কাল যবে
কলিযুগের আরম্ভ সেই থেকে ভবে।
পবিত্র গঙ্গাতীর ভাদ্র মাসের কাল
শুক্লানবমী হতে পূর্ণিমা অনর্গল
শুকদেব বলে চলে ভাগবত কথা
কত শত ইতিহাস দর্শন বিজিতা
বয়ে চলে স্রোতধারা শুকদেব মুখে
পিতা হতে শুনেছেন যা গর্ভেতে সুখে।।

বিরাট সেই সভামাঝে অমৃতধারা
অবগাহন করেছেন উপস্থিত যারা।।

শ্রুতবাণী শ্রুতিধর ছিল একজন
উগ্রশ্রবা নাম পিতা সে রোমহর্ষণ
ব্রাহ্মণ পিতা তার ক্ষত্রিয় তার মাতা
  এ প্রচার দায়িত্ব দেন ভাগ্য বিধাতা।

এরপর দেখে শৌনকাদি ঋষিগণ
নৈমিষারণ্যে উগ্রশ্রবা সমাগত হন
সকলেই ধরে বসে শোনাও কাহিনি
মুনিপুত্র ভাগবত শোনান তখনি

এই রূপে দিকে দিকে অ মৃত প্রচার
ভাগবত পুরাণ হল সর্বজনসার ।।

পুনরায় গল্প কথা বলে পঞ্চমুখী
 পঞ্চেন্দ্রীয়ে পঞ্চানন শুনে হন সুখী।।

সীমান্ত জানে

শুদ্ধসত্ত্ব

সীমান্ত জানে কী ভয়ানক,
গোলা–বারুদের গন্ধ
এপারের ঘুড়ি যাবে না ওপারে–
কাটাতারে আবদ্ধ।
সীমান্ত জানে কী ভয়ানক,
স্তব্ধতার ভ্রুকুটি
ঝড়ের আগে উৎকণ্ঠা
অথবা শ্মশানের আকুতি।
সীমান্ত জানে কী ভয়ানক,
ওই নৈসর্গিক উপত্যকা,
ক্ষণিকের মোহে বেতাক হলেই
 ছুটে আসে গুলির ছররা।
সীমান্ত জানে কী ভয়ানক,
শৈশবের অকালমৃত্যু–
সহজপাঠ ছেড়ে কিশলয় হাতে
উঠে আসে বন্দুক আর কার্তুজ।

নাজিয়া আর আমি

সন্দীপ

ফসলের ক্ষেত ধরে
হেঁটে চলেছি আবহমান কাল।
হলুদ রোদ্দুর এসে ঘিরে ধরে আমার চারপাশ।
দূরে হাতছানি দেয় সোনালি নদীর চর।
আর শীতার্ত দুপুরের উষ্ণতায় ভিজে যায়
চৌখুপীর আল।।

মরে যাওয়া হেমন্তের
আকাশ জুড়ে অজস্র নক্ষত্রের জ্বলন।
জোনাকিরা এসে ঘিরে ধরে পাটের নাল।
নির্জনতা ভেঙে ভেসে আসে ভাটিয়ালী সুর।
আর মধ্যরাতের নিস্তব্ধতায় চলছে
কত সম্পর্কের উত্থানপতন।।

কয়েক মাইল দূর থেকে
ভেসে আসে ভোরের আজান।
পৃথিবীর গহীনে জেগে ওঠে মৃত আত্মারা।
ফেলে আসা স্মৃতির আকুল মিনতি।
আর শ্মশানের চিতার লেলিহান শিখায়
ওরা শুরু করে ওপারের জীবন।।

অগুন্তি বসন্ত পেরিয়ে
এসে যায় আরেকটা শীতের সকাল।
নাজিয়ার কপালে কাঁচপোকার টিপ।
রোদ্দুরে গলছে ওর ভালোবাসার প্রতিটা ক্ষণ।
আর সীমান্তের ওপারে অপেক্ষায় আমি
হাতে একগুচ্ছ গোলাপের লাল।।

কথা দিয়েছিলাম নাজিয়াকে
উপহার দেবো ইছামতীর রূপালী বালুচর।
দাঙ্গা বিধ্বস্ত কৈশোরকাল।
কত প্রজাপতি শুষেছে মাটির রস।
আর আমি একবার ফিরে পেতে চাই
নাজিয়া আর আমার সেই পুতুল খেলার ঘর।।

ছড়া

এবার দেখি

হাননান আহসান

ওই তো এলো কাশফুলেরা
ওই তো এলো পেঁজা তুলো
ওই এসেছে মনভোলানো---
শিউলি ফুলের গন্ধগুলো।

ওই তো এলো শিশির কণা
ওই তো এলো পাখপাখালি
ওই এসেছে স্নিগ্ধ কোমল---
জোছনা মাখা ঘাস-বিচালি।

ওই তো এলো আতশবাজি
ওই তো এলো ঢাকের কাঠি
ওই বেজেছে ছুটির বাঁশি---
ঘর ছেড়ে তাই বাইরে হাঁটি।

ওই তো এলো ছন্দ নিবিড়
ওই তো এলো ঋতুর রানি
ওই ফুটেছে পদ্ম শালুক---
ঢেউ ভেঙে খুব বৈইঠা টানি।

ওই তো এলো রোদপরিরা
ওই তো জমিন মাতোয়ারা
কিন্তু মাগো এবার দেখি---
খুশির ছবি মুছলো কারা !

মা দুগগার বাজেট

সুশীল মণ্ডল

আকাশ জুড়ে মেঘের ভেলা
ধরায় কাশফুল
মা আসছেন দোলনাতে, তাঁর
দুলছে কানের দুল।
শুঁড় উঁচিয়ে ছুটছে গণেশ
গড়িয়াহাটের দিকে
পুজোতে চাই কটন-জিনস্
প্যান্টালুনস হাঁকে।
কার্তিক ধায় আপ-টু-ডেট
সেলুনের পানে
চুলে চাই ধোনি-ছাঁট
কুমার শানু কানে।
সরস্বতী থমকে দাঁড়ায়
সামনে ঢাকেশ্বরী
পুজোতে তাঁর চাই যে গরদ
নইলে হবেন স্যরি।
লক্ষ্মী রানির হয়রানির
নেইকো কোনো শেষ
কোথায় আছে সেনকো ঘর
মানায় যাতে বেশ !
দুর্গা বলেন খোকাখুকু
আমার কথা শোন,
বাজেট আমার ফেল করাবি
হয়ে আপনজন ?

কেমন করে

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

কেমন করে আকাশ জুড়ে ভেসে বেড়ায় মেঘ
কেমন করে মেঘ গলে জল কিংবা বরফ হয়
কেমন করে বিজলি চমক জ্বালিয়ে মেঘে আলো
বজ্রাঘাতে কামান গোলা পাচ্ছে সবাই ভয়।

ছোট্ট আমি পড়ার ফাঁকে এসব ভাবি রোজ
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদীর ভুঁড়িভোজ।

কেমন করে মেঘগুলো সব যায় হারিয়ে যায়
কেমন করে মেঘের পাহাড় দূর আকাশের গায়
কেমন করে স্থির থাকে মেঘ কেমন করে নড়ে
কেমন করে সে মেঘ আবার পাহাড় হাতি গড়ে

জানলা দিয়ে এসব ভেবে তাকিয়ে থাকি রোজ
কে আর বলো আমার মনের নিচ্ছে এতো খোঁজ।

চাঁদ ছুটে না মেঘ ছুটেছে মেঘ ছুটে না চাঁদ
ভাবতে ভাবতে মায়ের ডাকে ভাঙলো খুশির বাঁধ
রান্না ঘরে খাবার রেডি আয় ছুটে সব ত্বরা
আজ দুপুরে খিচুড়ি আর আস্ত ডিমের বড়া।

মা আসছেন

সুবীর চট্টোপাধ্যায়

ঢেউ থৈ থৈ বিলের জলে দেখবি ছুটে আয়
দলবেঁধে সব শাপলা শালুক সুখের বাতাস খায় !
আয়রে খুকু শালিক চড়ুই সবুজ টিয়ার ঝাঁক
আয়রে দোয়েল কোয়েল সখি তালের সারির বাঁক।
পদ্ম শালুক হাওয়ায় নাচে মরালও দেয় ডাক।
নীল আকাশে ভাসছে যেন সাদা মেঘের ভেলা
চাষির বুকে ঢেউ তুলেছে সবুজ ধানের মেলা।
কাশের বনে কার যে নূপুর ঝম ঝম ঝম ঝম
খোকা হাসে খুকু হাসে পেট খিলিয়ে দম।
আকাশ জুড়ে নতুন রঙে মেঘলা ফুলের সুবাস
মা আসছেন তাইতো আজ সকল মনে সুহাস।

স্কুলের ছবি

সমর পাল

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নৌকা বানাই স্কুলে
মাঠটা জুড়ে জল থই থই নাচি পরাণ খুলে !
বাংলা ভূগোল দুই ক্লাসের আসেননিকো আন্টি
জলে ভিজে করলে খেলা মুলবে না কেউ কানটি !
বাংলা খাতার পৃষ্ঠা খুলে নৌকা বানাই তিনটি
ভূগোল খাতায় লিখে রাখি আজকে মজার দিনটি ।
আন্টিরা না আসলে স্কুলে হয় না তাদের দোষ
আর আমাদের বেলায় কিনা কান ধরে উঠবস !
এখন থেকে করোনাতে স্কুলে যাওয়া বন্ধ
অন লাইনে করলে পড়া বলবে না কেউ মন্দ !

উমা আসে

শান্তিব্রত চট্টোপাধ্যায়

মেঘ আর রোদ্দুরে চলে খুনসুঁটি
এই ঝরে বৃষ্টি তো আলো লুটোপুটি।
ফুরফুরে প্রজাপতি ফুলে সাবলীল
চাঁদোয়া টাঙিয়ে খুশি আকাশের নীল।
রাশি কাশ উঁকি মারে দূরের মাচাতে
ঢাকিরা কোমর বাঁধে যে যার খাঁচাতে।
শিশিরের ফোঁটা ছোঁয় শিউলির বাস
খড় মাটি রঙে মাতে পটুয়া আবাস।
বারে বারে উমা আসে এই অনুষঙ্গে
চেনা ও অচেনা সুরে চিরায়ত বঙ্গে।

প্রবন্ধ

প্রথম কবিতায় তাজ

গৌতম মুখোপাধ্যায়

সম্রাট শাজাহানের তাজমহল শুধু তাঁরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এই তাজ বিশ্বের সম্পদ। যুগ যুগ ধরে তাজ হয়ে উঠেছে প্রেমিকের সৌন্দর্যবিলাস, প্রেমের পরিতৃপ্তি। তাই কবির সৃষ্টির পথ তাজের বর্ণনায় সচল, প্রেমের স্বপ্ন মধুময়। তাই তাজকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে কবি লেখকরা গড়ে তুলেছে নানা বৈচিত্র্যময় মান সাধনা। কেউ দেখেছে প্রিয়া প্রেমের অনির্বাণ যোতি কেউ বা দেখেছে সম্রাট শাজাহানের ব্যক্তিগত শিল্প তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি ও আত্ম প্রীতির বিনম্র আত্ম রতি। তাজমহল নির্মাণের কারণ যে শাজাহানের প্রিয়ার প্রেম নয়, তাঁর ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস তা শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্নের কমল দুঃসাহসিক আবেগে প্রকাশ করে ছিল, এ একনিষ্ঠ প্রেমের দান নয়, বাদশার স্বকীয় আনন্দ লোকের অক্ষয় দান। সম্রাট শাজাহানের আনন্দ উপভোগের অপরূপ প্রকাশ যে তাজমহল তা শরৎ চন্দ্রের কমলের আগে শেষের কবিতায় অমিত বলেছিল বুদ্ধিদীপ্ত কণ্ঠস্বরে, তাজমহলে শাজাহানের শোক প্রকাশ পায়নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় তাজমহল মানুষের নয়নন্দন ও হৃদয়বন্দন। বলাকার কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল।

তাই তাজ সম্রাট শাজাহানের প্রেমিক হৃদয়ের আনন্দময় অস্বিত্বের ধনসম্পদ, নবমেঘদূত,

হে সম্রাট কবি
এই তব হৃদয়ের ছবি
এই তবে নব মেঘদূত

এই তাজমহলকে কবিরা প্রেমের প্রতীক রূপেও কল্পনা করেছেন,

তোমার সৌন্দর্য দূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া
ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া।

কবি সত্যেন একদিকে তাজের বাইরের রাজসিক রূপের উপাসক, অন্যদিকে তিনি আন্তরিক আবেগেও তাজের বর্ণনা করেছেন,

প্রেমের দেউল তুমি মরণবেলায়
শিরোমণি তুমি ধরণীর।

নজরুল ও তাজের কথায় আন্তরিক বাণী রচনা করেছেন,

তাজমহলের পাথর দেখেছ দেখেছ কি তার প্রাণ
অন্তরে তার মমতাজ নারী বাহিরেতে শাজাহান।

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী তাজমহল ভাবনায় স্মরণীয় ভাবুক, বরণীয় রূপকার। বাংলা কবিতায় তাজমহল বর্ণনায় তিনি মৌলিকতায় ভাস্বর। তাজ ভাবনায় কবি প্রমথ চৌধুরী একদিকে যেমন তাজের শিল্প সৌন্দর্যের মরমী পূজারি, অন্যদিকে, আবার ভারত সম্রাট শাজাহানের শীল সত্তার জয়গান করেছেন। তাজের বর্ণনায় প্রমথ চৌধুরী একজন আলোকচিত্রী নন, এক শিল্পী ও গভীর ভাবুকের পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে নাগরিক বিদগ্ধতার অভিজাতিক আলোও বিকিরিত হয়েছে তাঁর তাজভবনের স্বর্ণপ্রাঙ্গনে। প্রমথ চৌধুরীর চোখে তাজমহল সৌন্দর্যের অপরূপ শ্বেত সৌধ। তাজ তাঁর কথায়, মহাসকালের উপেক্ষার শিকার নয়, অক্ষুণ্ণ জরাহীন শরীর।

একদিকে কবি তাজমজলের বাইরের রূপ বর্ণায় ক্লান্তিহীন কথকের ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন, অন্যদিকে তিনি তাজের অন্তরলোকের আহবানও শুনতে পেয়েছেন।

নীলা পান্না, পোখরাজ অন্তর খচিত
তুমি হাস, কোথা আজ দারা সেকেন্দার
সকলি সদর তব, নাহিক অন্দর,
ব্যক্ত রূপ স্তরে স্তরে রয়েছে সঞ্চিত।

তাজের শরীরী রূপের বর্ণনায় কবি যেমন ক্লান্তিহীন কথক, অন্যদিকে তাজের নির্মাণের প্রকৃত কারণটি ও তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে স্বপ্রকাশ। কবি তাজমহলকে পত্নী বিরহের স্মৃতিমূর্তি রূপেই নয়, শাজাহানের অন্তরের শিল্পের প্রকাশ হিসাবেও দেখতে চেয়েছেন,

মমতাজ, তাজ নহে বেদনার মূর্তি।
শিল্পসৃষ্টি আনন্দের ও কুন্ঠিত স্ফূর্তি।

তাজমহল যে শুধুমাত্র বেদনার প্রেমস্মৃতি মর্মর সৌধ নয়, সম্রাট শাজাহানের অন্তরের শিল্পত্তার পরিতৃপ্তির স্বস্তির শ্বাস তা প্রমথ চৌধুরীর কথায় প্রকাশ। কবি তাজমহলকে নিষ্প্রাণ পাথর খণ্ড ভাবতে চান না। কারণ তাজমহল প্রেমের অপরূপ উদাহরণ। কবিতা জানেন, ধারণ করেন হৃদয়ের নিভৃত অলিন্দে। তাই কবি চেতনায় তাজ নির্জীব সত্তা নয়, সজীব মানব সত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। কবি লিখেছেন,

আঁখিতে সুর্মা রেখা, অধরে তাম্বুল,
হেনার রঞ্জিত তব নখাগ্র রাতুল,
জড়িতে জরিত বেণী, রুমালে তাম্বুল
বাদশার ছিলে তুমি খেলার পুতুল।

কবি একই সঙ্গে তাঁর প্রিয় মমতাজ ও তাজকে প্রাণের ঘরে বরণ করেছেন, প্রশংসার পুষ্পে অঞ্জলি অর্পণ করেছেন। এই প্রীতি প্রসন্ন আবেগের আলোকে কবির তাজভাবনা বাংলা কাব্যজগতে ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতায় উজ্জ্বল।

প্রবন্ধ

একটি ভাষা ও লিপির অপমৃত্যু সবার লজ্জা

দীপক কুমার সেন

বিবিধতায় ভরা আমাদের এই দেশ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের নানা ভাষা, নানা সংস্কৃতি ও নানান পরিধান নিয়েই এই দেশ আজও একসূত্রে বাঁধা। একথা যে একটি ভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে একটি সভ্যতা, একটি সমাজ ও সর্বোপরি একটি নিজস্ব সংস্কৃতি যা চিহ্নিত করে একটি জাতিকে। ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসারিত করে জাতির চিন্তা ও ভাবনাকে আর সৃষ্টি হয় পরম্পরা ও ঐতিহ্য যা পরবর্তীতে সেই জাতির দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। বলা যেতে পারে ভাষা হল মানুষের নিজেকে অনুধাবন করার একটি সোপান ও সমাজের ধারক এবং বাহক।

আমি যুগের পর যুগ ধরে বসবাস করছি এই ঝাড়খণ্ড রাজ্যে এবং এই প্রদেশের মাটির গন্ধ ও মোহময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার আমিকে দিয়েছে অনেককিছুই। এই মাটি থেকে যা পেয়েছি প্রতিদানে সেই মাটির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সহ কর্তব্য পালন করার প্রচেষ্টায় চিরকালই আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। বর্তমানের এই ঝাড়খণ্ড রাজ্যটির অতীতে পরিচয় ছিল গৌড়বঙ্গ নামে। বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যে এই মাটির গৌরবময় ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত রয়েছে। এই প্রদেশের মানুষের কাছে বাংলা ভাষাই ছিল তাঁদের মাতৃভাষা এবং কথায়, লেখায়, চিন্তা ও ভাবনার মূলে ছিল বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এই মাটির মানুষদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার এক বিশাল উদাহরণ রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। মানভূম আন্দোলনের কথা কারও অজানা নয়। এই অঞ্চলের মানুষ বাংলা ভাষার স্বপ্ন বুকে নিয়ে প্রতিবাদে নেমেছিলেন। তারপর সেই ঝড়ের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল কলকাতার রাজপথে। এই ঝড় থামাতে পুরুলিয়া অঞ্চলকে আলাদা করে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ও এক বিশালাকায় বাংলাভাষী অঞ্চলকে বিহার প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এরপর বেশ কয়েকটি যুগ পার হতেই আবার এক ভিন্ন আন্দোলন শুরু হয়। স্থানীয় জনজাতি আবার নতুনভাবে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে নিজস্ব আবেগ ও ভাষা – সংস্কৃতি নিয়ে। দিনের পর দিন ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে অবশেষে বিহার প্রদেশ খণ্ডিত হয়ে জন্ম নেয় ঝাড়খণ্ড রাজ্য।

ঝাড়খণ্ড প্রদেশের জন্ম হল কিন্তু এখানকার মূল অধিবাসীরা যাঁরা লিখতে, পড়তে, বলতে ভালোবাসতেন তাঁদের স্বপ্নপূরণ অধরাই থেকে গেল। আমি কখনোই একথা বলি না যে ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা শেখা উচিত নয়, অবশ্যই শেখা প্রয়োজন। সমাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার ক্ষেত্রে কিংবা বিশ্বায়নের যুগে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা শেখাটার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে তাই বলে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করে অন্য ভাষা শিখতে হবে এটা কখনোই কাম্য নয় কারণ একটি ভাষার সাহায্যেই তৈরি হয় একটি জনজাতির মূল ঐতিহ্য এবং পরম্পরাগত সংস্কার ও সংস্কৃতি। বর্তমানের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মূল ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিটাই গড়ে উঠেছিল বাংলা ভাষা ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে। ঝাড়খণ্ড প্রদেশের যুগের পর যুগ ধরে চলে আসা মূল উৎসব টুসু, করম ও ভাদু উৎসবের সবকটি গান বা লোকগীতি বাংলার আঞ্চলিক ভাষায়। এই আঞ্চলিক বাংলা ভাষার হরফ হল বাংলা লিপি। এখানকার লোককবিরা আজও বাংলা লিপিতেই কবিতা ও গান রচনা করে থাকেন। বিখ্যাত ঝুমুর গান ও রচনা হয় বাংলা লিপিতেই। যে গান ও গীতিনৃত্যের মাধ্যমে নিজেদের কথা সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেন লোককবিরা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই অঞ্চল জুড়ে ভাষা নিয়ে বহু উথালপাথাল হলেও অবিভক্ত বিহারের এই অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থা, সরকারি দস্তাবেজ, দলিলপত্র সব বাংলা ভাষাতেই লেখা হত। অধুনা ঝাড়খণ্ড তখন দক্ষিণ বিহার নামেই পরিচিত ছিল। এখানকার শাসন ব্যবস্থাও তখন বাংলা ভাষাতেই চলত। এই ব্যবস্থা ১৯৭০ সাল পর্যন্ত চলেছে এবং বিহার বিধানসভায় বাংলা ভাষাতেও সওয়াল জবাবের অধিকার ছিল। বিহার সরকার বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিয়েই চলত। বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলিকে সরকার সুচারুরূপে পরিচালনাও করেছে। বাংলা বইপত্রের জোগান, বাংলা শিক্ষক নিয়োগ এবং চাকরি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষায় পড়াশুনো করা ব্যক্তিদের কোনো অসুবিধা হয়নি। বলা হয় ঝাড়খণ্ড যখন বিহারে ছিল তখন বাংলা ভাষার অবস্থা অনেকটাই ভালো ছিল। দক্ষিণ বিহারের এই অংশটি ১৪ নভেম্বর ২০০০ সালে বিহার প্রদেশ থেকে আলাদা করে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হয় এবং তারপর দশ বছরের মধ্যেই বাংলা ভাষা কোণঠাসা হল এবং ধীরে ধীরে বহু স্কুলে বন্ধ হল বাংলা মিডিয়ামে পঠনপাঠন। যদিও আজ

বাংলা ভাষায় কথা বলা এই রাজ্যে বসবাসকারী মানুষদের সংখ্যা ৪২ শতাংশ। এই অঞ্চলের বিশাল জনজাতি সমস্ত রকম সামাজিক, ধর্মীয়, লৌকিক এবং পরলৌকিক কাজকর্ম বাংলা পঞ্জিকা মেনেই পালন করেন। এই অঞ্চলের অধিকাংশ বিধায়ক, সাংসদ, সাধারণ মানুষ থেকে উপর মহলের সকলেই বাংলা জানেন তবুও সবাই এক নীরবতা পালন করে চলেছেন। একথা কারও অজানা নয় যে ঝাড়খণ্ডের ঝুমুর, ভাদু, টুসু গান, মনসা মঙ্গল, বাউল, ছৌ নাচ, ষষ্ঠী গান ও ঝাপান গান জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জাতীয় সম্পদ। শুধুমাত্র বাংলা ভাষা ও লিপির অভাবে এই সম্পদগুলি হারিয়ে গেলে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের মূল উদ্দেশ্যই হারিয়ে যাবে সেকথা কর্ণধাররা কেন বুঝতে পারছেন না সেকথা বোঝা দায়। বিশ্বের যে কোনো একটি ভাষার ও লিপির অপমৃত্যু হলে সেটি সেই দেশের জন্য এক বিশাল ক্ষতি। কারণ একটি ভাষা বা লিপির মৃত্যু হলে একটি সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটে। ভাষাগত দিক থেকে আজ বিশ্বের মানচিত্রে পাপুয়া নিউ গিনি এবং ইন্দোনেশিয়া এই দুটি দেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পাপুয়া নিউ গিনি–তে আজও ১১০০ টি ভাষা প্রচলিত রয়েছে এবং ইন্দোনেশিয়া–য় প্রচলিত রয়েছে ৮২৩ টি ভাষা। এই দুটি দেশে নিজেদের রাষ্ট্রভাষা রয়েছে কিন্তু পাশাপাশি এই দুটি দেশের সরকার তাদের প্রান্তিক ভাষাগুলিকে প্রাঞ্জল করে রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী।

ভাষাগত ব্যাপারে ভারত এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে চিহ্নিত ছিল কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি রেকর্ড অনুযায়ী ভারত জুড়ে ১৬৫২ টি ভাষার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ১৯৭১ সালে এই সংখ্যাটি কমে দাঁড়ায় ৮০৮টি ভাষায়। পিপলস লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ২০১৩ সালের রিপোর্ট বলছে বিগত ৫ দশকে ভারতে ২২০ টি ভাষার অপমৃত্যু ঘটেছে ও ২৯৭টি ভাষা লুপ্ত হয়েছে। বিবিধতায় একতা ও বৈচিত্রে বিশ্বাসী কথাগুলো আজ মনে আঘাত করে যখন সরকারি পরিসংখ্যান ঘোষণা করে যে ভাষার সংখ্যা এদেশে আজ মাত্র ১২২টি। যদিও লিঙ্গুইস্টিক সার্ভের রেকর্ড অনুযায়ী দেশে ৭৮০ টি ভাষা প্রচলিত রয়েছে কিন্তু যেহেতু দশ হাজারের কম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেটির সরকারি স্বীকৃতি জোটে না তাই সরকারি তথ্য ও লিঙ্গুইস্টিক সার্ভের রেকর্ডের এই ফারাক পরিলক্ষিত হয়।

কোনো ভাষাকে বাঁচাতে হলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয় এবং এই প্রসঙ্গে উত্তর বিহারের মৈথিলি ভাষার উল্লেখ করাটা খুবই প্রয়োজনীয়। এই ভাষার বর্ণমালা ছিল এবং আজও এই ভাষায় কথা বলে প্রায় ৫ লাখেরও বেশি মানুষ কিন্তু সরকারি উদাসীনতার কারণে শুধুমাত্র মুখে মুখে এই ভাষাটি প্রচলিত রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে উত্তর ভারতের ভাষা ভোজপুরী, যে ভাষায় দশ লাখেরও বেশি মানুষ কথা বলেন, মহারাষ্ট্রের মোহালি ভাষা, গুজরাটের সিন্ধি ও সিকিমের মাঝি ভাষার বিপন্নতার কথা। তবু কোনোভাবে এই ভাষাগুলি বেঁচে রয়েছে কারণ সেইসব অঞ্চলের মানুষেরা নিজেদের ভাষাতেই কথা বলেন ও তাঁদের ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার এক অনন্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমার মতে প্রতিটি মানুষের রাষ্ট্রভাষা বা রাষ্ট্রের প্রধান যোগাযোগকারী ভাষা শেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাতৃভাষা শেখাটাও জরুরি এবং এই ব্যাপারে সরকারের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা জরুরি নইলে একের পর এক সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটতে থাকবে তা সবার ক্ষেত্রেই এক বিশাল লজ্জার। আশার আলো এই যে বিলুপ্তির মুখে থাকা অজস্র ভাষাগুলিকে বাঁচানোর জন্য নতুন করে ভাবছে জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে ৬ হাজারেরও বেশি ভাষা রয়েছে কিন্তু প্রতিবছর ২০টি করে ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে তিন হাজারের মত ভাষা বিপন্নপ্রায় এবং এক হাজার সাতশো পঞ্চাশটি ভাষা বিলুপ্তির মুখে। এমত অবস্থায় শতাব্দী শেষে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক ভাষা বিলুপ্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ইউনেস্কো। তাই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের বহুভাষা সংরক্ষণ বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ক্যাথেরিন পোলার্ড। তিনি একথাও বলেছেন যে বিলুপ্তির পথে ভাষাগুলির প্রচলন কিভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সে বিষয়ে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সংখ্যালঘু ভাষাভাষী মানুষের মানবাধিকার সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভের সম্ভাবনাও তৈরি হবে। সেই সঙ্গে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবে বহুভাষা। পোলার্ড একথাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে ভাষা নিয়ে আজ যত কথাবার্তা হচ্ছে তার নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে বাংলা ভাষার জন্য বহু মানুষের আত্মত্যাগ।

গল্প

কুমুদ কুইল্যা

বিকাশকলি পোল্যে

অবশেষে চাকরিটা হয়েই গেল। আহামরি কিছু নয়। ডাটা কালেকশনের কাজ। একটা এন.জি.ও.তাদের নতুন প্রজেক্ট লঞ্চ করেছে। সন্তানদের মধ্যে কারা মাকে বেশি ভালোবাসে আর কারা বাবাকে বেশি ভালোবাসে,ঘুরে ঘুরে এই তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কাজটা বেশ ভালোই হবে আশা করা যায়। কারণ আমি শহরের আনাচে কানাচে ঘুরতে ভালোবাসি। মেসে শুয়ে বসে গেঁজিয়ে গড়িয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম। চাকরির পরীক্ষা দিতে দিতে হতাশ হচ্ছিলাম। আমার আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে মন্ত্রী টন্ত্রী তো দূরের কথা,শুধু সরকারি চাকুরে নয়, বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরি করে এমন একজন কেউই নেই। সুতরাং চাকরি প্রার্থীর তালিকায় আমার স্থান একেবারে তলানিতে।

এক রোববার যাদবপুর এইট বি তে দেখা হয়ে গেল মানসদার সঙ্গে। আমি উদাসভাবে ফুটপাত ধরে হাঁটছিলাম। মানসদা ডেকে বললেন,'কি রে কুইল্যা, কেমন আছিস?'

উত্তরে আমি বললাম,ভালো। আপনি ভালো আছেন তো স্যার?

–আরে স্যার স্যার কি করছিস? বিরক্ত হয়ে বললেন মানসদা। তার বিরক্তি মাখা মুখটা দেখতে আমার বেশ ভালো লাগছে। আমি বললাম,না এমনি।

–কাজ টাজ কিছু জুটিয়েছিস?

–না,এখনো কিছু জোটাতে পারিনি।

–এরকম ল্যাদাপ্যাদা হলে কাজ জোটাবি কি করে। একটু এস্মার্ট হ বুইলি।

–আচ্ছা এস্মার্ট হব।

–কাজ করতে চাস?

–করতে তো চাই,কিন্তু পাব কোথায়?

–তোকে একটা ঠিকানা দিচ্ছি। এই কার্ডটা রাখ। সামনের বুধবার দুপুরের দিকে অফিসে গিয়ে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করবি। তোর কপালে কাজটা জুটে যেতে পারে। অবশ্যই দেখা করবি। মনে থাকবে?

–অবশ্যই থাকবে।

–থাকলে ভালো। তুই যা ক্যালাস। চলে গেলেন মানসদা।

মানসদা এক সময় আমাদের মেসেই থাকতেন। এখন রুলিং পার্টির বদান্যতায় সরকারি একটা চাকরি পেয়ে বিজয়গড়ের দিকে ফ্ল্যাট কিনে সংসার পেতেছেন। বউ বাচ্চা নিয়ে সুখের সংসার।

কার্ডটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। সুন্দর ডিজাইন করা একটা ভিজিটিং কার্ড। সোনালী অক্ষরে উপরে লেখা মিতা গুহ বসু রায়,সি.ই.ও। নামের নিচে লেখা আভা মিশন ফর সোশ্যাল হেল্‌থ অ্যান্ড এডুকেশন। তার নিচে লেখা ঠিকানা। ২৬,এন,নর্থ রোড,যাদবপুর,কলকাতা ৭০০০৩২। কার্ডের ডানদিকের উপরের কোণায় লেখা একটা ল্যান্ডফোনের নাম্বার আর একটা মোবাইল নম্বর।

ভদ্রমহিলা একাই তিন তিনটে ভালো টাইটেল নিয়ে বসে আছেন। একজন বিখ্যাত মানুষতো শুধু কতকগুলো ভালো ভালো টাইটেল জুড়ে নিজের নাম বানিয়েছেন। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। সব কটাই টাইটেল। এটা উচিত নয়। এই কারণেই বোধহয় অনেকের ভাগ্যে ভালো টাইটেল জোটে না।এই যেমন আমার। কুইল্যা। কুইল্যা কোন টাইটেল হল! এদিকটা সরকার বাহাদুরের নজর দেওয়া উচিত। একজনই যদি এত গুলো ভালো টাইটেল কুক্ষিগত করে রাখে তাহলে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র সাম্যব্যবস্থা এসবের কোন মানে হয় না।

আমাদের মেসে একজন বাঙাল আছে। আমাকে খ্যাপায়। বলে,এই যে কুইল্যা সাহেব যা করবা এক্কেরে মন খুইল্যা করবা। এটা কোন কাজের কথা হল! ব্যাটা নিজেকে নিয়ে বেশ গর্ব করে। আমাগো পরিবার রায়চৌধুরি পরিবার।হ্যারা ঢাকার জমিদার আছিল।বোঝো ঠ্যালা। জমিদার পরিবারের ছেলে গামছা পরে হাতে টিনের ডাব্বায় জল নিয়ে সকালবেলা টয়লেটের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে।

যাইহোক,বুধবার দুপুরে গেলাম ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি অফিসেই ছিলেন। অফিস মানে একটা পুরোনো বড় তিনতলা বাড়ির নীচ তলা।একটা টেবিল,দুটো চেয়ার,একটা সোফা এই হল অফিসের ফার্ণিচার। কলিং বেল টিপতেই ভদ্রমহিলা নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হল একটু আগেই তিনি খুব হাসছিলেন। তার ঠোঁটে এখনো টাটকা হাসির কুচি লেগে আছে। তাকে দেখে বিনীতভাবে বললাম,গুড আফটারনুন ম্যাডাম।

–এ্যাই,বাঙালির ছেলে বাংলায় কথা বলবে। ওসব গুড আফটারনুন ফাপটারনুন নয়,বল শুভ দ্বিপ্রহর। আর ওসব

ম্যাডাম ফ্যাডাম একদম বলবে না। বলবে দিদি। মিতা দি। বুঝেছ?

আমি বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বললাম,ও.কে.।

–এ কি! তুমি তো আবার ইংরেজি বলছ!

আমি কিছু না বলে জিভ কাটলাম।

–তোমাকে মানস পাঠিয়েছ তো?

–ইয়েস ম্যাডাম।

–আবার! চোখ পাকিয়ে ধমক দিলেন ভদ্রমহিলা।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম,সরি।

ভদ্রমহিলা বললেন,তুমি কি বাংলা একদমই জানো না?

–জানি তো। আমি তো বাঙালি।

–তবে ইংরেজি বলছ কেন?

–সরি টা দুঃখিত'র চেয়ে সোজা তাই।

ভদ্রমহিলা হেসে ফেললেন। বললেন,দুপুরে কিছু খাওয়া হয়েছে? ভাত খাবে?

ভদ্রমহিলার কথা শুনে আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি। চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। অন্ততঃ আমি তো তাই ভেবে এসেছি। পানিপথের যুদ্ধের সাল তারিখ,পলাশীর যুদ্ধের কারণ,সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল,সদ্য গঠিত মন্ত্রী পরিষদের কার কি দপ্তর সব মুখস্থ করে এসেছি জলের মতো। জিজ্ঞাসা করলেই কলে জল পড়ার মতো বলে যাব হুড়হুড় করে। কিন্তু ভদ্রমহিলার কথা শুনে তো আমি বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি। নাকি উনি আমাকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। কিছুই বুঝতে পারছি না।

–এই নাও একটু কোল্ড ড্রিংকস খাও। আরাম কর। তারপর কাজের কথায় আসছি। উনি আমার হাতে কোল্ড ড্রিংকস ভরা গ্লাস তুলে দিলেন। নিজেও নিলেন এক গ্লাস। চিয়ার্স বলব কিনা ভাবছি। গ্লাসে চুমুক দিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন,ওহ্,তোমার নামটা যেন কি? মানস বলেছিল বটে। আমি আবার সব ভুলে যাই।

আমি বললাম,আমার নাম কুমুদ কুইল্যা।

–বাহ্,সুন্দর নাম।

আমি খুব খুশি হলাম।তার থেকেও বিস্মিত হলাম বেশি। এই প্রথম কেউ আমার নাম শুনে সুন্দর বললেন এবং আমার টাইটেল নিয়ে কোন কৌতুহল প্রকাশ করলেন না। অনেকে আমার কুমুদ নাম শুনে গুমুত ভাবে। বলে,কি নাম বললে আবার বলো। উত্তরে আমি বলি কুমুদ। পরিস্কার করেই বলি।আমার উচ্চারণের কোন জড়তা নেই। তবুও লোকে শুনতে ভুল করে। অনেকে নামের অর্থ জানতে চায়। তাদের নামের অর্থ বলি। মনে মনে বলি হায় বাঙালি!

কলেজের প্রফেসরদের সব সংক্ষিপ্ত নাম।এই যেমন গৌতম মণ্ডল। সংক্ষেপে জি.এম.। আড়ালে গুড মর্নিং। তন্ময় চ্যাটার্জি। সংক্ষেপে টি.সি.। আবডালে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট। আমি যদি প্রফেসর হতাম তবে আমারটা কি হত! কে.কে. না কু.কু.। কে.কে.এর থেকে কু.কু.ই শুনতে ভালো লাগছে বোধহয়। যাইহোক,আমি প্রফেসর হয়নি। সুতরাং এ নিয়ে আমার মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই।

–তুমি কি কিছু ভাবছ?

ভদ্রমহিলার কথায় আমার সম্বিত ফিরল।বললাম, না, না কিছু ভাবছি না।

–আমার মনে হল তুমি কিছু ভাবছ। ভেবে বেশ মজা পাচ্ছ।যাইহোক,আমাদের একটা এন.জি.ও.আছে। নামটা কি তুমি জানো? জানো না?

–আজ্ঞে জানি।

–কি বলো তো?

–আভা মিশন ফর সোশ্যাল হেল্‌থ এন্ড এডুকেশন।

–সাবাস। আমাদের কাজ হচ্ছে গ্রামীণ এলাকায় মেয়েদের হাতের কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা। মাসে মাসে শহর থেকে ডাক্তার নিয়ে গিয়ে বিনামূল্যে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা। ওষুধ দেওয়া।অনাথ ও পথশিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ও স্বনির্ভর করা। এখন একটা নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছি।সেটার জন্যেই আমরা নতুন লোক খুঁজছি। সন্তানদের মধ্যে কারা বেশি মাকে ভালোবাসে আর কারা বেশি বাবাকে ভালোবাসে তার একটা পরিসংখ্যান তৈরি করা।আংশিক সময়ের কাজ।বেতন বলতে যা বোঝায় তা আমরা দিতে পারব না। বুঝতেই তো পারছ।তবে যাতায়াত ও হাতখরচা বাবদ কিছু টাকা আমরা তোমাকে অবশ্যই দেব।রাজি থাকলে বলো। কিছু টাকা আগাম দেব। কাল থেকেই কাজে লেগে পড়ো।

আমি বললাম,আজ থেকে নয় কেন?

–বাহ্,এটাই তো চাই।এমন উদ্যোমী ছেলেই তো আমাদের দরকার।

আমি মোটেও উদ্যোমী নই। অলসতা আমাকে স্থবির করে রাখে। তবুও কাজটা জুটে গেল।হাতে অগ্রিম কিছু টাকাও পাওয়া গেল। মিতাদিকে ধন্যবাদ জানানর ভাষা খুঁজে পেলাম না।

রাতে কিছুতেই ঘুম আসছে না। কাজটা কিভাবে শুরু করব ভেবে পাচ্ছি না। যদিও একটা ফর্ম্যাট আমাকে দেওয়া হয়েছে।

বাঁধাধরা কিছু প্রশ্ন। কাজটা যতটা সহজ ভেবেছিলাম এখন মনে হচ্ছে ততটা সহজ নয়।সন্তানরা বাবা মা দু'জনকেই ভালোবাসবে। কিন্তু কাকে বেশি ভালোবাসে এই প্রশ্ন তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করবে।এ যেন ঠিক ডিভাইড এন্ড রুল।কাজটা হাতে নেওয়া ঠিক হয়নি মনে হচ্ছে। রাত অনেক হয়েছে।রাকাকে এখন ফোন করলে কেমন হয় ! রাকা এখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়।

রাকার কথা মাথায় এল তার একটা কারণ আছে। রাকা একটা ঘটনার কথা আমাকে একদিন বলেছিল। ঘটনাটা তেমন কিছুই নয়।ঘড়ি হারিয়ে যাবার ঘটনা। যে ঘড়িটাতার বাবা তাকে পছন্দ করে কিনে দিয়েছিল। সেই ঘড়িটা একদিন কিভাবে যেন হারিয়ে গিয়েছিল। বাবা জানলে দুঃখ পাবে। তাই সে বাড়িতে কাউকে কিছুই জানায়নি। নিজের জমানো টাকা দিয়ে একই ঘড়ি সে আর একটা কিনে নিয়েছিল।রাকা বাবাকেই নিশ্চয় বেশি ভালোবাসে। তাই সে বাবাকে দুঃখ দিতে চায় নি।

–হ্যালো।

–হ্যাঁ,বলো।

–তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ?

–ঘুমিয়ে পড়লে ফোন ধরব কি করে?

–তা ও তো ঠিক।রাকা।

–বলো। এত রাতে ফোন করলে কেন?

–আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

–ভালো খবর। কিন্তু এতক্ষণে বুঝি সেটা জানানর সময় হল!

–রাতে ফোন করেছি বলে কি তুমি রাগ করছ?

–রাগ করব কেন? কি আশ্চর্য!

–আমার চাকরিটা অদ্ভুত না উদ্ভট নিজেই বুঝতে পারছি না।

–বুঝতে না পারলে ছেড়ে দাও।

–কিন্তু ভেরি ইন্টারেস্টিং জব।

–তুমি কি বলছ মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনা।

–কিছু বোঝার দরকার নেই। শুধু আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।

–কি?

–তুমি কাকে বেশি ভালোবাস।

–মানে?

–মানে বাবা কে না মা কে ?

মুঠোফোনের ওপারে একটা জোর ধাক্কা খেয়েছে রাকা। কোন উত্তর দিতে পারছে না। চুপ করে আছে সে। আমি বললাম,কি হল কিছু বলছ না যে?

–প্লীজ এত রাতে হেঁয়ালি করো না। কি বলতে চাও পরিস্কার করে বলো।

–রাকা,আমি একটা চাকরি পেয়েছি। একটা সার্ভের চাকরি। সন্তানরা তাদের বাবা না মা কাকে বেশি ভালোবাসে ঘুরে ঘুরে এই বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা।

–তা করো। আমাকে কেন ফোন করেছ?

–আমি ভেবেছিলাম তথ্য সংগ্রহের কাজটা তোমাকে দিয়ে শুরু করব।

–কেন,আমাকে দিয়ে কেন?

–তুমি আমার লাকি চার্ম।

–একদম বাজে কথা বলবে না। আমি মাকে বেশি ভালোবাসি।

–কিন্তু তুমি যে বলেছিলে বাবাকে খুব ভালোবাস।সেই কারণে ঘড়ি হারিয়ে ফেলে তুমি বাবাকে জানাও নি।বাবা ভীষণ কষ্ট পাবে এই জন্যে।

–তো?

–আমার মনে হয় বাবাকেই তুমি বেশি ভালোবাস।

–দেখো,তোমার সঙ্গে এত রাতে তর্ক করতে আমার মোটেও ভালো লাগছে না।বাবার শরীরটা ক'দিন থেকে ভালো যাচ্ছে না।পারকিনসনের প্রবলেমটা বেড়েছে বোধহয়।চোখেও একটু কম দেখছে।চোখের ডাক্তার দেখাতে হবে।আমার মন একটুও ভালো নেই।তুমি ফোনটা রাখ।

রাকা ইচ্ছে করলেই ফোনটা কেটে দিতে পারে।কিন্তু সে লাইনটা কাটছে না।আমারও ফোন রাখতে ইচ্ছে করছে না।রাকার কথা শুনতে আমার ভালো লাগছে।তার গলার স্বরটা অসাধারণ ।

আদরকে একটা ফোন করতে হবে। তার মতামত নেওয়াটাও একান্ত প্রয়োজন। সেই কোন ছোটবেলায় তার বাবা মারা গিয়েছেন। আজও বাবার স্মৃতি মেয়েটাকে কষ্ট দেয়।মা অনেক সংগ্রাম করে তাকে বড় করেছেন ঠিকই। তবুও আদরের কাছে বাবার একটা আলাদা কদর আছে। শোকের বোঝা ভীষণ ভারি হয়। মানুষ সে বোঝা বেশি দিন বহন করতে পারে না। কিন্তু আদর বাবার মৃত্যু শোকের বোঝা বয়ে বেড়ায় নিঃশব্দে। বাবার কথা ভেবে সুখের দিনেও তার গভীর অসুখ করে। গোপন ডায়রিতে বাবার জন্যে লিখে রাখে তার অ–সুখের কথা।

নিশুতি রাত। এত রাতে সাধারণতঃ নিশাচর প্রাণী ছাড়া কেউ জেগে থাকে না। আদর এখন নিশ্চয় জেগে নেই।জেগে থাকলেও তার মুড কেমন আছে কে জানে। তার মুডের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। মুড যাইহোক,আমার চোখে আদর

এক অনন্য সাধারণ রমণী। আমার এই নতুন চাকরিটাতে তার একটা ইন্টারভিউ নেওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য।

'এসো আলো,এসো হে, তোমায় সুস্বাগতম'।

আশা ভোঁসলের গাওয়া এই অসাধারণ গানটা আদরের মুঠোফোনের কলারটিউন। গানটা শুনলেই আমার মনে হয়, আশাজী নয় আদর নিজে গাইছে গানটা। সে নিজের জীবনে আলোকে আহ্বান জানাচ্ছে। সেই আলো মেখে সে নিজে শুধু আলোকিত হচ্ছে না। আলোময় করে তুলছে পারিপার্শ্বিক।সে নিজে হয়ে উঠছে রূপালী জোছনা। আদর নিশ্চিত ঘুমিয়ে পড়েছে। সে ফোন ধরছে না। আমি ফোনের লাল বোতাম টিপতে যাব এমন সময় 'বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ়' আসার মতো উত্তর এল, 'হ্যালো'।

–আদর।

–হ্যাঁ,বলো।

–ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা?

–হেঁয়ালি করো না।কি বলবে? বলো।

–এটা জয় গোস্বামীর কবিতার বইয়ের নাম।

–এটা বলার জন্যে এত রাত্রে ফোন করলে?

–না,আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

–চাকরি? তুমি? তুমি তো চাকরি পাওয়ার থেকে চাকরির পরীক্ষা দিতে বেশি ভালোবাস।

–হ্যাঁ। চাকরি পেয়েছি বলার জন্যে ফোন করিনি।

–তবে কিসের জন্যে ফোন করেছ?

–একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব।

–প্রশ্ন?

–হ্যাঁ।তুমি কাকে বেশি ভালোবাস?

–মানে!

–বাবা কে না মা কে?

ওপার থেকে উত্তর আসতে দেরি হচ্ছে।আদর একটা ধাক্কা খেয়েছে। ধাক্কা সামলে আদর বলল, চাকরির পরীক্ষা দিতে দিতে তোমার মাথাটা পুরোই খারাপ হয়ে গিয়েছে কুমুদ। তোমার ইমিডিয়েট একটা সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো উচিত। আমার একজন চেনাশোনা সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন।শ্রী অরবিন্দ সেবাকেন্দ্রে বসেন। অরবিন্দ সেবা কেন্দ্র জানো তো? ই.ই.ডি.এফ।আমি যোগাযোগ করে দিতে পারি।

–আদর,সত্যিই আমি চাকরি পেয়েছি।আমার কাজটাই হল ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করা।সন্তানদের মধ্যে কারা বাবাকে বেশি ভালোবাসে আর কারা মাকে বেশি ভালোবাসে।

–এই চাকরি তোমাকে কে দিয়েছে? তারও সাইকিয়াট্রিক কনসালটেশন দরকার।বাবা মা'র প্রতি সন্তানদের ভালোবাসা নিয়ে তোমারা ছেলেখেলা করতে পারো না। এইভাবে দু'জন মানুষের মধ্যে পরিবারে সমাজে বিভেদ তৈরি করতে পারো না। এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স।তোমাদের জেল হওয়া উচিত।

আদর ভীষণ রেগে গেছে। রেগে গেলে আদরকে মিষ্টি দেখতে লাগে। তখন তার চোখে মুখে রাগের সঙ্গে ভালোবাসা মাখানো থাকে। কিন্তু এত রাতে আদরের দেখা পাওয়া সম্ভব নয়।

ভাদ্র মাসের রোদ্দুর। গা পুড়ে যাচ্ছে। তবুও হাঁটছি। কলকাতা শহরের ফুটপাত দিয়ে হাঁটা যায় না। রাস্তার ধার ধরে হাঁটছি। সূর্যের তপ্ত আলোটাকে চাঁদের স্নিগ্ধ আলো ভেবে হাঁটছি। আমার মাইগ্রেনের সমস্যা আছে।রোদ্দুরে বেরলেই আমার মাথা ধরে। বমি বমি ভাব হয়। সূর্যের আলোটাকে চাঁদের আলো ভাবলে সেটা আর হয় না। আমি সূর্যের আলোটাকে এখন তাই চাঁদের আলো ভাবছি। ঝকমকে জোছনার ভিতর দিয়ে আমি হেঁটে চলেছি। যাব আভা মিশন ফর সোশ্যাল হেল্‌থ এন্ড এডুকেশনের অফিসে। মিতা দির কাছে।কাজের জন্যে নেওয়া আগাম টাকাটা তাকে ফেরত দিতে হবে।বাবা মা'র প্রতি সন্তানদের ভালোবাসাকে কখনো ভাগ করতে দেওয়া যাবে না।বাবা মা'র প্রতি সন্তানের থাকবে অপরিসীম শ্রদ্ধা। তেমনি সন্তানের প্রতি বাবা মা'র থাকবে অগাধ আস্থা। তবেই না গড়ে উঠবে একটা সুন্দর সমাজ। সেই সুন্দর সমাজের প্রতীক্ষাতেই তো আমরা বসে আছি তীর্থের কাকের মতো।

গল্প

বকবকানির বকমবকম

সংগ্রামী লাহিড়ী

উফ, পায়রা রেসে কি পরিশ্রম, কি পরিশ্রম! হাঁপিয়ে গেছি, জিরোই এট্টুসখানি।

আহা, সত্যি বড়ো কষ্ট, কম রাস্তা উড়ে আসতে হল?

তুই? এখানে? আমার কাছে?

কেন, আসতে নেই?

আসিসনি তো কোনোদিন! গুমোরেই তোর মাটিতে পা পড়ে না। হোমার পায়রা তুই, কুলীন। প্রতিবার পায়রা রেসের ফার্স্ট প্রাইজ তোর বাঁধা, তুই আমার মতো সাধারণ লক্কার সঙ্গে কথা বলবি? হুঁহ!

কী করি বল, রেস যে আমার মতো হোমারদের রক্তে। সেই কবে কোনকালে আমার পূর্বপুরুষদের ফোর্ট উইলিয়াম থেকে গোরা সৈন্যরা এসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ওরা বুঝতে পেরেছিল, আমরা আর পাঁচটা পায়রার মত নই। ডানায় জোর অনেক বেশি, বহুক্ষণ উড়তে পারি।

শুনেছি আমি, সেই হোমার পায়রা দিয়ে নাকি বিশ্বযুদ্ধের খবর দেওয়া নেওয়া হত।

জানিস দেখছি। যতটা মুখ্যু ভেবেছিলাম..

তুই যাবি এখান থেকে? আমি সাধারণ লক্কা, আমার সঙ্গে ভাব করার কী দরকার তোর? হেরেছিস তো আজ আমার কাছে পায়রা রেসে, লজ্জা করে না?

চটিস কেন, তোর সঙ্গে দুটো কথা বলতে বলতে ক্লান্ত ডানায় একটু হাওয়া লাগাই। আমার সঙ্গে তোর ভাব না থাক, আমার বাবা-মাকে তো তুই ভালোই চিনিস।

চিনবো না? তোর থেকে হাজারগুণে ভালো তারা। কত অভিজাত, কিন্তু একটুও দেমাক নেই। ওড়ার কত টেকনিক বলে দিয়েছে আমাকে। আর কাকিমা তো আমায় দেখলেই নিজের জমিয়ে রাখা দানা থেকে খেতে দিত।

জানিস তো, আমার বাবা আর মার মধ্যে মিশে আছে ইংলিশ, বেলজিয়ান আর জার্মান হোমারদের রক্ত। তাদের অমনিভাবেই তৈরী করা হয়েছিল। রেসের জন্যে লাগে সেরা জাতের হোমার পায়রা।

কাকু আর কাকিমার মধ্যে নাকি পায়রা রেসে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হত, গল্প করেছে আমায়।

দুজনেই যে সেরা, কে হারবে বল? সেই সুদূরে ছেড়ে দেওয়ার পর উড়তে উড়তে নিজের কোটরে ফেরার প্রতিযোগিতা। পিজিয়ন রেস। ওদের সঙ্গে কেউ পেরে উঠত না। তবে আমার মা নাকি পণ করেছিল, তাকে যে হারাতে পারবে, তার গলাতেই মালা দেবে।

তাই নাকি রে? কাকিমা ও পায়রা রেসে হেরেছিল? ভাবাই যায় না!

হ্যাঁ, একবারই মাত্র, বাবার কাছে। আর তাই তো... তা আমিও তো মায়েরই মেয়ে। তাই অনেকদিন আগে আমিও অমনি একখানি পণ করেছিলাম। মা ছাড়া আর কেউ জানে না অবিশ্যি।

তুইও পণ করেছিলি? সে কীরকম?

ওই তো শুনলি, রেসে আমায় যে হারাতে পারবে, তার গলাতেই মালা দেব।

অ্যাঁ?

অ্যাঁ নয় রে বুদ্ধু, হ্যাঁ। কতদিন ধরে তোকে নজর করছি আমি। ওড়ার কায়দাকানুন শিখতে আসিস মা-বাবার কাছে, প্র্যাক্টিস করিস দিনরাত। অপেক্ষায় ছিলাম কবে তুই আমায় হারিয়ে দিবি।

তুই..., মানে এই আমি? মানে, মানে...

থাম তো? তোতলানো আমার দু'চক্ষের বিষ। কনফিডেন্স নেই কেন তোর?

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না যে! তুই হলি অভিজাত হোমার পায়রা, অমন বাবা-মা-র মেয়ে, পায়রা রেসে বছর বছর ফার্স্ট, তোর ডানার জোরকে হারায় কার সাধ্যি? ঐজন্যেই তো উঠে পড়ে লেগেছিলাম, একবার অন্তত তোর মনোপলি ভাঙতেই হবে।

হয়েছে তো সে কাজ, হারিয়েছিস আমাকে, তাহলে আর ভয়টা কিসের? মা বলল আর দেরি না করে বিয়েটা করে নিতে। সামনেই ডিসেম্বরে ভালো দিন আছে। ওকি ওকি, অমনভাবে মুখ বন্ধ করে দিলে কথা বলব কী করে, দরকারী কথা আছে, নাঃ, এই ভূতটাকে নিয়ে আর পারা গেল না, সত্যি...

ভাসান বেলায়
রীনা ভৌমিক

সেই সকাল থেকে কাগজের নৌকা বানাচ্ছি । গোপন শব্দ বোঝাই নৌকা । তোমার উদ্দেশ্যে ভাসান দেব বলে । তুমি গলা উঁচু করে আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেছ আ–মৃত্যু । অথচ ভালোবাসা হয়ে উঠতে পারিনি । আমরা তাই বিপরীতমুখী ওয়েভে আন্দোলিত হয়ে স্বামী–স্ত্রী নামের ঘরকন্না করেছি । সেই খুচরো দুঃখের একটা হ্যান্ডব্যাগ মুখ এঁটে নৌকায় রাখলাম। দেখে নিও সমস্ত ঠিকঠাক আছে কিনা !

তুমি অন্য দেশে পাড়ি দিতেই ফুরিয়ে গেছে আমার অনেক কিছুই । সেখানে জেগে উঠেছে এক শেকড়হারা গর্ত । জীবন যাত্রার ক্রমে প্রতিনিয়ত হোঁচট খাই সেই ব্ল্যাকহোলে । যেখানে বেহালা কান্নার মতো ইনিয়ে বিনিয়ে মূর্ছনা জাগায় । আমি দুহাতে বুক চেপে সারারাত হৃদয়াবেগ আগলাই । আরো নির্জন হয়ে যাই ।

আজ তোমাকে গৃহবন্দি রাখতে আমাকে কী কাঠখড়ই না পোড়াতে হত। বহির্মুখী দাপুটে তুমি খাঁচায় থাকতে না চেয়ে কোন্দল বাধাতে । ছাদে যে দু চারটা অবলা জীব বকম ধরেছে কিংবা নিমগাছটায় বসা পিউ কাঁহা–র কলতান , ডানা ফরফরিয়ে উড়ে যেত দূরে । সন্তান অসুরক্ষা বোধে আরও অন্তর্মুখী হয়ে খিল দিত নিজস্ব কোণে । আমাকে শক্ত অভিভাবকের ভূমিকায় অনড় থাকতে হত চাবির গুচ্ছ আঁকড়ে !

এক শূন্যতা বোধে ছাদে দাঁড়াই ভরদুপুরের প্রবল রোদে। অন্যটাও তো হতে পারত, ভাবি। হয়তো এই লকড়াউনের সময়টুকুতে তোমায় ঢেলে গড়ে নিতে পারতাম নিজের মতো করে । বন্ধুত্বে অলৌকিক প্রেমের ছোঁয়া লাগত !

আজ সারাদিন মন উন্মাদ । তুমি নেই । আমার সমস্ত বাড়তি কাজ আর বুভুক্ষু স্বপ্নে লকডাউন এঁকে তুমি চলে গেছ । দু'চোখ লাগাতার নদীকে ডাকছে জোয়ার ভাঁটার প্রাকৃতিক নিয়ম উলঙ্ঘন করে ... তোমার নামের নৌকা ভাসাতে হবে যে...

পুজো আমার কাছে ধূসর অতীত
শঙ্কর ঘোষ, অভিনেতা

আমার বাড়ির লাগোয়া একটা বড় পুজো হয়। শ্রীভূমির পুজো। এবার থিম 'দুবাইয়ের পুছখালিফা'। অভিনব ভাবনা। কলকাতার বসে দর্শকরা দুবাইয়ে বেড়ানোর অনুভূতি পাবেন। পুজোর এত ভিড় ভালোলাগে না বলে প্রতি বছর বিদেশে বেড়াতে যাই। এবার যাচ্ছি ঘরের কাছে শান্তিনিকেতন। ৭ দিন কাটাবো রবি ঠাকুরের দেশে। ঘুরে দেখব কবির স্মৃতি বিজড়িত সব জায়গা।

তবে পুজো মানে আমার কাছে ধূসর অতীত। এক সময়ে আমাদের কাছে পুজো মানে ছিল নতুন জামা-জুতোর পাশাপাশি নতুন গান। বাবা বড় রেকর্ড কিনে আনতেন ও আমরা প্রাণ ভরে শুনতাম হেমন্ত-শ্যামল-সন্ধ্যার সেই মন মাতানো গান। এ ছাড়াও আর একটা আকর্ষণ ছিল পুজো সংখ্যা। ওই সময় সিনেমার পত্রিকা 'উল্টোরথ' রমরম করে চলত। উত্তম-সুচিত্রার খবর পড়তাম। পরে ওই পত্রিকায় আমার সম্পর্কেও লেখা ও ছবি বেরোয়। আমাদের সময়ে পুজোয় নতুন নতুন ছবি বেরোত। সেসব দেখতাম। এখন শহরের বড় বড় সব হল বন্ধ হয়ে গেছে। দুর্গা পুজো আমার কাছে নিছক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, সর্বজনীন উসব। ধনী-দরিদ্রের মিলনোসব।

একটি খুনের গল্প

দেবাশিস দেব

তাপস আমার থেকে পনের বছরের ছোটো। আমি যেবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিলাম সেবারই তাপসের জন্ম। আমার তখন মনে হয়েছিল তাপস বড়ো দেরি করে এই পৃথিবীতে এল। আরও একটু আগে এলে পুরো ছোটবেলাটা আমাকে একা একা কাটাতে হত না। আমার বন্ধুদের সবারই ভাই বা বোন ছিল, শুধু আমারই ছিল না। তখন মনে হত আমার একটা ছোটো ভাই থাকলে কি ভাল হত! সব খেলাতেই দুজন লাগে। ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, টিটি, এমনকী ক্যারম! মাকে অনেকবার বলেছি, মা একটা ভাই নিয়ে এসো না। মা তখন হেসে বলেছেন, ভগবান আমাদের জন্য একজনই সন্তান মঞ্জুর করেছে। মায়ের কথার রাগ হয়েছিল। মা বলেছিলেন, সন্তান ভগবানের দান। তখন ভগবানকে আমার পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে হয়েছিল। মাকে এই কথা বলাতে মা আমাকে বকাবকি করেছিলেন । যাই হোক, আমি একা একাই বড়ো হলাম। যেবার আমি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেব, সেবার তাপস মায়ের পেটে এল। ততদিনে আমি জেনে গেছি সন্তান ভগবানের দান নয়। মাতৃত্বের সব লক্ষণগুলো ফুটে উঠতেই মা কেমন যেন অপরাধী মুখ করে থাকতেন। পারতপক্ষে আমার সামনে আসতেন না। বাবাও তথৈবচ। বুঝেছিলাম, এটা একটা দুর্ঘটনা, অথবা, যদি মায়ের কথা সত্যি হয়, তাহলে ওপরে বসে থাকা পক্ষপাতদুষ্ট ভগবানটির আজব খেয়াল!

জন্মের পরদিন নার্সিংহোমে যখন ভাইকে দেখতে গেলাম তখন আমাদের কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হল না। বলা হল, ভীষণ কম ওজন, শ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছে তাই ওকে 'নিকু'তে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞেস করাতে নার্স বললেন 'নিকু' মানে নিওনেটাল আইসিইউ। প্রায় পনেরদিন 'নিকু'তে থাকার পর ভাই বাড়ি এল। প্রথমদিন যখন ভাইকে দেখলাম মনে হল ছাল ওঠা একটা বাঁদরের বাচ্চা। বাঁদরের মত বড়ো বড়ো কান, সরু সরু হাত পা। শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে কি নিচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে না। মা সবসময় ওকে কাঁথা কাপড়ে মুড়ে রাখতেন। একটু বড়ো হতে বুঝলাম ও আর পাঁচটা বাচ্চার মত নয়। ওর চট করে ঠাণ্ডা লেগে যায়। কথা বলতে ওর অনেক সময় লাগল। পরে জানলাম, তাপস একটি প্রতিবন্ধী শিশু, ডাক্তারি ভাষায় বলে ডাউন সিন্ড্রোম। ভ্রূণ অবস্থায় ওর একুশ নম্বর ক্রোমোজোমের সংখ্যা দুইয়ের বদলে তিন হয়ে গিয়েছিল এবং তার জন্যই এই বিপত্তি। মা পরে বলেছিলেন, সবই ভগবানের ইচ্ছে। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। ভগবান এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না! এটা নেহাৎই একটি ক্রোমোজোমের খেয়ালখুশি।

আমি স্কুল ছেড়ে কলেজ গেলাম, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরি পেলাম। তাপস তখন বছর দশেকের। আমার ছোটো বয়েসের কাঠের এবিসিডি, খেলনা আর ট্রাইসাইকেল নিয়েই ওর জগৎ। আধো আধো গলায় কথা বলত। খুব শান্ত, কদাচিৎ ওর কান্না শোনা যেত। বাবা যখন রিটায়ার করলেন তখন তাপসের বয়েস ষোল সতেরো। এক বছরের বাচ্চার মত থপথপ করে হাঁটে। খুব নিরীহ স্বভাবের। মাঝে মাঝে আমার ঘরে এসে উঁকি মারত। জিজ্ঞেস করত, দাদা কী করছিস? আমি হয়তো ল্যাপটপে অফিসের কোন কাজ করছি। মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে উত্তর না দিলে খুব অভিমান হত ওর। ঘুরে চলে যেত মায়ের ঘরে। একদিন মা আমাকে ডেকে বলেছিলেন, দেখ তপন, তোকে একটা কথা বলছি, তুই রাগ করিস না।

কী? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

তাপস একটু বোকা ঠিকই কিন্তু অত বোকাও নয়।

মানে?

ও ঠিক বুঝতে পারে ওকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কি না! ও যদি তোর কাজের সময় গিয়ে কিছু বলে দুটো মিনিট ওর জন্য দিবি। ওতেই ও খুশি হয়। ও বোঝে এই বাড়িতে অবাঞ্ছিত নয়।

আমার প্রথম রাগ উঠেছিল, কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখেছি মা ঠিকই বলেছেন। দু মিনিটে কী আসে যায়?

একটা প্রমোশন পাওয়ার পর বাবা আমার বিয়ে ঠিক করলেন। ধুমধাম করে আমার বিয়ে হল, মিত্রা আমাদের বাড়িতে এল। মিত্রা রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে কাজ করে। সকালে বেরিয়ে যায়, বিকেলে ফেরে। বাড়ির সবার সাঙ্গেই কথাবার্তা বলে, কিন্তু তাপসের সাথে কী কথা বলবে ও বুঝে পায় না। তাপস দেখতে পূর্ণবয়স্ক যুবক অথচ মানসিক বিকাশ ক্লাস থ্রি ফোরের। আমি মিত্রাকে বলেছিলাম, ধরে নাও তাপস দশ বছরের একটা শিশু। ওর পৃথিবীটা দশ বছরের একটা শিশুর মতই সহজ ও সরল। একটা দশ বছরের শিশুর সাথে যা কথা বলা যায় তাই

বলবে।

আমার খুব ভাল লাগত যখন দেখতাম মিত্রা অফিস থেকে ফিরে ব্যাগ থেকে একটা ক্যাডবেরি ফ্রুট অ্যানড নাট বের করে তাপসকে দিচ্ছে। কোনদিন হয়ত বা একটা খেলনা গাড়ি অথবা ছবি আঁকা কার্টুনের বই। তাপস ছুটে এসে আমাকে দেখাত, এই দেখ বৌদি দিয়েছে! আমি জিজ্ঞেস করতাম, তুমি 'থ্যাংক ইউ' জানিয়েছ? তাপস জিভ কেটে দৌড়ে গিয়ে মিত্রাকে 'থ্যাংক ইউ' বলে আসত।

এভাবেই চলছিল, হঠাৎ মা একদিন স্ট্রোকে মারা গেলেন। মা সারাজীবন গৃহবধূ ছিলেন, এবং কী এক আশ্চর্য অদৃশ্য ক্ষমতায় সংসারটাকে ধরে রেখেছিলেন সেটা আমরা বুঝতে পারিনি। আমরা সবাই যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত, কোনদিন ভেবে দেখিনি সংসারের চাকাটি কী করে মসৃণভাবে এত বছর চলে এসেছে। মা চলে যাওয়ার পর আমরা সবাই মায়ের অভাবটা বুঝতে পারলাম। মিত্রাকে বাড়ির জন্য একটু সময় বাড়াতে হল, দুটো কাজের লোক রাখা হল। একজন রান্নাবান্না, আরেকজন অন্যান্য কাজ ও তাপসকে দেখে রাখা। বাবা হঠাৎ কেমন যেন চুপ হয়ে গেলেন, কিন্তু সবচাইতে বেশি পরিবর্তন হল তাপসের। পঁচিশ বছর বয়স হয়ে গেলেও তাপস মায়ের বিছানায় ঘুমোত। আসলে মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে পেচ্ছাপ করে ফেলত বলে মা ওকে আলাদা করে দেননি। মাঝরাতে উঠে কাঁথা পাল্টানোর কাজটাও মাকেই করতে হত। কিন্তু মা চলে যাওয়ার পর আশ্চর্যভাবে তাপস নিজেই কাঁথা পাল্টে নিত। ওর নিরীহ মুখটাতে আমি অজানা ভয়ের ছায়া দেখতে পেতাম। আমার মনে হত ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ঘর থেকে বেরুতে চাইত না। মাঝে মাঝে বাবার ঘরে গিয়ে বাবার পাশে মোড়া নিয়ে বসে থাকত। বাবা কানে কম শুনছিলেন আজকাল, তাপসের নিচু গলার কথা আদৌ শুনতে পেতেন কি না কে জানে! আমার মাঝে নিজেকে অপরাধী মনে হত। মনে হত বেচারা তাপস একটা ক্রোমোজোমের খেয়ালে সারাটা জীবন শিশু হয়েই রইল, এই সুন্দর পৃথিবীর কিছুই ভোগ করতে পারল না। অথচ আমি কত প্রিভিলেজড, ভাগ্যবান!

গতবছর পৃথিবীতে নেমে আসা বিপর্যয়ের পর থেকে আমরা সবাই বাড়িতে বন্দি হয়ে আছি। দিনে লকডাউন, রাতে কারফিউ, দোকানপাট, মল, বাস, ট্রেন সব বন্ধ। শুধু মৃত্যুর খবর আসছে, কিছু অচেনা, কিছু চেনা। ডাক্তাররা মারা যাচ্ছেন। এই সেদিন শঙ্খ ঘোষ মারা গেলেন, এক সপ্তাহ বাদে ওঁনার স্ত্রী। বাবা ষাটোর্দ্ধ বলে ভ্যাক্সিন পেয়ে গেছেন। আমরা কেউ এখনও পাইনি। সপ্তাহে একদিন নাকমুখ ঢেকে বাজার যাই, বাকি সব অনলাইনে আসে। বাইরে গেলে এসেই কাপড়চোপড় ছেড়ে চান করি, ঘরে ঘরে স্যানিটাইজারের বোতল রাখা, তবু এরই মধ্যে কি করে যেন তাপসের করোনা হয়ে গেল। আমাদেরও একদিন একটু গা ম্যাজম্যাজ করছিল, কিন্তু আর তেমন কিছু হয়নি। কিন্তু তাপসের জ্বর এল। সঙ্গে কাশি। ডাঃ প্রামাণিককে ফোন করাতে উনি বললেন, করোনা টেস্ট করাতে হবে। রিপোর্ট পজিটিভ এল। পরের দিন তাপসের শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়াতে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হল। পরেরদিন ডাক্তার বললেন, তাপসকে ভেন্টিলেটারে দিতে হবে। দিনে দশহাজার টাকা শুধু এর জন্যই লাগবে। সঙ্গে আইসিইউর খরচ, এবং আনুষঙ্গিক ওষুধের খরচ। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি করব?

বাবা কিছু বললেন না। চোখ নামিয়ে নিলেন। ওই নিস্তেজ মূক দৃষ্টির ভাষা আমি পড়তে পারছিলাম। আমার ফ্যামিলি মেডিক্লেমে তাপসের নাম ছিল। দশ লাখ অবধি চেষ্টা তো আমি করতেই পারি, তবে একটাই ভয়, যদি সবটাই খরচ হয়ে যায় তাহলে আমাদের আর কারোর জন্য কোন মেডিক্লেমের কভার থাকবে না। মিত্রাকে জিজ্ঞেস করলাম। মিত্রা বলল, দেখা যাক না! দশ লাখ লাগবেই বলে আগে থেকে কেন ভেবে নিচ্ছ? তাপস সাতদিন ভেন্টিলেটারে রইল। অষ্টম দিনে ডাক্তারবাবু বললেন, বিল বেড়ে যাচ্ছে, এবার আপনারা একটু ভাবনাচিন্তা করুন। খবর নিয়ে দেখলাম বিল প্রায় ন'লাখ হয়ে গেছে। পরদিন বাবাকে নিয়ে হাসপাতালে গেলাম। ডাক্তারবাবু আমাদের বুঝিয়ে বললেন, তাপসের কিডনি খারাপ হওয়া শুরু হয়েছে, পেচ্ছাপ কমে যাচ্ছে। এরপর হয়ত ডায়ালাইসিস করতে হতে পারে। খরচ আরও বেড়ে যাবে। আমি বাবার মুখের দিকে তাকালাম। বাবা বললেন, না যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। আর নয়। ডাক্তারবাবু বললেন, তাহলে ফর্মে সই করে দিন, আমরা সাপোর্ট কমিয়ে দেব।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সাপোর্ট কমালে কি তাপস মরে যাবে? ডাক্তারবাবু বললেন, রোগী এই মুহূর্তে নিজে শ্বাস নিতে পারছে না, যন্ত্রে চলছে। ব্লাডপ্রেশার ওষুধ দিয়ে তুলে রাখা আছে। সাপোর্ট কমিয়ে দিলে কি হবে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই! বাবার চোখ জলে ভরে উঠল, রুমাল দিয়ে বাবা চোখ মুছলেন। আমার মনে হল সাপোর্ট তুলে দেওয়া খুনের নামান্তর।

এরকম করা যায়? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আইনত করা যায় না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছামৃত্যু এখনও স্বীকৃত নয়।

তাহলে কি করে করবেন আপনি?

দেখুন, ডাক্তারবাবু চশমা খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন তারপর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে চোখদুটো রগড়িয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমাদের অনেক কিছু ভাবতে হয়। ধরুন এইভাবে যদি চলতে থাকে, আরও সাত দশ দিন কেটে যায় তাহলে বিল কোথায় পৌছবে বুঝতে পারছেন? আজ অবধি সাড়ে ন'লাখ হয়ে গেছে। সাতদিন বাদে আঠার লাখে পৌঁছে যাবে। সঙ্গে আবার এখন ডায়ালিসিস লাগবে। তাই এইরকম অবস্থায় আমরা ধীরে ধীরে উইথড্র করি। হেভি সিডেশনে রাখি যাতে রোগীর কোন কষ্ট না হয়। এতে সবারই সুবিধা।

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কাঁচদিয়ে ঘেরা দেওয়া ঘরে তাপস শুয়ে আছে। চারদিকে নানাধরনের যন্ত্রপাতি, লাল নীল আলো বিপ বিপ করছে। কম্বল দিয়ে তাপসের সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখা। মুখে কৃত্তিম শ্বাসের পাইপ। দূর থেকে ওর মুখের অভিব্যক্তি বোঝা যাচ্ছে না। সাপোর্ট তুলে দিলে তাপস কি ছটফট করবে? ওর নিশ্চয়ই কষ্ট হবে খুব। ওকি জানতে পারবে ওর দাদা টাকার জন্য ওর চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে চাইছে?

বাবা উঠে পড়লেন। আমার সামনে ফাইল। সই করার জায়গায় ডাক্তারবাবু টিক মেরে দিয়েছেন। আমি চোখ ফেরাতে বললেন, দুটো সই করুন। আমি বুক পকেট থেকে কলম বের করলাম। সই করার আগ মুহূর্তে আরেকবার বাবার দিকে তাকালাম। কিন্তু বাবা ততক্ষণে গেটের বাইরে চলে গেছেন।

পুজোর খানা

পুজো মানেই ফাটিয়ে খাওয়া-দাওয়া। এই ক'টা দিন কোনো বাছবিচার চলে না। থাকে না কোনো নিয়মের তোয়াক্কা। তাই নিত্যনতুন রেসিপি তৈরি করে চুটিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে খাওয়ার আনন্দ ভাগ করে নিন।

মুর্গ মখমলি

উপকরণ :

মুরগির মাংস ১ কেজি, মাখন ২ টেবিল চামচ, দই ১কাপ (ছোটো কাপ), ২ টো বড় মাপের পেঁয়াজ সরু করে কোঁচানো, ২-৩ টে কাঁচা লঙ্কা দু'ভাগ করা, ১ টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ গরম মসলা, ২ টেবিল চামচ গোলমরিচ, দেড় টেবিল চামচ জিরা গুঁড়ো, দেড় টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা, কাসুরি মেথি, ধনেপাতা কুচি, ১ প্যাকেট ফ্রেশ ক্রিম (যে কোনো বড়ো স্টেশনারি দোকানে পাওয়া যাবে।

প্রণালী:

স্টেপ ১ : - কড়াইতে মাখন দিয়ে গরম হলে পেঁয়াজ কুচি দিন। তার মধ্যেই কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন। হালকা ভাজা হলে (বাদামি রঙ হবে না) আদা-রসুন বাটা দিয়ে মসলাটা কষতে থাকুন। মশলার কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে মাংসটা দিয়ে দিন। মাংস অল্প ক্ষণ নাড়াচাড়া করে তার মধ্যে ঢেলে দিন দই। এবার পুরো জিনিসটা মিনিট নেড়ে কড়াইতে ঢাকা দিয়ে কম আঁচে মাংস সিদ্ধ হতে দিন। নুন ছড়িয়ে দিন তার আগে।

স্টেপ ২ : - কড়াইয়ের ঢাকনা খুলে এবার মাংসের মধ্যে গরম মসলা, জিরা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করে ছোট ১ বাটি জল ঢেলে ফের কড়াই ঢাকা দিন। এবারও কম আঁচে ১৫ মিনিট রান্না করুন।

স্টেপ ৩ : - ১৫ মিনিট পর ঢাকা খুলে আন্দাজ মতো অনেকটা ফ্রেশ ক্রিম ঢেলে দিন। এর মধ্যেই কিছুটা কাসুরি মেথি আর ধনেপাতা দিয়ে ফের নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে দিন। মিনিট ৭- ৮ পর ঢাকা খুলে নুন হয়েছে কিনা তা চেখে দেখে গ্যাস বন্ধ করে দেবেন। যদি দেখেন মাংসের জুসটা বেশি আছে তাহলে সেটা আর একটু টানিয়ে নিতে পারেন। নামানোর পর উপরে ছড়িয়ে দিন কুঁচোনো ধনেপাতা। এবার গরমগরম ভাত, রুটি, নানের সঙ্গে পরিবেশন করুন মুর্গ মখমলি।

অনলাইনে ব্যবসা

মধুমিতা দাস

একটা লোকের সঙ্গে আর একটা লোকের যে সম্পর্ক আগে গিয়ে কথা বলে হত এখন সময়টাকে বাঁচানোর জন্য আমরা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করি। সেখানে মোবাইল সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংগুলো আমাদের খুব সাহায্য করে। সামাজিক উপকারিতার কথা ভেবে আমরা এই জিনিসটাকে কাজে লাগাচ্ছি। অনলাইন ব্যবসা ঠিক সেই রকম একটা জিনিস। যেখানে সময়টাকে বাঁচানো যায় দূর পর্যন্ত আমাদের প্রসারতাকে বাড়ানো যায়।

এবার তবে অনলাইন ব্যবসা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

অনলাইন ব্যবসা কী ঃ–

অনলাইন ব্যবসা বা ই–ব্যবসা হল যে কোন ধরনের ব্যবসা বা বাণিজ্যিক লেনদেন যাতে ইন্টারনেট জুড়ে তথ্য আদান–প্রদান অন্তর্ভুক্ত।

বাণিজ্যব্যবসা, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবার বিনিময় করে এবং যে কোনো ব্যবসার অপরিহার্য ক্রিয়াকলাপ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

একটি অনলাইন ব্যবসা চালানোর মধ্যে অনলাইনে কেনা বেচা বা অনলাইন পরিষেবা প্রদান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। যে কেউ অনলাইন ব্যবসা শুরু করতে পারেন।

এটি কীভাবে কাজ করে ঃ–

প্রবণতা অব্যাহত রাখতে এবং আপনার খুচরা ব্যবসা নির্বিঘ্নে চালাতে আপনাকে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে। একটি ই–কমার্স ওয়েবসাইট অ্যাপ বা উভয়ই তৈরি করুন এবং প্ল্যাটফর্মে আপনার পণ্য তালিকাভুক্ত করুন। গ্রাহকরা তাদের অর্ডার দিতে পারেন এবং ডেলিভারি বয় গ্রাহকের দোরগোড়ায় পণ্য পৌঁছে দেবে।

অনলাইন ব্যবসা কখন শুরু হয় ঃ–

ভারতে ইন্টারনেট প্রবর্তনের মাধ্যমে ১৯৯৫ সালের প্রথম দিকে অনলাইন কেনাকাটা শুরু হয়েছিল। অনলাইনে কেনাকাটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ১–২–২০০০ সালে ইন্টারনেটে বিক্রির সময় ভালভাবে পরিচিত নিলাম সাইট bazee.com নামে পরিচিত শব্দটি প্রথম ২০০৪ সালে তৈরি করা হয়েছিল ক্রিস অ্যান্ডারসন দ্বারা।২০১৭ সালে, ভারতের সবচেয়ে বড় ই–কমার্স কোম্পানি ছিল ফ্লিপকার্ট, স্ন্যাপডিল এবং অ্যামাজন। ২০১৮ সালে, অ্যামাজন ফ্লিপকার্টকে পরাজিত করে এবং রাজস্বের ক্ষেত্রে ভারতের সবচেয়ে বড়ো ই–কমার্স রেকর্ড করে।

একটি অনলাইন ব্যবসার ওভারভিউ ঃ–

ইন্টারনেটের বৃদ্ধি আমাদের সমাজকে নানাভাবে বদলে দিয়েছে। আমরা যেভাবে যোগাযোগ করি, বিনোদন এবং এমনকী কেনাকাটা করি তা ২০ বছর আগে আমরা যা করেছি তা অচেনা। ইন্টারনেটের প্রবৃদ্ধি ব্যবসার জগতেও পরিবর্তন এনেছে এবং অনেক উদ্যোক্তা খুঁজে পাচ্ছেন যে একটি অনলাইন ব্যবসা চালু করা তাদের আত্মকর্মসংস্থানের স্বপ্নকে অনুসরণ করার আদর্শ উপায়।

এই শতাব্দীর শুরুতে ডট কম বুদবুদ ফেটে অনেক উদ্যোক্তারা অনলাইন ব্যবসা চালু করার ব্যাপারে অস্থির হয়ে উঠেছিল, কিন্তু গত এক দশক ধরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের বিস্তারের অর্থ হল এখন অনেক সফল মাল্টি মিলিয়ন পাউন্ড অনলাইনে রয়েছে ব্যবসা

একটি অনলাইন ব্যবসা স্থাপন ঃ–

আপনি যদি একটি অনলাইন ব্যবসা চালু করার পরিকল্পনা করেন তবে আপনার একটি ভাল ওয়েবসাইট প্রয়োজন।

একটি ডোমেইন নাম কেনা এবং একটি বেসিক ওয়েবসাইট ডিজাইন করা সাধারণত এর জন্য অনেক টাকা খরচ করে না এবং এটি করা তুলনামূলকভাবে সহজ।

একবার আপনি আপনার ডোমেইন নামটি সুরক্ষিত করে নিলে, যা অবশ্যই আপনার কোম্পানির নামের অনুরূপ বা খুব অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন, ওয়েবসাইটের নকশা আপনার কোম্পানির ছবি এবং পণ্য বা পরিষেবাগুলি বহন করে তা নিশ্চিত করতে আপনার প্রচুর সময় ব্যয় করা উচিত।

আপনার ওয়েবসাইটকে একটি দোকানের ভার্চুয়াল সমতুল্য মনে করুন এটি যেখানে সম্ভাব্য গ্রাহকরা প্রবেশ করে এবং ব্রাউজ করে দেখতে পাবে যে কী অফার রয়েছে এবং যদি তাঁরা ব্র্যান্ড পছন্দ করেন এবং বিশ্বাস করেন তবে তাঁরা আপনার গ্রাহক হয়ে উঠবেন। যখন আপনি আপনার ওয়েবসাইট চালু করেছেন তখন আপনাকে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এবং বিজ্ঞাপনে কিছু সময় বিনিয়োগ করতে হবে, সর্বোপরি যদি কেউ এটি দেখতে না যায় তবে একটি দুর্দান্ত ওয়েবসাইট তৈরির কোনও অর্থ নেই।

গুগল অ্যাডওয়ার্ডস প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইটের

বিজ্ঞাপনের অন্যতম সেরা পদ্ধতি কিন্তু খরচ আপনার ব্যবসার প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করবে। এছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আপনার অনলাইন উপস্থিতি বিবেচনায় রাখুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি নিয়মিত আপনার ব্যবসার প্রচার করেন এবং প্রাসঙ্গিক সামাজিক নেটওয়ার্ক সাইটে গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

কীভাবে ব্যবসার বৃদ্ধি করবেন ঃ–

যখন আপনার ব্যবসা চালু এবং চলমান থাকে তখন আপনার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। যেমনটি ইতিমধ্যে বলা হয়েছে এটি এসইও এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে করা যেতে পারে, তবে বেশিরভাগ ব্যবসায়ের সঙ্গে আপনাকে সম্ভাব্য গ্রাহক এবং ক্লায়েন্টদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে নেটওয়ার্কিংয়ের পথে যেতে হবে। কনফারেন্স এবং নেটওয়ার্কিং ইভেন্টগুলিতে যোগ দিন এবং আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্লায়েন্টদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার ব্যবস্থা করুন, কারণ আমাদের বিশ্বের যতই অনলাইন হোক না কেন, ব্যবসা করার সময় এখনও অনেকে মুখোমুখি কথোপকথন পছন্দ করে। দূরত্বও এখন সামান্য পার্থক্য করে তবে স্কাইপের মতো ভিওআইপি পরিষেবা ব্যবহার করা যায়।

অনলাইন ব্যবসা এখন এত জন প্রিয় কেন ঃ–

১. আজ, অনলাইন ব্যবসা গুলি বিকশিত হচ্ছে কারণ আরও বেশি লোক বিস্তৃত ব্যবসায়ের সুযোগ পাচ্ছে।

২. আপনি আপনার স্বপ্নের ব্যবসা চালু করতে চান বা আপনার জীবনধারা তহবিলের জন্য আপনি যেটি চালাতে পারেন, ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবসা শুরু করার অনেক সুবিধা রয়েছে।

৩. আপনার নিজের ব্যবসা শুরু করার জন্য এর চেয়ে সহজ বা ভাল সময় আর কখনও ছিল না।

৪. আপনি ধনী হোন বা দরিদ্র আপনার এখন দক্ষতা ভাগ করে নেওয়ার এবং সারা বিশ্বের মানুষের সঙ্গে বিনামূল্যে সংযোগ করার ক্ষমতা আছে এবং যাঁরা অনলাইন ব্যবসা গড়ে তুলতে চান তাঁদের জন্য এটি অত্যন্ত সস্তা এবং শুরু করা খুব সহজ।

৫. একটি স্ট্যান্ডার্ড ভোটাধিকার বা ছোট ব্যবসার খরচ ১৫ হাজার থেকে ১০০ হাজার প্লাস থেকে আপনাকে সবকিছু সেটআপ করতে হবে বা সেট করতে দিতে হবে ... সঠিক অনলাইন ব্যবসা আপনাকে সাইনইন করার দিন প্রশিক্ষণসহ সবকিছু দিতে হবে।

৬. আপনি কাজ করতে চাইলে একটি সময়সূচী তৈরি করতে পারেন।

৭. সীমাহীন আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার আয় আপনার কাজ করা ঘন্টার সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত হয় না।

৮. একটি অনলাইন ব্যবসা এর দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় এবং বিশ্বব্যাপী দর্শকদের কাছে বাজারজাত করতে পারে।

৯. এক বার একটি সফল বিপণন এবং বিজ্ঞাপন কৌশল চিহ্নিত করা হলে একটি অনলাইন ব্যবসা সহজেই তার লক্ষ্য মাত্রা খুলে দিতে পারে এবং বাজেট বাড়িয়ে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।

১০. সীমাহীন স্বাধীনতা প্রদান করে। অনেক উদ্যোক্তা তাদের দেওয়া স্বাধীনতার কারণে অনলাইন ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট হন।

১১. আধুনিক প্রযুক্তি, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, বিজনেস অ্যাপস এবং ভিওআইপি কমিউনিকেশন সিস্টেম এমন কিছু টুল যা ব্যবসাগুলিকে যেকোন জায়গা থেকে পরিচালনার অনুমতি দেয়।

১২. এখানে কোন ভৌগোলিক সীমানা নেই এবং কোন নির্দিষ্ট কর্ম ঘণ্টা নেই। একটি অনলাইন ব্যবসা চব্বিশ ঘণ্টা আয় করতে পারে, এমনকি আপনি ঘুমানোর সময়ও।

অনলাইন ব্যবসার অনেক সুবিধার মধ্যে রয়েছে ঃ–

- বিশ্বব্যাপী অ্যাক্সেস, দিনে ২৪ ঘণ্টা, সপ্তাহে ৭ দিন।
- উন্নত ক্লায়েন্ট পরিষেবা।
- খরচ বাঁচানো
- পণ্য দ্রুত ডেলিভারি।
- পেশা দারিত্ব।
- কম কাগজের অপচয়।
- বিশ্বের যেকোন স্থান থেকে আপনার ব্যবসা পরিচালনা করার সুযোগ
- বিশ্বের বাজারে সম্ভাব্য প্রবেশাধিকার।
- মার্কেটিং খরচ কম।
- স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম এবং রিসোর্স শেয়ারিং।
- অনলাইন মার্কেটিং আপনাকে দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ দেয়।
- আপনি অনলাইন মার্কেটিং ব্যবহার করতে পারেন সম্পর্ককে আরো কার্যকরভাবে গড়ে তুলতে।
- অনলাইন মার্কেটিং ভূগোল বা টাইমজোনের সাথে আবদ্ধ নয়।

অনলাইন ব্যবসার অসুবিধা ঃ–

- বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব।
- গ্রাহক সেবা চ্যালেঞ্জ
- সম্ভাব্য ভাবে কম লাভের মার্জিন।

● নেতিবাচক পর্যালোচনা

কোভিড ১৯ এর সময় ইকমার্সের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং অনলাইন বিক্রির সুবিধা তৈরি হয়। ইকমার্সের জনপ্রিয়তা কোন নতুন গল্প নয়। আমাজন, ওয়ালমার্ট, আলিবাবা এবং অন্যান্যরা গত কয়েক বছরে দ্রুত প্রসারিত হয়েছে। কোভিড -১৯ মহামারীটি অবশ্য অনলাইন শপিং আন্দোলনের সুবিধার বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে।

কোভিড-১৯ মহামারী কীভাবে ইকমার্সকে প্রভাবিত করেছেঃ-

২০২০সালের মার্চ মাসে, বিশ্বের বেশির ভাগ অংশ লকডাউনে চলে গিয়েছিল, অনেক ব্যবসা বা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বাধ্য করেছিল। দেশগুলি ধীরে ধীরে বিধিনিষেধ শিথিল করছে, কিন্তু ভবিষ্যত এখনও অনিশ্চিত। এমনকী যে ব্যবসাগুলি পুনরায় চালু হচ্ছে তাদের সামাজিক দূরত্ব, মাস্কের ব্যবহার এবং এক সাথে কত জন গ্রাহক একটি স্থানে প্রবেশ করতে পারে তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

যখন কেনাকাটা কঠিন হয়ে পড়ে, অথবা ভীতি করও হতে পারে, তখন মানুষ ক্রমবর্ধমানভাবে অনলাইনে কেনাকাটার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

ভোক্তারা ইতিমধ্যেই অ্যামাজন এবং অন্যান্য অনলাইন খুচরা বিক্রেতাদের স্বাদরে গ্রহণ করেছে। এই সত্যটি এই পরিবর্তনকে যথেষ্ট সহজ করেছে।

২০২০ সালে, অনলাইনে রাজস্ব বৃদ্ধি ৪৪% এবং ২০২১ সালে এটি বছরের পর বছর ৩৯ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কোয়ারেন্টাইন পরবর্তী বিশ্বে এই প্রবণতা অব্যাহত থাকার একটি ভাল সুযোগ রয়েছে। অনলাইন শপিংয়ের সুবিধাগুলি থেকেই যাবে। এমনকি খুচরা ব্যবসাগুলি পুরোপুরি পুনরায় চালু হলেও। আপনার ইকমার্স প্রচেষ্টাকে শুরু বা দ্বিগুণ করার জন্য এটি আদর্শ সময়। আগের চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ অনলাইনস্টোর। গ্রাহকরা অনলাইন কেনাকাটাকে গ্রহণ করেছেন, ২০২০ সালে মার্কিন খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে অনলাইনে ৮৬১.১২বিলিয়ন ডলার খরচ করেছেন। অনলাইনে বিক্রি ও কেনাকাটার ব্যাপারটি মহামারীর কারণে ত্বরান্বিত হয়েছিল। এখন এটি ভোক্তাদের প্রিয় জিনিস ওয়েকফিল্ড রিসার্চ ফর স্কয়ারের ফিউচার অব রিটেইল রিপোর্টে জানা গেছে। ভোক্তারা তারা তাদের মাসিক খুচরা ক্রয়ের গড় ৪৩ অনলাইনে করে।

অনলাইন কেনা কাটা বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়, তারা এখন তাদের অর্ধেক কেনাকাটা অনলাইনে করে। এবং খুচরা বিক্রেতারা তাদের চাহিদা পূরণ করছে।যদিও চারজন খুচরা বিক্রেতার মধ্যে প্রায় তিনজন বলছেন যে অনলাইনে তাদের ব্যবসা রূপান্তর করা বা সম্প্রসারণ করা মহামারীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল।

খুচরো ব্যবসায়ী ৮৮% এখন তাদের পণ্য অনলাইনে বিক্রি করছে।

আপনার যদি অনলাইন ব্যবসা থাকে তাহলে ৫টি ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারেন ঃ-

- কপিরাইট লঙ্ঘন।
- যখনই আপনি কপিরাইট দ্বারা সুরক্ষিত অন্যের কাজ পুনরুৎপাদন করেন,আপনি কপিরাইট লঙ্ঘন করেন।
- ট্রেডমার্ক লঙ্ঘন।
- ট্রেডমার্ক লঙ্ঘন কপিরাইট লঙ্ঘনের অনুরূপ।
- ডেটা গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা।
- প্রতারণা।
- ন্যায্য বাণিজ্য আইন।

শুরু করার জন্য সেরা অনলাইন ব্যবসা কী?

- অনলাইন শিক্ষা পরামর্শ কেন্দ্র
- স্বাস্থ্য পরিষেবা পরামর্শ কেন্দ্র
- অ্যাকাউন্ট এবং প্রকল্প রিপোর্ট
- অনলাইন বিক্রয় এবং পরিষেবা

যেমন —

- শাকসব্জি, মাছ,মাংস, গ্রন্থাগার, পাঁউরুটি, কেক প্রভৃতির কারখানা বা দোকান, হস্তনির্মিত পণ্য বিক্রি করা।

Consulting একটি পরামর্শ ব্যবসা।

যেমন —

পোশাক শিল্প, আয়া সেন্টার, হোটেল ও পর্যটন ব্যবসা

ভারতে শীর্ষ অনলাইন শপিং সাইট ২০২১

- Amazon.in
- Flipkart.com
- Myntra.com
- Zomato.com
- Snapdeal.com
- Paytm.com

উপসংহার ঃ-

ইন্টারনেট অনলাইনে ব্যবসা করার অনেক সুযোগ খুলে দিয়েছে এবং ই-কমার্স অন্যতম জনপ্রিয়।

এর জন্য শুধু কম বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না, এটি আসলে এমন এক ধরনের ব্যবসা যার জন্য পূর্ণকালীন প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন হয় না, বিশেষ করে যদি আপনি সীমিত সংখ্যক পণ্য বিক্রি করেন।

অদম্য ইচ্ছাই জীবনকে জয়ের পথ দেখিয়েছে
কমলা কান্ত মল্লিক

ছোটোবেলা থেকেই ওনার পড়ার প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। তিনি হলেন কমলা কান্ত মল্লিক। পেশায় একজন কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বর্ধমানের এক গ্রামের বাড়িতে তিনি বড়ো হয়েছেন। যৌথ পরিবার ছিল। বাবারা ছিলেন চার ভাই। তাঁর বাবা ছিলেন মেজো। কমলা কান্তরা ছিলেন গ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। গ্রামে মুদিখানার দোকান আর নিজেদের অল্পস্বল্প জমি ছিল। ভাগচাষ করে তাঁর বাবা, জ্যেঠা ও কাকারা প্রায় কুড়ি জনের সংসার চালিয়েছেন।

কমলা কান্ত মল্লিকদের বংশে লেখাপড়ার চল ছিল না। তাঁর বাবা সপ্তম শ্রেণি আর মা চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। জ্যেঠতুতো দাদা তাঁর থেকে এক বছরের বড়ো। সে স্কুলে যাচ্ছে দেখে কমলা কান্তও কান্নাকাটি করেন। ছেলের কান্না দেখে বাবা তাঁকে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ভরতি করে দেন। ওই সময় ৬ বছর না হলে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হওয়া যেত না। তাঁর বাবা কিছু মাস বয়স বাড়িয়ে ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। সেই তাঁর লেখাপড়ার জীবন শুরু।

কমলা কান্ত ওই বংশের প্রথম সন্তান যিনি প্রথম মাধ্যমিক পাস করেন। এর আগে তাঁর চোদ্দপুরুষের কেউ দশম শ্রেণির গণ্ডিও পেরোয়নি। তিনি ওই বংশের সন্তান হয়ে প্রথম মাধ্যমিক পাস তারপর কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এটা তাঁর গর্ব নয়, বরং এটা ছিল জীবনের বড়ো চ্যালেঞ্জ। ওই গ্রামে লেখাপড়া শুধু ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কমলা কান্তরা গন্ধবণিক সম্প্রদায়ভুক্ত। এককথায় তাঁরা ছিলেন 'দোকানির ছেলে'। পাশের বাড়ির এক কাকা (প্রয়াত বাবলুকাকা) আর এক দাদার (প্রশান্ত ঘোষ) উসাহ আর সহযোগিতায় কমলা কান্তের কলকাতায় কস্টিং পড়তে আসা। তারপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। যৌথ পরিবার তাই অনেকজন সদস্য। সংসার চালানোই ছিল সবচেয়ে কঠিন কাজ। কমলা কান্ত তখন সোনারপুরে মেসে থাকতেন। প্রত্যেক মাসে মেসের খরচ দেওয়া তাঁর বাবার পক্ষে খুব কষ্টকর ব্যাপার ছিল। একবার পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার জন্য তাঁর মা নিজের গলার হার বন্ধক রেখে টাকার জোগান দেন। কমলা কান্ত মল্লিক ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর চার্টার্ড ফার্মে চাকরি করতে শুরু করেন। চাকরি করে সন্ধেয় টিউশন পড়াতে যেতেন। মেস আর পড়ার খরচ সেখান থেকেই তোলা হত। কয়েকজন বন্ধুর কাছে গিয়ে গ্রুপ স্টাডিও করতেন। পুরো কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি কোর্স শেষ করতে তিনি মাত্র ৫ মাস টিউশন নিয়েছিলেন। আজকের সফল এই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের তখন নিজস্ব একটা ক্যালকুলেটরও ছিল না। মেসের বন্ধুদের ক্যালকুলেটর নিয়ে প্র্যাকটিস করতেন। পরীক্ষার সময় নিয়ে যেতেন। বেশ কয়েকবার অল্প নম্বরের জন্য আটকায়। এরইমধ্যে তাঁর বাবার আচমকা মারাত্মক ব্লাড সুগার ধরা পড়ে। তিনি অসুখে পড়ে যান। তখন ফাইনালের একটা গ্রুপ বাকি। কমলা কান্ত বাবা ও মায়ের একমাত্র সন্তান। তাই তাঁর বাবা ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ছেলে অবশ্য বাবাকে সাফ জানিয়ে দেন, যতদিন না কস্টিংপাস করছেন, ততদিন বিয়ে করা সম্ভব নয়। পাস না করে কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হলেন না কমলা কান্ত। তাঁর বাবা অবশ্য সে যাত্রায় ঈশ্বরের কৃপায় সুস্থ হয়ে উঠলেন। এরইমধ্যে কলমা কান্ত কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস হলেন। সেদিনের স্মৃতি আজও তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল। জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন।

এরপরই বিয়ে। দু-একটা ছোটো কোম্পানিতে চাকরির পর কর্পোরেট জগতে ভালো চাকরি। প্রায় কুড়ি বছর কলকাতা, কানপুর, চণ্ডিগড় শহরে কাটানোর পর ২০১৩ সালের মে মাসে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। ঠিক করেন, আর চাকরি নয়, এবার প্র্যাকটিস করতে হবে। সোজা হোম টাউন বর্ধমানে চলে আসেন। মে মাস থেকেই তিনি প্র্যাকটিস শুরু করেন। মনে মনে প্ল্যানিং করেন, জমানো যা টাকা আছে তাতে বছর দুই ঠিক চালিয়ে নিতে পারবেন। এর মধ্যেই কিছু একটা করার প্রতিজ্ঞআবদ্ধ হন। বর্ধমানের মতো একটা ছোট শহরে, যেখানে ইন্ডাস্ট্রি কম, সেখানে প্র্যাকটিস জমানো খুবই চ্যালেঞ্জের কাজ। বেশ কয়েকজন বড়ো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস জমিয়ে প্র্যাকটিস করছেন। কমলা কান্ত কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস। তিনি আবার নতুন। সেই সময় তাঁর দু'জন পুরোনো বন্ধু তখন কলকাতায় ভালো প্র্যাকটিস করছেন। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরাই বেশ কিছু কাজ দিয়ে সাহায্য করেন। ধীরে ধীরে কমল কান্ত নিজেরও কিছু কাজ পেতে শুরু করেন। এদিকে বর্ধমান শহরে নিজের বাড়ি, সংসার খরচ, ছেলের পড়াশুনা, হোম লোনের ইএমআই দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। একটা সাইকেল নিয়ে কাজের জন্য শহরের এই প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে বেরালেন। নিজের অফিস ছিল না, অন্যের অফিসে বসতেন। এমনও সময় গেছে, ব্যাঙ্কে তাঁর ২০০০ টাকা ব্যালান্স। লোনের ইএমআই দিতে স্ত্রীর গয়না ব্যাঙ্কে দিয়ে গোল্ড লোন নিতে হয়েছে। অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আপনজনের কাছে সাহায্য চেয়েও পাননি। তবুও তিনি হতাশ হননি। উলটে মুঠো শক্ত করেছেন।

একদিন কমলা কান্তের এক গ্রামের বন্ধু এসে বললেন, আচ্ছা তুই গ্রামের সমবায় সমিতির ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করতে পারবি? সমবায় সমিতি ইনকাম ট্যাক্স অফিস থেকে চিঠি পাচ্ছে। কিন্তু কিছু করছে না চুপচাপ বসে আছে। তুই একটা মিটিংয়ে আয়। এই ব্যাপারে একটু বুঝিয়ে দে। কমলা কান্ত সমবায়ের ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে একটু বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে ওদের মিটিংয়ে ইনকাম ট্যাক্সের ওপর একটা লেকচার দিলেন। সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। এরপর একের পর এক ক্লায়েন্ট আসতে শুরু করল। কমলা কান্ত এভাবে বিভিন্ন ব্লকে মিটিং করলেন, এক বন্ধুর সাহায্যে আরও অনেক ব্লকে মিটিং করলেন। ধীরে ধীরে তিনি সমবায় ট্যাক্স কনসালট্যান্ট হিসাবে পরিচিত হলেন। বর্ধমান জেলা ছাড়াও হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অনেক সমবায় সমিতির ইনকাম ট্যাক্স, জিএসটি'র কাজ করেন। এছাড়াও ব্যক্তিগত ও অন্য ব্যবসারও ট্যাক্স সংক্রান্ত কাজ করেন।

একদিন যার অফিসে বসে কমলা কান্ত কাজ করতেন তিনি হঠাৎ করেই আসতে বারণ করলেন। তিনি সাফ বলেন, মল্লিকদা সবার একটা নিজস্ব আইডেন্টিটি দরকার। এরপর ওইদিনই কমলা কান্ত হন্যে হয়ে অফিসের খোঁজ করেন। না পেয়ে ওনার স্ত্রীর কথায় বাড়ির গ্যারেজে অফিস শুরু করলেন। এখন সেখানেই তাঁর অফিস। দু'জন স্টাফ আছে। বর্ধমানে নিজের বাড়ি, কলকাতাতেও ফ্ল্যাট কিনেছেন। কমলা কান্ত মল্লিক জীবনে একটা বিশ্বাস নিয়ে চলেন। গ্রামের ছেলে, বাড়িতে লেখাপড়া বলতে কিছু ছিল না। তবে তাঁর অদম্য ইচ্ছায় কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস হন। তাঁর কাছে ইচ্ছার জয় কখনোই অসাধ্য নয়। হয়তো কিছু সময় লাগবে,তবে হবেই হবে।

লিটল ম্যাগাজিনের যাত্রা কথা

সিদ্ধার্থ রায়

ভাষা সাহিত্যে, কথা সাহিত্যে এবং শিল্প সাহিত্যে সামাজিক নিয়মের যুগের পর যুগ ধরে চলতে থাকা ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাধারা ও মতামত ব্যক্ত করার মুদ্রিত বাহনকে বলা হয় লিটল ম্যাগাজিন। এই ম্যাগাজিনগুলি অনেকটা অনিয়মিত এবং অবাণিজ্যিক। লিটল ম্যাগাজিনগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করে একটি ছোট সমমনা নব্য গোষ্ঠী যাঁদের চিন্তা-ভাবনা-দর্শন চলমান ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অভূতপূর্ব। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে ইউরোপ-আমেরিকায় লিটল ম্যাগাজিনের যাত্রা শুরু।

বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাস বলে লিটল ম্যাগাজিনের অভিযাত্রা শুরু হয় Ralph Waldo Emerson ও Margaret Fuller সম্পাদিত The Dial (Boston, 1840-1844)-এর মাধ্যমে। ইমার্সনের নতুন দর্শন Transendentalism-এ যারা সমর্থক তাঁরাই শুধু Dial ম্যাগাজিনে লিখতেন। লিটল ম্যাগাজিনের আরেক প্রভাবশালী পত্রিকা ছিল ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত Savoy। ভিক্টোরীয়ান পুজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার উদারপন্থী ও সাম্যবাদী লেখকদের প্রধান বাহন ছিল এটি। সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশ শতকের গোড়ার দিকে সবচেয়ে নামী লিটল ম্যাগাজিন ছিল Poetry: A Magazine of Verse (Chicago 1912)। এর সম্পাদক ছিলেন হেরিয়েট মনরো ও এজরা পাউন্ড।বিংশ শতাব্দীর শুরুতে লিটল ম্যাগাজিনের প্রচার প্রসার ঘটলেও এর জন্মবৃত্তান্ত খুজতে হলে চলে যেতে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেই TheDial (Boston,1840 -1844) পত্রিকাটির কাছে। Ralph Waldo Emerson ও Margaret Fuller সম্পাদিত এই পত্রিকাটিকেই ইতিহাস বিদেরা লিটল ম্যাগাজিনের আদিরূপ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

তবে পত্রিকা শব্দটি কিভাবে ম্যাগাজিন শব্দে পরিণত হলো সেকথা বুঝতে হলে আরো পেছনে হাঁটতে হবে। ১৭৩১ সালে Edward Kev সম্পাদিত Gentleman's Magazine প্রকাশিত পত্রিকাটির মাধ্যমে ম্যাগাজিন শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়।Magazine শব্দের অর্থ হল বারুদশালা।বারুদ ঠাসা শব্দ অক্ষরের মাল মশলা মজুদের আধার হিসাবে ম্যাগাজিন শব্দের এই প্রতীকী ব্যবহারই পরবর্তীকালে পত্রিকার ক্ষেত্রে বিশাল জনপ্রিয়তা লাভ করে। তখন শুধুমাত্র বাঁধানো পত্র পত্রিকার ক্ষেত্রেই ম্যাগাজিন শব্দটি ব্যবহার হতো।তবে লিটল ম্যাগাজিন নামের ব্যবহার আঠারো শতকের শেষ দিকে বা উনিশ শতকের প্রথম দিকে বলেই ধারণা করা হয়।বিশাল বহুল অর্থ সর্বস্ব সাহিত্যের বিপরীতে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নব সাহিত্য প্রেরণা হিসেবে এক বিশেষ রীতির পত্রিকাকেই লিটল ম্যাগাজিন বলে চিন্হিত করা হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীতে লিটল ম্যাগাজিনের জগতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, " দি মাসেস " নামে একটি পত্রিকার আবির্ভাব।এই পত্রিকাটি নিউইয়র্কে প্রকাশিত করেন তরুণ এক গবেষক ম্যাক্স ইস্টম্যান এবং এই পত্রিকাটির মূল উদ্যোক্তা ছিলেন এক খেয়ালী ওলন্দাজ অভিবাসী পিয়েট ভেগ।এই ম্যাগাজিন নিয়ে মামলা হয়েছিল কারণ সাম্যবাদী বিষয়বস্তু। নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ম্যাগাজিনটি। পরবর্তীকালে "দি লিবরেটর" এবং "দি নিউ মাসেস" নামে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং ১৯১১ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ১৯১২ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, আমেরিকার শিকাগো শহরে প্রকাশিত হয় একটি শক্তিশালী লিটল ম্যাগাজিন " পয়েট্রি : এ ম্যাগাজিন অব ভারজ " - এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন কবি হেরিয়েট মনরওয়ে এবং বিদেশী সম্পাদক হিসেবে প্রভাবশালী কবি এজরা পাউন্ড। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে (১৯১৪ - ১৯১৮) আমেরিকা ও ইউরোপীয় বিভিন্ন শহর থেকে একাধিক লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে " দি লিটল রিভিউ " ম্যাগাজিনটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৯১৪ থেকে ১৯২৮৯ পর্যন্ত একটানা প্রকাশিত হয়েছিল এই ম্যাগাজিনটি। এই ম্যাগাজিনটির সম্পাদক ছিলেন খ্যাতিমান লেখিকা মার্গারেট ক্যারোলিন এন্ডারসন। সাহিত্য ম্যাগাজিন হিসাবে খুবই প্রভাবশালী হয়ে ওঠা এই লিটল ম্যাগাজিন এ লিখতেন কবি এজরা পাউন্ড, কবি টি এস ইলিয়ট, কবি ও উপন্যাসিক জেমস জয়েস, কবি রবার্ট ফ্রস্ট প্রমুখ সাহিত্যিকরা।১৯১৪ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত " দি ইগোইস্ট " নামক ম্যাগাজিনটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে লন্ডনে যার সম্পাদক ছিলেন সাংবাদিক ও লেখিকা ডোরা মার্সডেন ও রাজনৈতিক নেত্রী হেরিয়েট শোও ইউভার। ১৯১৫ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে ম্যাগাজিন " আদার্স " যার সম্পাদনা করেছেন কবি আলফ্রেড ক্রেমবার্গ। এভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বহু লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে যেমন " মর্ডান রিভিউ "(১৯২২ - ১৯২৪), " দি ফিউজিটিভ "(১৯২২ -১৯২৫), "ভয়েসেস

"(১৯২১ -১৯৬৫), "সেশন "(১৯২২ -১৯২৪), "ব্রুম "(১৯২১ -১৯২৪), " দিস কোয়ার্টার "(১৯২৫- ১৯৩২), "দি এনিমি "(১৯২৭ - ১৯২৯), "দি মিডল্যান্ড "(১৯১৫ -১৯৩৩), "দি ফ্রন্টিয়ার"(১৯২০ - ১৯৩৯), "সাউথ ওয়েস্ট রিভিউ "(১৯২৪ - ১৯২৯), "ডাবল ডিলার " (১৯২১ -১৯২৬), " দি এনভিল "(১৯৩৩ -১৯৩৫), " ব্লাস্ট "(১৯৩৩ -১৯৩৫), "দি পার্টিশন রিভিউ "(১৯৩৩ -১৯৩৫), " ট্রানজিশন "(১৯২৭ -১৯৩৮), "নিউ ভারজ" (১৯৩৩ -১৯৩৯), " ক্রইটেরিয়ান "(১৯২২ -১৯৩৯) উলেখযোগ্য।

এশিয়ায় ভারত ও জাপান এই দুটি দেশেও লিটল ম্যাগাজিন বিশাল আলোড়ন তুলে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।জাপানে লিটল ম্যাগাজিন কে " দোঅজিনিশ " বলা হয়। দোঅজিনিশ এর প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা হল "গারাকুতা বুনকো "।এটি ছিল সাহিত্য ভিত্তিক পত্রিকা। এতে কবিতা ও ছোটগল্পের সমাহার ছিল। এই পত্রিকাটি ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই লিটল ম্যাগাজিনটি সাহিত্যিক ইয়ামাদা বিময়ও, উপন্যাসিক ইসিবাসী সিআন এবং কবি মারুউকা কিউকা মিলে প্রকাশিত করেছিলেন। ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয় বিখ্যাত সেই লিটল ম্যাগাজিন "বুনগাকুকাই "।এই সাহিত্যিক পত্রিকাতে লিখতেন খ্যাতিমান সাহিত্যিক শিমাজাকি তোআসেন, উপন্যাসিক ইগুছি ইচিও, কবি হিরাতা তকুবকু প্রমুখ সাহিত্যিকেরা। ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয় "শিনশিচও " ম্যাগাজিনটি এই পত্রিকাতে লিখতেন বিশ্বখ্যাত কবি ও উপন্যাসিক আকুতাগাওয়া রিউনসুকে, খ্যাতিমান সাংবাদিক কিকুচি হিরোসি, হাইকু কবি, উপন্যাসিক কুমে মাসাও প্রমুখ।১৯১০ সালে বার হয় লিটল ম্যাগাজিন "শিরাকাবা " এটার সঙ্গে জড়িত ছিলেন প্রভাবশালী কবি,কথাসাহিত্যিক ও রবীন্দ্রনাথ ভক্ত কবি মুসাকোজি শানেআৎসু , উপন্যাসিক শিগে নাওয়াইয়া, কবি কিনোশতা রিনগে প্রমুখ।১৯২৩ পর্যন্ত এই ম্যাগাজিনটি চালু ছিল।কিন্তু অন্য দুটি লিটল ম্যাগাজিন "বুনগাকুকাই " ও "শিনশিচও" আজও প্রকাশিত হয় চলেছে। জাপানে সাহিত্য, সংস্কৃতি, নাটক, ও শিল্পকলা নিয়ে বিগত শতবর্ষ ধরে প্রকাশিত হয় চলেছে লিটল ম্যাগাজিন। আজও জাপানের কবিতাপত্র লিটল ম্যাগাজিন " গেনদাইসি " বিশ্বপ্রসিদ্ধ এক জনপ্রিয় লিটল ম্যাগাজিন। জাপানি সাহিত্য এক বিশাল জগৎ, এবং সেই জগতের বহু কীর্তিমান কবি ও সাহিত্যিক লিটল ম্যাগাজিন ধরেই পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে গেছেন। এখানকার স্কুল ও কলেজ থেকেও ছাত্র ছাত্রীরা নিয়মিত লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত করে থাকে।

পাশ্চাত্যের আদলে বাংলা ভাষা সাহিত্যে প্রথম লিটল ম্যাগাজিন প্রবর্তন করেন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর সম্পাদিত সবুজপত্র (১৯১৪)-কে আধুনিক লিটল ম্যাগাজিনের আদিরূপ বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য অনেকের মতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন (১৮৭২) বাংলা ভাষায় প্রথম লিটল ম্যাগাজিন। বাংলাসাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনায় বহু পত্রপত্রিকা বাণিজ্যিকভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১), অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩), প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত মাসিক (১৮৫৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন (১৮৭২), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত ভারতী (১৮৭৭), সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত সাধনা (১৮৯১), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রবাসী (১৯০১), জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ভারতবর্ষ (১৯১৩) প্রভৃতি পত্রিকা। এসব পত্রিকা ছিল প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শের বাহক, যদিও পাশাপাশি অভিনবত্বেরও ছাপ ছিল এগুলিতে। তবে সনাতন চিন্তাধারার প্রাধান্য ছিল এগুলিতে।

লিটল ম্যাগাজিন নবচেতনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং লেখক ও পাঠকদের মধ্যে সে নবচেতনাকে সঞ্চারিত করে তোলে। যারা সাহিত্য, দর্শন ও শিল্প-চেতনায় গতানুগতিক ধারার বিরোধী, তারা তাঁদের চিন্তাচেতনার প্রকাশ ঘটান নিজেদের সংঘটিত মুখপত্রের মাধ্যমে। যথার্থ অর্থে বাংলায় লিটল ম্যাগাজিনের আবির্ভাব ঘটে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজপত্র (১৯১৪) পত্রিকার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে কল্লোল (১৯২৩), শনিবারের চিঠি (১৯২৪), কালিকলম (১৯২৭), প্রগতি (১৯২৭), পূর্বাশা (১৯৩২) পত্রিকা লিটল ম্যাগাজিন প্রবাহকে বেগবান করে। এসব পত্রিকার লেখকগণের উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করা। এইলক্ষ্যে তাঁরা ইউরোপীয় আদর্শে বাস্তবজীবন, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশেষণ এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গকে তাঁদের রচনার প্রধান বিষয়বস্তু নির্বাচিত করেন।

লিটল ম্যাগাজিন এর লেখাগুলি আমাদের আদর্শের ঝুড়ি ঝুড়ি জ্ঞান দেয় না বরং জীবনকে তুলে ধরে সেই জীবনের অর্থ বুঝিয়ে জীবনের পথে চলতে শেখায়। পাঠকেরা লিটল ম্যাগাজিন এর লেখাগুলি পড়ে ভালোবাসতে পারেন বা ঘেন্না করতে পারেন কিন্তু এড়িয়ে যেতে পারেন না আর সেকারণেই লিটল ম্যাগাজিন এর লেখাগুলি জীবনের একটি বিকল্প আর্ট হয়ে বিরাজমান। এই পত্রিকার সম্পাদকরা সেই সব লেখকদের তুলে আনেন যাঁদের কেউ চেনেনা এবং

সেইসব বিষয়বস্তুর উত্থাপন হয় যা নিয়ে আগে কোনো কাজ হয়নি। এই পত্রিকাগুলোতে লেখকেরা মন খুলে লিখতে পারেন,কেউ তাঁর ভাবনাকে রুদ্ধ করেনা। বিষয় নির্বাচন ও লেখনভঙ্গি দুই ক্ষেত্রেই লেখকেরা স্বতন্ত্র। লিটল ম্যাগাজিন বিজ্ঞাপন সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরে থাকেন এবং আক্ষরিক অর্থে নিজেদের অর্থেই ভর করে হৃদয় দিয়ে পত্রিকা চালান যা এক অভিনব যাত্রা কথা।

বাংলাদেশে ১৯৪৭ সালে চট্টগ্রাম থেকে মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী ও সুচরিতা চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সীমান্ত (১৯৪৭-৫২)। ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসে পত্রিকাটি স্মরণীয় হয়ে আছে। ফজলে লোহানীর সম্পাদনায় ১৯৪৯ সালে বের হয় অগত্যা। মধ্যবিত্ত, নব্যনাগরিক জীবনের এবং মানবতাবাদি মানসিকতা ছাড়াও সমকালীন মেধাবী ও প্রগতিশীল তরুণ লেখকদের উচ্ছ্বাস, আনন্দ, চিন্তাভাবনা এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে।

আবদুল আলীম চৌধুরী ও আহমদ কবির-এর যৌথ উদ্যোগপ্রকাশিত হয় যাত্রিক (১৯৫৩)। পঞ্চাশের দশকের প্রধান তরুণ সাহিত্যিকগণের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র ছিল যাত্রিক। সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত সমকাল (১৯৫৭) পঞ্চাশের দশক থেকে প্রকাশিত হলেও এর প্রকৃত সমৃদ্ধি ষাটের দশক জুড়ে। প্রগতিবাদী-সৃষ্টিশীল সমকাল-এ এমন সব লেখাকে স্থান দেওয়া হতো যে-ধরনের লেখা ইতোপূর্বে প্রকাশিত সওগাত (১৯১৮), মোহাম্মদী, মাহে-নও ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি থেকে ভিন্ন ধরনের। প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশকে বাংলাদেশের লিটল ম্যাগাজিন-আন্দোলন শুরু হয় স্যাড জেনারেশন (১৯৬৩), স্বাক্ষর (১৯৬৩), কণ্ঠস্বর (১৯৬৫), ছোটগল্প (১৯৬৬), সাম্প্রতিক (১৯৬৪) প্রভৃতি আধুনিকতাবাদী লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের মাধ্যমে।

এনামুল হকের সম্পাদনায় উত্তরণ (১৯৫৮) পত্রিকাটি বাংলাদেশের লিটল ম্যাগাজিন-আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। অপরদিকে ফজল শাহাবুদ্দিন সম্পাদিত কবিকণ্ঠ, সাঈদুর রহমানের খাপছাড়া, মহিউদ্দিন আহমদের স্পন্দন, সিরাজুর রহমান সম্পাদিত সংকেত প্রভৃতি কাগজ পঞ্চাশের দশকের লিটল ম্যাগাজিন-আন্দোলনকে গতিশীল করে। একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে এ সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।বাংলাদেশের অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সপ্তক (১৯৬২), বক্তব্য (১৯৬৩), স্বাক্ষর (১৯৬৩), স্যাড জেনারেশন (১৯৬৩), যুগপৎ (১৯৬৩), সাম্প্রতিক (১৯৬৪), কালবেলা (১৯৬৫), কণ্ঠস্বর (১৯৬৫), ছোটগল্প (১৯৬৬), না (১৯৬৭), বহুবচন (১৯৭০), স্বদেশ (১৯৬৯), শব্দের বিকৃতি (১৯৬৯), শিল্পকলা (১৯৭০) প্রভৃতি।

ষাটের দশকের প্রথম উলেখযোগ্য কাগজ সপ্তক। পত্রিকাটি বিশেষ পরিচিতি লাভ করে গল্পে স্বাতন্ত্র্য আনয়নে। লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে স্বাক্ষর উলেখযোগ্য এ কারণে যে, সাহিত্যসৃষ্টির পাশাপাশি বিশৃঙ্খল-ভাবনার তরুণ কবিদের ভাবনায় সামঞ্জস্য বিধান করেছিল। সাম্প্রতিক প্রকাশিত হলে স্বাক্ষর-এর কেউ কেউ এ পত্রিকায় লেখেছিলেন। এ দশকের মাঝামাঝি 'ছোটগল্প' প্রকাশে শ্রাবন্তী (১৯৬৬), ছোটগল্প, উল্কা (১৯৬৬), সূচীপত্র (১৯৭০), স্বরগ্রাম (১৯৭০), সুন্দরম (১৯৭০), পত্রিকাগুলির যথেষ্ট অবদান রয়েছে এবং এ সময় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ছোটগল্প সমিতি' নামে একটি সংগঠন। এ সমিতি থেকে কামাল বিন মাহতাবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ছোটগল্প। ছোটগল্পকেন্দ্রিক পত্রিকা হিসেবে এটিই বাংলাদেশের প্রথম গল্পবিষয়ক পত্রিকা। মধ্যষাটে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় কণ্ঠস্বর। প্রায় বারো বছর নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবদুস সেলিম সম্পাদিত শিল্পকলা (১৯৭০) ছিল ষাটের দশকের ভিন্নধর্মী লিটল ম্যাগাজিন। পত্রিকাটিতে কবিতাচর্চার পাশাপাশি চলচ্চিত্র, চিত্রকলা ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখাও সমান গুরুত্বে স্থান পেয়েছে।

লিটল ম্যাগাজিনের আলোচনা হলেই সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবেই চলে আসে। লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি "দেশ" পত্রিকায় (সংখ্যা ১৯৫৩) লিখেছেন - "এক রকমের পত্রিকা আছে যা আমরা রেল গাড়িতে সময় কাটাবার জন্য কিনি, আর গন্তব্য স্টেশনে নামার সময় ইচ্ছে করে গাড়িতে ফেলে যাই যদি না কোনো সতর্ক সহযাত্রী সেটি আবার আমাদের হাতে তুলে দিয়ে বাধিত এবং বিব্রত করেন আমাদের। আর এক রকমের পত্রিকা আছে যা স্টেশনে পাওয়া যায় না, ফুটপাতে কিনতে হলেও বিস্তর ঘুরতে হয়, কিন্তু যা একবার হাথে এলে আমরা চোখ বুলিয়ে সরিয়ে রাখি না, চেয়ে চেয়ে আস্তে আস্তে পড়ি, আর পড়া হয়ে গেলে গরম কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে ন্যাপথলিন গন্ধী তোরঙ্গে তুলে রাখি - জল,পোকা, আর অপহারকের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য। যেসব পত্রিকা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হতে চায় - কৃতিত্ব যেইটুকুই, অন্তত পক্ষে নজরটা যাঁদের উঁচুর দিকে,তাদের জন্য নতুন একটা নাম বেরিয়েছে মার্কিন দেশে,চলতি কালের ইংরেজি বুলিতে এদের বলা হয় থাকে লিটল ম্যাগাজিন"।

বুদ্ধদেব বাবু এক চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে - " লিটল কেন ? আকারে ছোট বলে ? প্রচারে ক্ষুদ্র বলে? না কি বেশিদিন বাঁচে না বলে? সবকটাই সত্য,কিন্তু এগুলোই সব কথা নয়; ঐ ছোট বিশেষণটাতে আরো অনেকখানি অর্থ পোরা আছে।প্রথমত, কথাটা একটা প্রতিবাদ; এক জোড়া মলাটের মধ্যে সব কিছুর আমদানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বহুলতম প্রচারের ব্যাপকতম মাধ্যমিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।লিটল ম্যাগাজিন বললেই বোঝা গেল যে জনপ্রিয়তার কলঙ্ক একে কখনো ছোঁবে না, নগদ বড়োবাজারে বিকোবে না কোনো দিন, কিন্তু হয়তো কোন একদিন এর একটি পুরানো সংখ্যার জন্য গুনীসমাজে উৎসুক বার্তা জেগে উঠবে। সেটা সম্ভব হবে এই জন্যেই যে, এটি কখনো মন যোগাতে চায়নি, মনকে জাগাতে চেয়েছিল।চেয়েছিল নতুন সুরে কথা বলতে। কোনো এক সন্ধিক্ষণে, যখন গতানুগতিক তা থেকে অব্যাহতির পথ দেখা যাচ্ছে না, তখন সাহিত্যের ক্লান্ত শিরায় তরুণ রক্ত বইয়ে দিয়েছিল - নিন্দা,নির্যাতন বা ধনক্ষয়ে প্রতিহত না হয়ে। এই সাহস, নিষ্ঠা, গতির একমুখিতা, সময়ের সেবা না করে সময়কে সৃষ্টি করার চেষ্টা - এইটাই লিটল ম্যাগাজিনের কুলধর্ম। এটুকু বললেই অন্য সব কথা বলা হয় যায়, কেননা এই ধর্ম পালন করতে গেলে চেষ্টা করেও কাটতি বাড়ানো যাবে না, টিকে থাকা শক্ত হবে, আকারেও মোটাসোটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। অবশ্য পরিপুষ্ট লিটল ম্যাগাজিন দেখা গেছে - যদিও সেসময়ে ও কথাটার উদ্ভব হয়নি - যেমন এলিয়টের "ক্রেইটেরিয়ান" বা আদিকালের "পরিচয়"। কিন্তু মনে রাখতে হবে তারা ত্রৈমাসিক ছিল। ভালো লেখা বেশি জন্মায় না, সত্যিকার নতুন লেখা আরো বিরল, আর শুধু দুর্লভ রসন্ধানী হলে পৃষ্ঠা এবং পাঠক সংখ্যা স্বতঃই কমে আসে। অর্থাৎ আমরা যাকে বলি সাহিত্যপত্র, খাঁটি সাহিত্যের পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন তারই আরো ছিপছিপে এবং ব্যঞ্জনাবহ নতুন নাম "।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক আব্দুল্লা আবু সাইদের মতে, " লিটল ম্যাগাজিন যাঁরা বার করেন তাঁদের অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই, সামর্থ নেই, কিন্তু পিপাসা আছে।একটা বড় সাহিত্যের স্বপ্ন তাঁদের চোখের সামনে। একটা উচ্চতর সাহিত্য যুগের জন্য তাঁরা সংগ্রাম করছেন। সে জন্য একটি দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকার যে আর্থিক ভিত্তি থাকে, যে স্বচ্ছলতা থাকে, যে ব্যবসা থাকে তা থেকে লিটল ম্যাগাজিন সম্পূর্ণ আলাদা।এটি হলো ব্যবসাহীন পত্রিকা।লিটল ম্যাগাজিন আর ব্যবসা এক সঙ্গে হয় না। সাহিত্যের জন্য নিবেদিত কিছু মানুষের শ্রম, আত্মতৎস্বর্গ এবং স্বপ্ন এর মূল চালিকা শক্তি।অসম্ভব কষ্টের মধ্যে দিয়ে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যেহেতু এই পত্রিকার কোনো প্রচার নেই, সার্কুলেশন নেই, অনেক বেশী পাঠক নেই, তাই এর বিজ্ঞাপনও নেই।বিজ্ঞাপন এতে পাওয়া যায় তা আসে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে। কিন্তু সেরকম সম্পর্ক একজন তরুণ লেখক বা লেখিকার কতটুকুই বা থাকতে পারে ? সেজন্য একটি অসীম দারিদ্রের মধ্য দিয়ে লিটল ম্যাগাজিন বেঁচে থাকে, এগোয়। কিন্তু আপোষহীন - অপরাজিত স্বপ্ন আর শক্তি নিয়ে তাঁরা এ কাজটা করে"।

লিটল ম্যাগাজিনগুলোকে কেন্দ্র করে ষাট এর দশকে যে সাহিত্য-আন্দোলন শুরু হয়, সে ধারা পরে অব্যাহত থাকেনি। সেসময় মানুষের চেতনাজগতে স্বতন্ত্রধর্মী পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যা সাহিত্যেও প্রভাব ফেলে। সে সময়ে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এ সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিছুসংখ্যক লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় যা সত্তরের দশকের সাহিত্যচর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখে।আশির দশকের শুরুতে লেখকগণের চিন্তার গভীরতা কমতে থাকলে মধ্য-আশিতে লেখার সংকট দেখা দেয়।

নব্বইয়ের দশক থেকে প্রকাশিত হয় চলেছে বহু লিটল ম্যাগাজিন।বর্তমানে আর্থিক সংকট এর কারণে বেশকিছু লিটল ম্যাগাজিন গোষ্ঠীকে অনবরত যুঝতে হচ্ছে। তাছাড়া এ সময় মুদ্রণ ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় লিটল ম্যাগাজিনের জন্য পর্যাপ্ত শ্রম ও সততার তীব্র অভাব লক্ষ করা যায়। এই সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও উল্লেখযোগ্য যে যারা চায়, অতীতের গর্ভ থেকে বর্তমানকে যুক্ত করে অন্যায়মুক্ত, অভাবমুক্ত নতুন সমাজ নির্মাণ করতে তাদের কাছে লিটল ম্যাগাজিন চিরকালই এক আদর্শ ও প্রেরণাস্রোত হয়ে ওঠায় বঙ্গ - বহির্বঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে বহু লিটল ম্যাগাজিন। সবচেয়ে বড়ো দিক হল তরুণ লেখকদের দৈনিক পত্র-পত্রিকার উপর যে নির্ভরতা ছিল তা থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছে ও লিটল ম্যাগাজিনগুলি নতুন নতুন লেখকদের সাহিত্যচর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। লিটল ম্যাগাজিন মানেই তারুণ্যের পতাকা।সৃষ্টির নেশায় মত্ত তারুণ্যের অবিচল পথচলা।এই অবিচলতার প্রোথিত জমিনটিকে উর্বর সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজন হয় নবীন দর্শনের প্রায়োগিক উজ্জ্বলতা যা সুনির্দিষ্ট করে লিটল ম্যাগজিন।ইতিহাস অন্তত তাই বলে যে সুনির্দিষ্ট, উদ্দেশ্যবাহি, সাহিত্যমননে সৎ ও রুচিশীল তারুণ্যের সৃজনশীল সাহিত্যাপত্রিকা হল লিটল ম্যাগাজিন।

অবহেলিত উচ্চারণশাস্ত্রী নরেন বিশ্বাস

ড. শ্যামলকান্তি দত্ত (বাংলাদেশ)

সারসংক্ষেপ : ভাষার প্রকারভেদ বা রীতিভেদ প্রধানত দুটি : লৈখিক ও মৌখিক। সুতরাং ভাষার দুটো রীতির কথাই ভাবতে হয়। বাংলাদেশে বারবার বর্ণমালা সংস্কার, বানান সংস্কার বা বানানের নিয়ম প্রণয়নে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যা কেবল লৈখিক ভাষারীতির অংশ। বাংলা ভাষার অবস্থান পরিকল্পনায় বাঙালি উদাসীন। অবয়ব পরিকল্পনার অংশ মৌখিক ভাষারীতি সম্পর্কে উদাসীনতা দূর করতে এগিয়ে আসেন নরেন বিশ্বাস। অধ্যাপনা-গবেষণার পাশাপাশি এই পন্ডিত ব্যক্তি আজীবন বাঙালির মুখের ভাষার প্রমিত উচ্চারণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, প্রমিত বাংলা উচ্চারণের ক্যাসেট প্রকাশ করেছেন এবং প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা উচ্চারণ অভিধান প্রণয়ন করেছেন। মুখের ভাষার প্রতি অবহেলার কারণেই হয়তো নরেন বিশ্বাসও এদেশে অবহেলিত। অথচ, বাংলা ভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চাই-একটি সুচিন্তিত ভাষানীতির আলোকে এর অবস্থান পরিকল্পনা এবং অবয়ব পরিকল্পনা। আর অবয়ব পরিকল্পনায় মৌখিক বা কথ্য ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। মৌখিক বাংলা ভাষার উচ্চারণ বিষয়ে নরেন বিশ্বাসের গভীর গবেষণা-প্রয়োগ ও মনন-ঋদ্ধ প্রবন্ধগুলো আমাদের জ্ঞানদৃষ্টি প্রসারিত করবে, বাংলা ভাষার প্রতি দরদ ও বিদ্যা-বুদ্ধির বিস্তার ঘটাবে। উচ্চারণশাস্ত্রী নরেন বিশ্বাসের আলোচনা-চর্চা তাই বাংলা ভাষার প্রমিতায়নে অপরিহার্য।

সূচক-শব্দ : অভিধান, ধ্বনি, বর্ণ, উচ্চারণ, প্রমিতায়ন, মান্য বাংলা, ভাষানীতি ও ভাষাপরিকল্পনা।

বাংলাদেশে মান্য-বাংলা বা প্রমিত বাংলা ভাষা প্রচলনের চর্চায় যে ক'জন পন্ডিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, উচ্চারণশাস্ত্রী নরেন বিশ্বাস (১৯৪৫-১৯৯৮) তাঁদের অন্যতম। কোনো ভাষার দুটো দিক : লেখ্য ও কথ্য। ভাষার সংজ্ঞা অনুসারে কথ্য ভাষাই অধিক মূল্যবান, প্রাচীন, জীবন্ত এবং বহুল ব্যবহৃত। কথ্য ভাষা জীবন্ত মানুষের কথার ধ্বনির মাধ্যমে উচ্চারিত হয়, আর সেই ধ্বনিকে সাংকেতিক চিহ্ন বা বর্ণ দিয়ে আঁকা হয় ভাষার লেখ্যরূপ। বাংলাদেশে লেখ্য বাংলা ভাষা প্রমিতায়নে রাষ্ট্রীয় একাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী–প্রণীত হয়েছে বাংলা ভাষার অভিধান-ব্যাকরণ। এমনকি কোনো ভাষানীতি না করেই ভাষাপরিকল্পনায় আমরা অগ্রসর হয়েছি, প্রণয়ন-প্রচলন করেছি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম। অন্যদিকে, প্রতিদিনের নানান কাজে বাঙালির মুখে ব্যবহৃত কথ্য বা মৌখিক বাংলা ভাষার উচ্চারণ প্রমিতায়নে ব্যক্তি নরেন বিশ্বাস (পূর্ণ নাম নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস) অনন্য অবদান রেখেছেন। গণমাধ্যমে খবরপাঠ, সিনেমা-নাটকে, আবৃত্তিতে, বক্তৃতায় এমনকি সাধারণ কথোপকথনে বাংলা উচ্চারণের একটি প্রমিত বা মান্য রূপ প্রতিষ্ঠায় তিনি নিষ্ঠার সাথে নিরলস শ্রম দিয়েছেন-গবেষণা করেছেন। তিনি কেবল উচ্চারণ অভিধান আর উচ্চারণ প্রসঙ্গ নিয়ে গবেষণা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেই কর্তব্য কর্ম সমাপ্ত রাখেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার (১৯৭৬-১৯৯৮) পাশাপাশি তিনি ঢাকা শহরে ও বাংলাদেশের বিভিন্ন নাটক, আবৃত্তি ও কথনশিল্পের প্রশিক্ষক হিসাবে 'বাকশিল্পাচার্য' অভিধায় খ্যাতি লাভ করেন। 'কণ্ঠশীলন' ও 'শব্দরূপ' এর প্রতিষ্ঠাতা তিনি।[১] কলকাতার আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৪) প্রাপ্তির কথা মনে রেখেও বলতে হয় উচ্চারণবিদ নরেন বিশ্বাস বাংলাদেশে অবহেলিত না হলেও অনেকটাই অনালোচিত। অথচ, লেখ্যভাষার অভিন্ন রূপের লক্ষ্যে প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম প্রণয়নের মতো কথ্য ভাষার মান্য রূপের স্বার্থে বাংলা উচ্চারণ প্রমিতায়নও গুরুত্বপূর্ণ। আর এ প্রসঙ্গে, আজও নরেন বিশ্বাসের উচ্চারণ বিষয়ক আলোচনা-প্রয়োগের পর্যালোচনা প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয়।

উচ্চারণশাস্ত্রী, অভিধানকার, লেখক, গবেষক, আবৃত্তি শিল্পী এবং মুক্তিযোদ্ধা নরেন বিশ্বাস রচিত গ্রন্থ, প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা (১৯৮৪), বাঙলা উচ্চারণ অভিধান (১৯৯০), উচ্চারণ প্রসঙ্গ (২০০০), প্রসঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি, ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব, কাব্যতত্ত্ব অন্বেষা, বাংলা উচ্চারণ সূত্র, বাংলা উচ্চারণ তত্ত্ব ও প্রয়োগবিধি তত্ত্ব প্রভৃতি। 'বাংলা একাডেমি বাঙলা উচ্চারণ অভিধান' এ 'অভিধানের অনুসৃত নীতিমালা' শিরোনামে দীর্ঘ ত্রিশ পৃষ্ঠার তিনি বাংলা উচ্চারণের নিয়ম ও তার প্রয়োগ উপস্থাপন করেছেন সহজ প্রাণবন্ত ভাষায়। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান যথার্থই লেখেন, 'নরেন বিশ্বাস' দীর্ঘকাল ধরে প্রমিত বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর একাধিক রচনা ও বিভিন্ন

গবেষণামূলক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ যেমন গভীর, এ বিষয়ে তাঁর কাজও তেমনি একাগ্রতা ও নিষ্ঠার পরিচয়বাহী।'[২] উচ্চারণশাস্ত্রের পাশাপাশি তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, অলঙ্কার শাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব, এমনকি প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রতিটি প্রবন্ধেই লেখকের জ্ঞানের ব্যাপ্তির, মননের গভীরতার, যুক্তির তীক্ষ্ণতার এবং প্রমাণের সুস্পষ্টতার আর বিন্যাস-বিশ্লেষণের নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রয়েছে।[৩] তবে বাংলা উচ্চারণ বিষয়ক গবেষণার প্রয়োগে তিনি অসাধারণ। আমাদের অনেকেরই হয়তো অজানা যে, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ব্যবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান (১৯৯৮) এর সম্পাদনা পর্ষৎ রূপে : আনিসুজ্জামান, ওয়াহিদুল হক, জামিল চোধুরী ও নরেন বিশ্বাস এর নাম উল্লেখ থাকলেও 'সম্পাদনা পর্যদের নীতি-নির্দেশানুযায়ী নরেন বিশ্বাস প্রাথমিকভাবে উচ্চারণ নির্দেশ করেন।'[৪] 'তাঁর স্বকণ্ঠে 'প্রিয় পঙক্তিমালা' ও 'উচ্চারণশিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতামালা' ক্যাসেট দুটি ছাড়াও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ২০টি ক্যাসেট প্রকাশিত।[৫] এছাড়া নাটক-কথিকা -নক্সা ইত্যাদি রচনা করলেও উচ্চারণবিদ হিসেবেই নরেন বিশ্বাস দুই বাংলায় খ্যাতি লাভ করেন।

বাংলা উচ্চারণশাস্ত্রে নরেন বিশ্বাসের অবদান অবস্থান নিরুপণের লক্ষ্যে প্রথমে বাংলা উচ্চারণচর্চার দিকে আলোকপাত আবশ্যক। ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বেঙ্গলি স্পোকেন অ্যান্ড রিটেন' প্রবন্ধে শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি (১৮৩৮-১৯২৮) প্রথম উল্লেখ করেন, 'বাংলা লিপি ইংরেজি লিপির মতোই ত্রুটিপূর্ণ, ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে ধ্বনির যথার্থ উচ্চারণ থেকে বেশ দূরবর্তী।[৬] প্রায় সমকালে (১৮৭৮-১৮৮০) ইংলন্ডে বসে 'একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার সময়' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'চৈতন্য হইল যে' আমাদের বর্ণমালা এবং উচ্চারণের মধ্যে গোলযোগ আছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্যের কারণে 'নানা প্রকার উচ্চারণের ভঙ্গি' স্বীকার করে নিয়েও তিনি তৎকালীন রাজধানী 'কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে' স্থির করেন। সেই আদর্শে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা উচ্চারণের নিয়ম প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন। বাঙালির দুর্ভাগ্য বলতে হয়, প্রথম বাংলা উচ্চারণের নিয়ম সংবলিত হাতে লেখা কাগজগুলি দেশে ফেরার দু'বছর পর রবীন্দ্রনাথ আর খুঁজে পেলেন না। তবু তাঁর কিছু কিছু মনে আছে, তা থেকে লিখলেন 'বাংলা উচ্চারণ' শীর্ষক প্রবন্ধ। অক্টোবর ১৮৮৫ তে 'বালক' (আশ্বিন ১২৯২) পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধে তিনি দেখান, 'পবন শব্দের প অকারান্ত, ব ওকারান্ত, ন হসন্ত শব্দ। ব্যয় লিখি পড়ি ব্যায়। অথচ অব্যয় শব্দে ব্য-এর উচ্চারণ ব্‌ এর মতো। আমরা লিখি গর্দভ, পড়ি গর্ধোব।[৭] এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'কেবল আদ্যক্ষরবর্তী অকার উচ্চারণের আটটি নিয়ম উদাহরণ এবং আরও কিছু আলোচনা করে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। তাঁর প্রত্যাশা : 'যদি কোনো অধ্যবসায়ী পাঠক রীতিমত অন্বেষণ করিয়া এই সকল নিয়ম নির্ধারণ করিতে পারেন, তবে আমাদের বাংলা ব্যাকরণের একটি অভাব দূর হইয়া যায়।[৮] এর বছর সাতেক পর 'সাধনা পত্রিকায়' (আষাঢ় ১২৯৯ ও কার্তিক ১২৯৯) 'স্বরবর্ণ অ' এবং স্বরবর্ণ এ নামে আরও দুটি প্রবন্ধ লিখলেও ধ্বনির মধ্যাক্ষর বা শেষাক্ষরের নিয়ম অবধারণের অবসর' রবীন্দ্রনাথ আর পান নি। অবশ্য, তারও ছ বছর পর ভারতী (পৌষ ১৩০৫) পত্রিকায় প্রকাশিত 'বীমসের বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু কথা বলেন এবং স্মরণ করিয়ে দেন, 'বাংলার উচ্চারণতত্ত্ব ও বর্ণবিকারের নিয়ম বাঙালির দ্বারা যথোচিত আলোচিত হয় নাই।[৯] রবীন্দ্রনাথও আর এ-বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হননি। চব্বিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের নিয়ম ও সময়াভাবে বাহির করতে পারি নাই।' পরের ঊনষাট বছরে রবীন্দ্রনাথ সাধু-চলিত ভাষারীতি, বাংলা লেখ্য ভাষার বানান সংস্কার, ব্যাকরণ ইত্যাদি নিয়ে ভাবলেও উচ্চারণ বিষয়ে ভাববার ফুরসৎ পেয়েছেন বলে জানা যায়নি।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমা (১৯১৯) এবং ইন্দো আরিয়ান ফিললোজি (১৯২১) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ লিখে ডি লিট উপাধি লাভ করেন। তাঁর অ্যা ব্রিফ স্কেচ অব বেঙ্গলি ফনোটিক্স (১৯২১), দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলাপম্যান্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ (১৯২৬) এবং অ্যা বেঙ্গলি ফনেটিক রিডার (১৯২৮) গ্রন্থে তিনি প্রথম বাঙালি হিসাবে মাতৃভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক পূর্ণাঙ্গ ও সুশৃঙ্খল আলোচনা–গবেষণা করেন। বলা যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বাংলায় ধ্বনিতত্ত্বের তথা উচ্চারণ বিশ্লেষণের প্রথম দিশারী।[১০] দেশ বিভাগের (১৯৪৭) আগে-পরে বেশ কিছু বছর ভাষা সমস্যা নিয়ে রাজনৈতিক ডামাডোলে বাঙালির ভাষাবিজ্ঞান-ভাবনা বড় চোখে পড়ে না। এমনকি ভাষা আন্দোলনের (১৯৫২) পরেও ভাষাকেন্দ্রিক

জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত বাঙালি লৈখিক ভাষার বর্ণ ও বানান সংস্কারের মতো রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে-প্রতিবাদে সক্রিয় থেকেছেন বটে। তবে মৌখিক বা কথ্য ভাষার উচ্চারণের মতো সূক্ষ্মতর ভাবনা তাঁদের মধ্যে বিরল। এই বিরল ব্যক্তিত্ব ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)। তিনি ১৯৫২ তেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্বনিবিজ্ঞানে এমএ পাশ করেন। তাঁর সন্দর্ভটি প্রকাশিত হয় 'অ্যা ফনেটিক অ্যান্ড ফনোলোজিক্যাল স্ট্যাডি অব ন্যাজাল অ্যান্ড ন্যাশনালাইজেশান আব বেঙ্গলি' (১৯৬০) নামে। পরের বছরেই (১৯৬১) তিনি প্রবন্ধ ও গবেষণায় বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পান। এই সন্দর্ভ বাংলা ধ্বনিগুলো সম্পর্কে তিনি যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, সেগুলিই সাধারণভাবে প্রকাশ করেছেন 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' (১৯৬৪) বইটিতে। তিনি বুঝেছিলেন বাংলায় ধ্বনিবিজ্ঞানের যে অবস্থা, তাতে দুরূহ গবেষণাগ্রন্থের থেকে বেশি দরকার সহজপাঠ্য বিজ্ঞানসম্মত ধ্বনিবৈজ্ঞানিক বর্ণনা। আধুনিক উচ্চারণ বিজ্ঞানের কৌশল অবলম্বন করে তিনি বাংলা ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ স্থান নির্ণয় করেন।[১১] মাত্র ৫০ বছর বয়সে (৩জুন, ১৯৬৯) রেল লাইনে কাটা পড়ে অনেকটা জীবনানন্দ দাশের মত তাঁর জীবনাসান ঘটে। তাঁর প্রথম গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশের বছরেই ভাষাবিজ্ঞানের বিখ্যাত মার্কিন জার্নাল ল্যাঙ্গুয়েজ এ (জানুয়ারী-মার্চ ১৯৬০) প্রকাশিত হয় চার্লস এ ফার্গুসন (১৯২১-১৯৯৮) ও মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) রচিত 'দ্যা ফোনিমস অব বেঙ্গলি' প্রবন্ধ। মুনীর চৌধুরীও ৪৬ বছর বয়সে বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের মাত্র দু দিন আগে (১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১) শহিদ বুদ্ধিজীবী রূপে বিদায় নিলেন। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে মুনীর চৌধুরীর বাঙলা ধ্বনিমূল প্রবন্ধগ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হলেও, বাংলা মূল ধ্বনি নিয়ে ফোনিম তত্ত্ব অনুযায়ী আর কোনো অগ্রগামী কাজ এ পর্যন্ত হয়নি।[১২] অথচ ভাষাশিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই স্বীকার করবেন যে, ভাষায় ব্যবহৃত স্বর-ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অর্ধস্বর ও যৌগিক স্বরধ্বনির মূলধ্বনিগুলি চিনিয়ে দিতে পারলে শিশুর ভাষাধ্বনির ধারণার সঙ্গে শুদ্ধ উচ্চারণের চেতনাও জাগিয়ে তোলা যায়। তবে, সর্বপ্রথম বয়স্কদের নিজেদের ভাষাশিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করতে হবে।[১৩] বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের মাতৃভাষা-শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করতে তাদের মধ্যে শুদ্ধ উচ্চারণের চেতনা জাগিয়ে দিতে উচ্চারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিতে এগিয়ে এলেন নরেন বিশ্বাস। ছোটদের উপযোগী করে লিখলেন 'উচ্চারণ প্রসঙ্গ'। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত শিশু কিশোর সাহিত্য পত্রিকা 'ধানশালিকের দেশ' এ ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশিত হয়। অগ্রজ ধ্বনিবিজ্ঞানীর শনাক্ত করা বাংলা প্রমিত উচ্চারণগুলোকে প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রয়োগ করে উচ্চারণ অভিধান প্রণয়ন করলেন উচ্চারণশাস্ত্রী নরেন বিশ্বাস। বলা যায়, মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলাদেশে ধ্বনিবিজ্ঞানকে সহজপাঠ্য করেন, আর নরেন বিশ্বাস সেই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে বাঙালিকে প্রমিত উচ্চারণের ব্যাপারে সচেতন করতে উদ্যোগী হন।

নরেন বিশ্বাস প্রণীত 'বাংলা একাডেমী বাঙলা উচ্চারণ অভিধান' (১৯৯০) গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের 'মুখবন্ধ' (অক্টোবর ১৯৮৯) পাঠে জানা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগদানের সময় (১৯৭৬) থেকেই তিনি বিভিন্ন কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাঙলা উচ্চারণ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বাঙলা উচ্চারণ অভিধানের তীব্র অভাব অনুভব করেন। বাংলা ভাষার একাধিক প্রামাণ্য অভিধান থাকলেও উচ্চারণ অভিধান ছিল না। একমাত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (প্রথম প্রকাশ ১৯১৭, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ ১৯৩৭) এর ব্যতিক্রম হলেও, তাঁর সাংকেতিক চিহ্ন প্রযুক্ত শব্দের সংখ্যা এতো সীমিত যে তাতে কোনোমতেই প্রয়োজন মেটে না। অন্যদিকে, দীর্ঘদিনের ব্যবধানে অনেক শব্দের উচ্চারণও তখন বদলে গেছে। এছাড়া ধীরানন্দ ঠাকুর-সংকলিত বাংলা উচ্চারণ কোষ (১৯৫৪) এবং ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের 'বাংলা উচ্চারণ অভিধান' (১৯৬৮)-এ প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প শব্দের উচ্চারণ নির্দেশিত। অন্যদিকে, বাংলা উচ্চারণ কোষ (১৯৫৪)-এ বেশকিছু শব্দের ৬/৮টি বিকল্প উচ্চারণও অভিধানের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে।এ অবস্থায় বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থীগণের নিরন্তর জিজ্ঞাসাই নরেন বিশ্বাসকে সর্বপ্রথম উচ্চারণ অভিধান সংকলনে প্রাণিত করে।[১৪] স্বউদ্যোগে তিনি কয়েক বছরের (১৯৭৭-৮২) নিরলস শ্রমে দশ হাজার শব্দের একটি উচ্চারণ অভিধানের পান্ডুলিপি প্রস্তুত করে (১৯৮২) বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশের প্রস্তাব পাঠান। একাডেমির তখনকার মহাপরিচালক অভিধানটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে আর্ন্তজাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা (আই পিএ) তে উচ্চারণ নির্দেশের পরামর্শ দেন। প্রস্তাব অনুযায়ী আরও বৎসরাধিক কালের প্রবল পরিশ্রমে প্রায় ২০ হাজার শব্দের উচ্চারণ অভিধান (আই পিএ সহ)এর পান্ডুলিপি প্রস্তুত করে তিনি বাংলা একাডেমিকে জানান। পান্ডুলিপি পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটিও গঠিত হয় কিন্তু আর্ন্তজাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় অভিধান প্রকাশে নানাবিধ জটিলতা এবং অত্যাধিক অর্থ ব্যয়ের আশঙ্কায় হয়তো উচ্চারণ অভিধান

প্রকাশ পরিকল্পনা তখনকার মতো স্থগিত হয়ে যায়। বাংলা ভাষার ধ্বনি বৈশিষ্ট্য এবং এদের আই পি এ নিরূপণে বাঙালি ধ্বনিবিজ্ঞানীগণের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান।[১৫] এমনকি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বাংলা বানান অভিধান (২০০৮) এবং প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (২০১১) এ ব্যবহৃত আই পি এ পুরোপুরি একরকম নয়। অনুমান করা যায় সামরিক শাসনকালে মতানৈক্য আরও অধিক ছিল। এমনকি, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে পরিব্যক্ত নরেন বিশ্বাসের মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত তর্কাতীত নয়, বরং প্রতিবাদীর সংখ্যাই বেশি ছিল।[১৬] আর একারণেই হয়তো বাংলা একাডেমিতে উচ্চারণ অভিধান পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে, বা প্রকাশ স্থগিত থাকে দীর্ঘ দিন। অথচ, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার উন্নয়নে সরকার গঠিত বাংলা ভাষা কমিটি (১৯৮২) যে আটদফা সুপারিশ (১৯৮৩) পেশ করে তার অন্যতম ছিল বাংলা উচ্চারণ অভিধান প্রণয়ন করা।[১৭]

জাতীয় সম্প্রচার একাডেমী (বর্তমান নাম-জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউট) আয়োজিত প্রশিক্ষণে অতিথি বক্তা হিসেবে নরেন বিশ্বাসকে পেয়ে ওই প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক তাঁকে ৮/৯ হাজার শব্দের একটি উচ্চারণ নির্দেশিকা সংকলনের প্রস্তাব দেন ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে। নরেন বিশ্বাস জামিল চোধুরীর প্রস্তাবে সানন্দ-স্বীকৃতি জানিয়ে নয় মাসের মধ্যে ষোল হাজার শব্দের বাংলা উচ্চারণ নির্দেশিকার পান্ডুলিপি জমা দেন। এর কিছু শব্দের উচ্চারণ পরিবর্তন করে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (সম্পাদনা পর্ষৎ, আনিসুজ্জমান, ওয়াহিদুল হক, জামিল চোধুরী ও নরেন বিশ্বাস) নাম দিয়ে প্রকাশ করেছে (১৯৮৮)[১৮]। নরেন বিশ্বাসের এ বক্তব্যের সত্যতা মেলে মহাপরিচালকের লেখা বইটির 'ভূমিকায়' যা পূর্বে উল্লিখিত। জামিল চোধুরীর ভাষায়, 'আনিসুজ্জমান প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতির বিষয়ে যত্ন করেন। ওয়াহিদুল হক উচ্চারণ নির্দেশ এবং প্রতীক নির্ণয়ে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। মফিদুল হক এই অভিধান প্রকাশে সর্বাত্মক সহায়তা দিয়েছেন[১৯]। এতোটুকু অবদানের জন্য ইউনেসকো-র আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত অভিধানে আনিসুজ্জমান, ওয়াহিদুল হক ও জামিল চোধুরী বইটির সম্পাদক হতে পারেন কিনা তা পাঠকের বিবেচনার বিষয়। এমন হলে বাংলাদেশের সৌভাগ্য বলতে হয় যে, মনীন্দ্রকুমার ঘোষ, পবিত্র সরকার প্রমুখ এ অভিধানের পান্ডুলিপি পাঠ করে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু সম্পাদকত্ব দাবি করেন নি। তবে সংকলক নরেন বিশ্বাসকে ও চতুর্থ সম্পাদক রূপে উপস্থাপন যে তাঁকে অবহেলা সে কথা নিশ্চয় কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। অভিধানটিতে উল্লেখিত 'গ্রন্থপঞ্জি'তেও দেখা যায় মহাপরিচালক জামিল চোধুরীর সে সময় সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ বানান ও উচ্চারণ (১৯৮৫) ঠাঁই পেয়েছে, অথচ চার্লস এ ফার্গুসন ও মুনীর চোধুরী রচিত 'দ্য ফোনিমস অব বেঙ্গলি' প্রবন্ধের উল্লেখ নেই। আর নরেন বিশ্বাসের 'বাংলা উচ্চারণ' শীর্ষক কুড়ি পৃষ্ঠার প্রবন্ধ সংবলিত প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা (১৯৮৪) গ্রন্থটিও অবহেলিত অথবা অনুল্লেখ্য বিবেচিত হয়েছে অজ্ঞাত কোনো কারণে।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তাফা কামাল নরেন বিশ্বাসের প্রতি অবহেলা অপনোদনে অসামান্য অবদান রাখেন। দায়িত্ব-গ্রহণের অনতিকাল পরেই (১৯৮৬) তিনি উচ্চারণ অভিধান প্রকাশে নব পর্যায়ের সূচনা করেন। তিনিই পরামর্শ দেন, বাংলাভাষী ব্যাপক জনগণের স্বার্থে আই পি এ বাদ দিয়ে সহজ পদ্ধতিতে কেবল বাংলা বর্ণমালায় উচ্চারণ নির্দেশের। প্রস্তাব অনুসারে ত্রিশ হাজারের বেশি শব্দসংখ্যার উচ্চারণ অভিধানের পান্ডুলিপি প্রস্তুত করে নরেন বিশ্বাস জমা দেন সেপ্টেম্বর ১৯৮৭তে। পরের বছরের শেষের দিকে বাংলা একাডেমিতে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর মুদ্রণ কাজ শুরু হয় ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে। আর ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ এ আনিসুজ্জমানের ভূমিকা সংবলিত নরেন বিশ্বাস প্রণীত বাংলা একাডেমি বাংলা উচ্চারণ অভিধান পাঠকের হাতে পোঁছায়। প্রায় তের বছর ধরে (১৯৭৭-১৯৯০) উচ্চারণ অভিধান সংকলনের স্বীকৃতি পান নরেন বিশ্বাস। এর জন্য তিনি অবশ্য কোনো রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাননি। তবে বইটির ভূমিকা লেখক যেমন লেখেন,' 'কাজে লাগাটাই হবে গ্রন্থাকারের যথার্থ পুরস্কার।'[২০] সে পুরস্কার তিনি যথার্থই পেয়েছেন, বইটি বাঙালির কাজে লেগেছে এবং এখনও লাগছে। বিশ শতকের শেষ দশকেই বইটির একাধিক পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে-পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এমনকি জানুয়ারি ১৯৯৯ তে প্রকাশিত গ্রন্থটির পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রাসঙ্গিক যাবতীয় কাজও তিনি সম্পন্ন করে যান। আমাদের দুঃখ যে, সংস্করণটি তাঁর জীবিতাবস্থায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।[২১] নরেন বিশ্বাস ভাষার বহমান স্পন্দনকে আলিঙ্গন করেই বাংলাদেশের প্রমিত বাংলা কথ্য ভাষার বাচনভঙ্গির অনুসরণে উচ্চারণসূত্র আবিষ্কারে অগ্রসর হয়েছেন। এ কাজে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ আবদুল হাই এর নির্দেশিত পন্থাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে বাকশিল্পের

অবাধ বিকাশকে অভিনন্দন জানাতে সবসময় সূত্রশাসন মানেননি এবং বেশ কিছু শব্দের বিকল্প উচ্চারণকে ঠাঁই দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'আমাদের মূল লক্ষ্য যেহেতু বাংলাভাষা শিক্ষিত মানুষ এবং বাকশিল্পের অনুরাগী শিক্ষার্থীবৃন্দ, সেজন্য বাংলা বর্ণমালার সাহায্যে উচ্চারণ দেখিয়েছি। তবে উচ্চারণ প্রস্বর, ধ্বনিতরঙ্গের প্রকৃতি অর্থাৎ স্বরের সূক্ষ্ম বিভাজন কোথাও নির্দেশিত হয়নি। যোগ্যতর কোনো ব্যক্তি ভবিষ্যতে সে দায়িত্ব পালন করে বাংলা বাকশিল্পের উৎকর্ষবিধান করবেন বলে আশা করি।[২২] তেমন যোগ্যতর ব্যক্তি এদেশ আজও যে পায়নি, তা বলা বাহুল্য। তবে এটুকু বলা যায় যোগ্য ব্যক্তিত্বকে যথাযোগ্য সম্মান-সম্মাননা ব্যতীত যোগ্যতর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না। কেননা, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার কথায়, 'যে দেশে গুণীর কদর নেই সে দেশে গুণীর জন্ম হয় না।' তাই আমাদের বাকশিল্প তথা মুখের ভাষার বিশ্লেষণ ও প্রমিত প্রয়োগের তাগিদেই নরেন বিশ্বাসকে ধারণ করে তার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হওয়া, তাঁর আলোচনা আবশ্যক।

অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের নির্ধারিত সময়ের একযুগ আগেই তিপান্ন বছর বয়সে (১৯৯৮) প্রয়াত হন নরেন বিশ্বাস। তাঁর মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় উচ্চারণ প্রসঙ্গ (২০০০)। গ্রন্থটি ছোটদের জন্য লিখিত হলেও যাঁরা বাংলা ভাষা ও বাংলা শব্দ নিয়ে কাজ করেন তাঁদের জন্যও এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।[২৩] উচ্চারণের মতো প্রাত্যহিক অথচ অদৃশ্য জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণা করে উচ্চারণের নিয়ম আবিষ্কার করে উদাহরণ উল্লেখসহ প্রবন্ধ লিখে আর উচ্চারণ অভিধানে প্রয়োগ করেই থেমে থাকেননি নরেন বিশ্বাস। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি প্রশিক্ষণে কর্মশালায় প্রতিনিয়ত বক্তৃতা ভাষণে প্রমিত উচ্চারণ বাকশিল্পীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে শিক্ষিত সাধারণ জনগণকে সচেতন করতে সদা সক্রিয় ছিলেন। তাঁর উচ্চারণ বিষয়ক ভাষণগুলোও আকর্ষণীয়, ছন্দময় ও সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপিত। বাংলা উচ্চারণের মূল সমস্যাকে তিনি চিহ্নিত করেন এভাবে-বাংলা ভাষা উচ্চারণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রমিত উচ্চারণের ক্ষেত্রে সমস্যার জন্য আমি তোমাদের মূল পাঁচটি কারণের ব্যাখ্যা দিতে চাই। এই কারণগুলি হলো

১) বাংলা ভাষার লিখিতরূপের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে তার উচ্চারিতরূপ একই হয় না।

২) বাংলা ভাষার বর্ণ আছে একাধিক, কিন্তু তার ধ্বনি প্রতীক এক। আবার বর্ণ আছে একটি, কিন্তু তার ধ্বনি একাধিক।

৩) আমাদের উচ্চারণে প্রায়শ মহাপ্রাণ বর্ণগুলো অল্পপ্রাণ হয়ে যায়।

৪) আমাদের আঞ্চলিকতার সমস্যা।

৫) বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের দরদ ও আন্তরিকতার অভাব।[২৪]

এসব কারণে আমাদের শিক্ষিত লোকের মুখের ভাষাও ভুল উচ্চারণে কন্টকাকীর্ণ। তাঁর মতে, এজন্য আমাদের অবহেলা ও অযত্ন দায়ী। আর এই সমস্যা সংকট থেকে উত্তরণের উপায়ও তিনি সাবলীল ভাষায় বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট-নিরাবেগ ও যুক্তিনিষ্ঠ, আর বক্তব্যের অন্ত্যমিলযুক্ত চুম্বক অংশগুলো দর্শক শ্রোতাকে বিমুগ্ধ বিমোহিত করে রাখতো। এদিক দিয়ে তিনি একজন বাগ্মী অধ্যাপক। তাঁর ভাষায়—

এক, বাংলা ভাষার লিখিত রূপ এবং উচ্চারিত রূপ কোথাও এক নয়। কেন এক নয়, কীভাবে উচ্চারণ করতে হয়। এগুলো বুঝলে আর ভুল হওয়ার সম্ভবনা থাকবে না। এবং মূলের ভুল যদি দূর করা না যায় তাহলে কোনদিনই বিচিত্র বর্ণের ফুলও ফুটবে না।

দুই, বাংলা বর্ণমালায় আমরা বিস্ময়কর ভাবে লক্ষ করি, একাধিক বর্ণের ধ্বনিগত উচ্চারণ এক। বর্ণ আছে একটি, কিন্তু তাকে ঘিরে ধ্বনি একাধিক। তাহলে আমরা একই বর্ণের একাধিক উচ্চারণ লক্ষ করতে পারছি কি না, বল তোমরা। আবার বললেন, তোমাদের মতি যদি ঠিক থাকে, তবে গতিও ঠিক থাকবে, আর তাতে তোমাদের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে না বললেই চলে।

তিন, তোমাদের আমি দু'একটি ঘটনার কথা বলি তাতে তোমরা বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পাবে। একদিন রোকেয়া হলের সামনে দিয়ে আমি হেঁটে বাসার দিকে যাচ্ছিলাম। পরিচিত কয়েকজন ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হতেই জিজ্ঞেস করলাম তোমরা কী করছ? চট করে একজন বললো, স্যার 'আমরা' খাচ্ছি। আমি বললাম, ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের খেতে থাক। আমার বরং এখান থেকে চলে যাওয়াই শ্রেয়।.... অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে এর স্থলে যদি বলা হয় অন্দ হলে কি প্রলয় বন্দ থাকে তাহলে অবস্থা কোন পর্যায়ে যায় তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছো? ডাক্তার যদি নাড়ী ধরার পরিবর্তে নিত্যনতুন নারী ধরা শুরু করেন, তাহলে ডাক্তারী পেশা না, তাঁর জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে না ?

চার, আমি তোমাদের আঞ্চলিক ভাষাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করতে বলছি না। যখন তুমি মায়ের কাছে বা গাঁয়ে যাবে বা আঞ্চলিক কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তখন আঞ্চলিক ভাষাতে কথা বললে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যখন সবার জন্য বলবে বা সভাতে বলবে তখন আঞ্চলিক ভাষা পরিহার করবে। তবে একটি কথা তুমি যদি সারাক্ষণ পা টেনে হাঁটতে থাকো, তবে তোমার হাঁটার ঐ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে হঠাৎ তোমার হাঁটাহাটি সুন্দর করতে পারবে না। সুন্দর হাঁটার জন্য তোমাকে সব সময়ই সুন্দরভাবে পা ফেলার অনুশীলন করে যেতে হবে। ঠিক সেরকমই, প্রমিত ভাষার উচ্চারণ দক্ষতা অর্জনের জন্য বা উত্তরণের জন্য তোমাকে আঞ্চলিক ভাষার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষাকে বর্জন করে প্রমিত ভাষার উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার জন্য এর কোন বিকল্প নেই।

পাঁচ, এটি হলো আমাদের জাতীয় সমস্যা তোমাদের সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ ও মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যে সময় ব্যয় করে থাকো, মুখের ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সেই সময়টুকু ব্যয় করো কিনা, তা তোমরা হলফ করে বলতে পারবে ?একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা দেয়ার সময় অবলীলায় বলেছেন 'সনমানিত সবাপতি'। কিন্তু তিনি কি ইংরেজি বক্তৃতা দেবার সময় বলবেন, হনারেবল ফ্রেসিডেন্ট। কখনোই তিনি এমন ভুল করবেন না। কারণ তিনি ইংরেজি শেখেন। রপ্ত করেন, কিন্তু বাংলা তাঁর মাতৃভাষা হলেও এটি শেখার জন্য কোন গরজ অনুভব করেন না।[২৫]

নরেন বিশ্বাসের উচ্চারণ শেখানোর কোশল তুলে ধরার স্বার্থে দীর্ঘ উদ্ধৃতি পরিহার করা গেল না। এ উদ্ধৃতি পাঠে পাঠক অনুমান করতে পারবেন-এমন বক্তব্যের সাথে একজন বাগ্মী অধ্যাপকের বাচনভঙ্গী, একজন অভিনেতার অভিনয় আর গবেষকের গাম্ভীর্য মিলে কেমন আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো তাঁর উচ্চারণ শেখার ক্লাসরুম। ক্লাসে তিনি কেবল উচ্চারণের নিয়ম আর উচ্চারণই শেখাতেন না। প্রায় প্রতিটি ক্লাসের শেষে তিনি প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা প্রেমে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করতে বলতেন, তিনটি জিনিসের ঋণ জীবনে শোধ দেওয়া যায় না। তিনটি ম। একটি হল মা, একটা হল মাটি, এবং আর একটি হল মাতৃভাষা। মা আমাদের জন্ম দেয়, মাটি আমাদের লালন করে আর মাতৃভাষা আমাদের প্রকাশ করে। আসলে আত্মপ্রকাশের জন্য মাতৃভাষার কোন বিকল্প নেই। ভাষা ভাল বললে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। কিন্তু সেটাতো এমনি এমনি ঘটবে না। তার জন্য বারংবার অনুশীলন করতে হবে। কিছু পেতে হলে তোমাকে কিছু দিতে হবে। প্রেম কখনো একতরফা হয় না। তবে তিনি মাতৃভাষা প্রেমে অন্ধ-আবেগপ্রবণ ছিলেন না মোটেই। মানুষের মুখের জীবন্ত ভাষার বহমানতা ও পরিবর্তনশীলতাকে তিনি সবসময় সমুচিত মূল্যায়নে প্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি বলতেন, সূত্রমতে আমরা এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত কে নিশ্চিতো ই বলবো। কিন্তু এখন অনেকেই নিশ্চিত বলছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। হয়তো এমন একদিন আসবে, যখন মুখের ভাষার গতিময়তা নিশ্চিতো কে নিশ্চিত্, স্থগিতো কে স্থগিত্ করে ফেলবে। তখন আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না। ভাষার বদলে যাওয়াকে মেনে নিলে ও মাতৃভাষাকে অবহেলা মেনে নিতে পারেননি বলেই কি বাংলা উচ্চারণ অভিধান পরিমার্জন পরিবর্ধন আর প্রমিত উচ্চারণের প্রশিক্ষণে এতোটাই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন যে শরীর সে ধকল নিতে পারেনি। তাঁর ভাষায়, শরীরের উপর বেশি ধকল গেলে তো তাড়াতাড়ি বিকল হবেই। এতো হল একটি যন্ত্র। কেবল মন্ত্র দিয়ে তো আর চালানো যায় না। আরাম যদি হারাম হয়, ব্যারামতো তখন ধরবেই।[২৬] ব্যারাম ব্যক্তি নরেন বিশ্বাসকে নিয়ে গেলেও তাঁর মননশীল সৃষ্টিকর্ম আমাদের কাছে রয়েছে। তাঁর কর্মের মূল্যায়নেই তিনি মূল্যায়িত হবেন, কর্মের মাঝেই বেঁচে থাকবেন।

এবার তিনি কতটুকু মূল্যায়িত আর কতটুকু অবহেলিত সে প্রমাণ উপস্থাপন করা যাক। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে বিগত ৩০ এপ্রিল ১৯৯৩ তারিখে সোসাইটির অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' শীর্ষক সেমিনারের সমাপ্তি অধিবেশনে অধ্যাপক দানীউলহক বাঙালির উচ্চারণ চিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সে প্রবন্ধে তিনি আধুনিক যুগের বাঙালির উচ্চারণ সংক্রান্ত অনুভাবনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেন এবং পরিশিষ্ট খ তে 'আশির দশক থেকে বাংলাদেশে প্রকাশিত বাংলা উচ্চারণ (১৯৮৪) প্রবন্ধের প্রসঙ্গ কোথাও পাওয়া যায় না। হতে পারে এটি অধ্যাপকের অগোচরে রয়ে গেছে, অবহেলা নয়। তবে মূল প্রবন্ধের 'উচ্চারণের প্রায়োগিক প্রসঙ্গ' অংশে মুহাম্মদ দানীউল হক 'অপূর্ণাঙ্গ' তিনটি বাংলা উচ্চারণ অভিধানের প্রসঙ্গে লেখেন 'অনুরূপ সর্বশেষ প্রকাশনার কৃতিত্ব বাংলা একাডেমীর। একাডেমী প্রকাশিত নরেন বিশ্বাসের বাংলা উচ্চারণ অভিধান (১৯৯০) প্রণয়ন কাজে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁরা প্রায় অভিন্ন ব্যক্তিবর্গ (আনিসুজ্জমান, সনজিদা, খাতুন,হায়াৎ মামুদ, জামিল চোধুরী, নরেন বিশ্বাস এবং ওয়াহিদুল হক) উচ্চারণের নিয়ম সম্পর্কে মতৈক্য প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছেন, কিন্তু

ব্যতিক্রম সম্পর্কে মতান্তর/মতপার্থক্য মেটাতে পারেননি।[২৭] প্রথম কথা, সর্বশেষ বাংলা উচ্চারণ অভিধানটি বাংলা একাডেমি প্রকাশ করলেও এটি নরেন বিশ্বাসের একক কাজ। আর পরের বাক্য পাঠে যে কোনো পাঠকের মনে হতে পারে গণমাধ্যম ও একাডেমির অবহেলা অপনোদনের এ চেষ্টাও অস্পষ্ট হয়ে ওঠে অভিজ্ঞ অধ্যাপকের আন্তর্জাতিক সেমিনারে পঠিত ও পরে প্রকাশিত প্রবন্ধে। অবশ্য, অধ্যাপক মুহম্মদ দানীউল হকের মতো বাংলাদেশের স্বীকৃত ভাষাবিজ্ঞানীরা এমন ভুল হবার কথা নয়। অনুমান করি, প্রায় অভিন্ন ব্যক্তিবর্গ পদবন্ধে বহুবচন প্রয়োগ করে তিনি ইঙ্গিতে একবচন বা একব্যক্তির কাজকেই নির্দেশ করেছেন।

বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান এর পরিমার্জিত সংস্করণে (২০০০) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো প্রায় প্রতিটি ভুক্তিতে তৃতীয় বন্ধনী ব্যবহার করে উচ্চারণ দেখানো। এটিই তখনকার সময়ে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বাংলা অভিধান, যাতে শীর্ষশব্দের উচ্চারণটি পাওয়া যায়। তবে এখানে নরেন বিশ্বাস অবহেলিত নন। কেননা অভিধানের সহযোগী সম্পাদকের ভাষায় : 'উচ্চারণ নির্দেশের কাজে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত নরেন বিশ্বাস প্রণীত বাংলা একাডেমী বাংলা উচ্চারণ অভিধান ২য় সংস্করণ থেকে ব্যাপক সাহায্যে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলা উচ্চারণ বিষয়ক সূত্রসমূহের জন্য উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।[২৮] এখানে নরেন বিশ্বাস স্বীকৃত এবং তাঁর সৃষ্টিকর্ম আদর্শ হিসেবে গৃহীত। অন্যদিকে জামিল চোধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত বাংলা একাডেমী বাংলা বানান অভিধান (১৯৯৪) গ্রন্থটিতে প্রথমে শুধু বানান এবং প্রথমবন্ধনীতে পদনাম উল্লেখ ছিল। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণে (২০০১) সংযোজিত হয় আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি (আই পি এ) তে বাংলা শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ। আই পি এ (ধ্বনিলিপির) ব্যবহার বাংলাদেশের কোনো বাংলা অভিধানে এই প্রথম।[২৯] অথচ ১৯৮৪ তে প্রকাশিত হলে নরেন বিশ্বাস প্রণীত বাংলা উচ্চারণ অভিধান সে গৌরব পেতে পারত। বানান অভিধানের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণে (২০০৮) পৃথকভাবে বাংলায় উচ্চারণ নির্দেশ সংযোজিত হয় আর বর্জিত হয় পদনাম। এই সংস্করণে আরও বর্জিত হয় 'গরু', 'শহীদ' ইত্যাদি বহুল ব্যবহৃত বাংলা বানান, সংযোজিত হয় 'ইদ' ইত্যাদি বিকল্প বানান। বানান আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় নয় বলে সে প্রসঙ্গে যাচ্ছিনে। বানান অভিধানের 'সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি'তে গণমাধ্যম ইনসটিউট এর ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (২০০০) এর উল্লেখসহ আরও নয়জন অভিধানকারের নামসহ অভিধানের নাম থাকলেও নরেন বিশ্বাসের নাম নেই। এমনকি কৃতজ্ঞতা স্বীকারপত্রেও নেই নরেন বিশ্বাসের নাম। একই অবস্থা জামিল চোধুরী সম্পাদিত বাংলা একাডেমী আধুনিক বাঙলা অভিধান (২০১৬) গ্রন্থেও। এ অভিধানে আই পিএ এর পরিবর্তে বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করে উচ্চারণ দেখানো হয়েছে। এ গ্রন্থের সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিতে ব্যবহারিক বাংলা অভিধানও বর্জিত হয়ে সংযুক্ত হয়েছে সম্পাদকের সংকলিত বাংলা একাডেমী বাংলা বানান অভিধান। আবার বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (২০১১) গ্রন্থের কোথাও এমনকি আলোচিত 'অভিধান সংকলন' অংশেও নেই নরেন বিশ্বাসের নাম।[৩০] এভাবে বাংলা একাডেমির বইয়ে একদিকে বর্জিত হন নরেন বিশ্বাস আরেক দিকে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ও বাংলা একাডেমি থেকে পুর্নমুদ্রিত হয় নরেন বিশ্বাস প্রণীত বাংলা উচ্চারণ অভিধান। অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না যে, আমরা অনেকেই নরেন বিশ্বাসকে অবহেলা করতে চাই কিন্তু তাঁর অভিধানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারিনা। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত আরও তিনটি অভিধানে বাংলা উচ্চারণ সংযোজন হলেও নরেন বিশ্বাসের বাংলা উচ্চারণ অভিধান পাঠকপ্রিয়তা কিংবা প্রয়োজনীয়তা হারায়নি।

বাংলা উচ্চারণ বিষয়ক গবেষণা-প্রয়োগ নরেন বিশ্বাস চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন সে দাবিও তিনি করেন নি। তবে তিনি যে বাংলা ধ্বনিশাস্ত্রকে বাঙালির মুখের ভাষায় প্রয়োগের সফলতা দেখিয়েছেন সেই ধারা এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁকে স্বীকার করে তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করলেই বরং বাংলা ব্যাকরণের অনেকটা অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করবার পথে অগ্রসর সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের দেবযানী কচকে আভিশাপ দিয়ে বলেছিল, ''যে বিদ্যার তরে/মোরে করো অবহেলা সে বিদ্যা তোমার/ সম্পূর্ণ হবে না বশ তুমি শুধু তার/ভারবাহী হয়ে রবে,করিবে না ভোগ/ শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।'' আমরা সেই ভাষাতাত্ত্বিকের প্রতীক্ষায়ে ছিলাম। যিনি কোনো এক দেবযানীর অভিশাপকে অতিক্রম করে তার বিদ্যাকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন বাংলা ভাষার কাঠামো নির্মাণে।[৩১] ধ্বনিশাস্ত্রী নরেন বিশ্বাসকে সেই প্রতীক্ষিত পন্ডিত মনে হয়, তিনি বাংলা ধ্বনিশাস্ত্র শিখেছেন, শিখিয়েছেন এবং তা প্রয়োগ করে উচ্চারণ অভিধান প্রণয়ন করেছেন। কারো নিশ্চয় বলতে দ্বিধা নেই যে, কার্যত বাংলাদেশে বাংলা ভাষা আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সে লক্ষ্যে প্রয়োজন একটি সুনির্দিষ্ট ভাষানীতির আলোকে ভাষা পরিকল্পনা।

ভাষা পরিকল্পনার দুটো দিক ১) অবস্থান পরিকল্পনা ২) অবয়ব পরিকল্পনা। প্রথমটি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয় আর দ্বিতীয়টি ভাষাবিজ্ঞানের। ভাষার অবয়ব বা কাঠামোর দুটো দিক লৈখিক ও মৌখিক। মৌখিক ভাষার কাঠামো পরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ আজ সময়ের দাবি। নরেন বিশ্বাসের কাঠামোকে ভিত্তি করে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলা ভাষার অভিধানের একটি ইলেকট্রনিক সংস্করণ বা ই বুক প্রকাশ প্রয়োজন যেখানে প্রতিটি শব্দের বানান অর্থের পাশাপাশি উচ্চারণও শোনা যাবে। এতে করে নরেন বিশ্বাসের প্রতিও সম্মান জানানো যাবে, আর প্রমিত বাংলাভাষার কাঠামোও প্রতিটি বাঙালির মুঠোফোনে পৌছে দেওয়া যাবে সহজেই।

তথ্যসূত্র :

১. শামসুজ্জমান খান ও অন্যান্য (সম্পাদিত) 'চরিতাভিধান', ঢাকা বাংলা একাডেমি, ২০১১, পৃ-২৮৪

২. আনিসুজ্জমান, ভূমিকা, 'বাঙলা উচ্চারণ আভিধান', (নরেন বিশ্বাস), ঢাকা বাংলা একাডেমি ১৯৯০, পৃ-১১

৩. হুমায়ুন আজাদ, ভূমিকা, 'প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা', (নরেন বিশ্বাস) ঢাকা, অনন্যা ১৯৮৪, পৃ-১৪।

৪. জামিল চোধুরী, ভূমিকা, 'ব্যবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান', (আনিসুজ্জমান প্রমুখ সম্পা) ঢাকা জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউট, ১৯৮৮ পৃ-১৫।

৫. শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), 'চরিতাভিধান', ঢাকা বাংলা একাডেমি, ২০১১ পৃ-২৮৪।

৬. শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি, 'বেঙ্গলি স্পোকেন অ্যান্ড রিটেন', অনু মোহাম্মদ আজম, বাংলা ও প্রমিত বাংলা সমাচার, ঢাকা প্রথমা প্রকাশন, ২০১৯, পৃ-১৮৯।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', কলকাতা বিশ্বভারতী, ১৯৮৪, পৃ-১৭

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', কলকাতা বিশ্বভারতী, ১৯৮৪, পৃ-২০।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', কলকাতা বিশ্বভারতী, ১৯৮৪, পৃ-৬০।

১০. মহম্মদ দানীউল হক, 'বাঙালীর বাঙলা উচ্চারণ সংক্রান্ত চিন্তা', ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, বাঙালীর বাঙলাভাষা চিন্তা, মনসুর মুসা (সম্পা), ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৪ পৃ-১১৫।

১১. হুমায়ুন আজাদ, মুখবন্ধ, 'মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী' (খন্ড-৩), ঢাকা বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪, পৃ-আট।

১২. মনসুর মুসা,'সম্পাদকের ভূমিকা', 'চার্লস ফার্গুসন ও মুনীর চোধুরী', বাঙলা ধ্বনিমূল, (অনু, কাজী মাহবুব হোসেন), ঢাকা নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০, পৃ-৬।

১৩. সনজীদা খাতুন, 'অনুবাদের কথা', চার্লস ফার্গুসন ও মুনীর চোধুরী, বাঙলা ধ্বনিমূল, (অনু কাজী মাহবুব হোসেন), ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০, পৃ-৮।

১৪. নরেন বিশ্বাস, 'মুখবন্ধ', 'বাঙলা উচ্চারণ অভিধান', ঢাকা বাঙলা একাডেমি, ১৯৯০, পৃ-১৩।

১৫. শ্যামলকান্তি দত্ত, 'সিলেটের উপভাষা, ব্যাকরণ ও অভিধান', ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০১৮, পৃ-৪২৭।

১৬. হুমায়ুন আজাদ, 'ভূমিকা', 'প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা', (নরেন বিশ্বাস), ঢাকা অনন্যা, ১৯৮৪, পৃ-১৪।

১৭. সাখাওয়াৎ আনসারী, 'বাংলা ভাষা পরিকল্পনা', প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (২য় খন্ড), (রফিকুল ইসলাম প্রমুখ সম্পাদিত), ঢাকা বাংলা একাডেমি, ২০১১, পৃ-২৮৫।

১৮. নরেন বিশ্বাস,' মুখবন্ধ', 'বাঙলা উচ্চারণ অভিধান', ঢাকা বাংলা একাডেমি, ১৯৯০ , পৃ-১৪।

১৯. জামিল চোধুরী, 'ভূমিকা', 'ব্যবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান', (আনিসুজ্জমান প্রমুখ সম্পা), ঢাকা জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউট, ১৯৮৮, পৃ-১৫।

২০. আনিসুজ্জমান,' ভূমিকা' 'বাঙলা উচ্চারণ অভিধান', (নরেন বিশ্বাস),ঢাকা বাংলা একাডেমি, ১৯৯০ পৃ-১১।

২১. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'দ্বিতীয় সংস্করণের 'প্রসঙ্গ কথা, বাঙলা উচ্চারণ অভিধান', (নরেন বিশ্বাস), ঢাকা বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯, পৃ-০৫।

২২. নরেন বিশ্বাস, 'মুখবন্ধ', 'বাঙলা উচ্চারণ অভিধান', ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯০, পৃ-১৫।

২৩. অসীম সাহা, 'ভূমিকা', 'উচ্চারণ প্রসঙ্গ', (নরেন বিশ্বাস), ঢাকা, অনন্যা, ২০০০, পৃ-০৬।

২৪. নরেন বিশ্বাস, 'শুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ক বক্তৃতা', Promito Bangla www.promitobangle.com ২৮মে, ২০১৮।

২৫. নরেন বিশ্বাস, 'শুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ক বক্তৃতা', Promito Bangla www.promitobangle.com ২৮মে, ২০১৮।

২৬. নরেন বিশ্বাস, 'শুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ক বক্তৃতা', Promito Bangla www.promitobangle.com ২৮মে, ২০১৮।

২৭. মহাম্মদ দানীউল হক, 'বাঙালীর বাঙলা উচ্চারণ সংক্রান্ত চিন্তা, ঐতিহাসিক পর্যালোচনা', 'বাঙালীর বাঙলাভাষা চিন্তা, মনসুর মুসা, (সম্পা), ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৪,-১২০

২৮. স্বরোচিষ সরকার, 'পরিমার্জিত সংস্করণের মুখবন্ধ ও ব্যবহারবিধি, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান', ঢাকা বাংলা একাডেমি, ২০০০, পৃ-২৩।

২৯. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'দ্বিতীয় সংস্করণের প্রসঙ্গ কথা', বাংলা বানান অভিধান, (জামিল চোধুরী), ঢাকা, বাংলা একাডেমি ২০০১, পৃ-০৯।

৩০. সাখাওয়াৎ আনসারী, 'বাংলা ভাষা পরিকল্পনা', প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (২য় খন্ড), (রফিকুল ইসলাম প্রমুখ সম্পাদিত), ঢাকা বাংলা একাডেমি, ২০১১, পৃ-২৮২।

৩১. রাজীব হুমায়ুন 'বাঙালীর বাঙলাভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত চিন্তা', ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, বাঙালীর বাঙলা ভাষা চিন্তা, মনসুর মুসা (সম্পা), ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৪, পৃ-১৩৭।

নিষ্ঠুরতা একটি মানবিক বিপর্যয়

সুবল দত্ত

ডিসেম্বর ২০০৬। দিল্লির নয়ডা সেক্টর একত্রিশের একটি ছোটো গ্রাম নিঠারি। সেখানে বাস করত এক কোটিপতি নরপিশাচ ও তার নরখাদক চাকর। মনিন্দর সিং পান্থের ও সুরেন্দর কোলি। গ্রামের নয় থেকে বারো বছরের মেয়েদের একে একে ভুলিয়ে ফুসলিয়ে ঘরে এনে নির্মমভাবে ক'দিন ধরে ধর্ষণ করত। পরে খুন করে কেটে কেটে তাদের কোমল মাংস ফ্রিজে রাখতো ও একটু একটু করে রান্না করে খেত। তারা ধরা পড়েছে এবং এ যাবত সতেরোটি খুন সাব্যস্ত হয়েছে। এই ক'দিন আগে চাকরটির ফাঁসির হুকুম হয়েছে। মালিকটি এখনো টাকার জোরে বহাল তবিয়তে।

যারা এই লেখাটি পড়ে ঘৃণা ভয় ও আতঙ্কে শিউরে উঠছেন, ভাবুন তো, তার চেয়ে কত শতগুণ পৈশাচিক আনন্দ পেত ওই মালিক ও চাকরটি? এইরকম উদাহরণ মধ্যযুগে অসংখ্য ছিল। ব্রামষ্টকারের ড্রাকুলা কেউ কেউ নিশ্চয় পড়েছেন। গল্প হলেও কাউন্ট ড্রাকুলা একজন সত্যিকারের ভয়ানক ক্রূর কাউন্ট বা জমিদার ছিলেন। এতো শয়তান ছিলেন যে মারা যাবার পর তাঁকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল সেখানের ত্রিসীমানা কেউ মাড়াত না। এই বুঝি কবর থেকে উঠে এসে ঘাড় মাটকাবে। এতো গেল পৈশাচিকতার কথা। চিনের ছয় কোটি মানুষকে হত্যা করিয়েছিল চেঙ্গিস খান। হিটলারের গোষ্টাপো দল ইহুদীদের মেরে পেট থেকে চর্বি বের করে মোমবাতি তৈরি করত। রোমনগরী আগুনে দগ্ধ করে হাজার মানুষের চিকার আর্তনাদ শুনতে শুনতে অত্যাচারী নিরো ম্যাণ্ডলীন বাজাচ্ছিল। এইসব শয়তানী ও বর্বরতার উদাহরণ। এইরকম অনেক উদাহরণ আছে খুনী ধর্ষক ও নিষ্ঠুরের উদাহরণ। আপনি যে নামই ধরুন এইসবই নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পড়ে।

মুঘল বংশের রক্তেই ছিল ক্ষমতার জন্য যেকোনো সীমা লঙঘন করে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতামূলক আচরণ। শাহজাহান যৌবনে পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, জাহাঙ্গীর করেছিলেন তার পিতা আকবরের বিরুদ্ধে। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশি ছিল এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলেন যথেষ্ট দক্ষ। তাই বলা যায় প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদকে সার্থক প্রমাণ করেই আওরঙ্গজেব নিজেকে তুলনামূলক যোগ্যতর নিষ্ঠুর হিসাবে উপস্থাপন করেন এবং সম্রাট পদবীটি অর্জন করেন। উত্থান হয় এক নতুন একটি নিষ্ঠুর সম্রাটের, যে শুধু বংশসূত্রে নয় কর্মসূত্রেও ক্রূর ও অত্যাচারী। নিষ্ঠুরতা দুরকমের। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নিষ্ঠুরতা। কারো পৈশাচিক আচরণ, অনায়াসে নিষ্ঠুরভাবে খুন ও ধর্ষণ করার প্রবণতা, সিরিয়াল কিলিং, স্ত্রীর প্রতি বাচ্চা ও অপেক্ষাকৃত কমজোর মানুষকে মানসিক ও শারীরিক পীড়া দেওয়া প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুরতা। এরমধ্যে কচি শিশুকন্যা ও নারীর প্রতি বিকৃতকাম ও অস্বাভাবিক পশু আচরণ, ক্রুরতা, অপার ক্রূরতা, মানসিক ক্রূরতা দৃষ্টান্তমূলক অঙ্গহানি করা বা পঙ্গু করে দেওয়া এইসব প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুরতা উদাহরণ। কেবলমাত্র নিষ্ঠুরতায় পৈশাচিক সুখ হয় এরকম কষ্টসুখকে ইংরাজিতে বলে স্যাডিজম, ম্যাসোকিজম। বাংলায় ধর্ষকাম ও মর্ষকাম বলা যায়। কিন্তু এদের সেই অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করলে গণ্ডি ছোট হয়ে যায়। আর একটি টার্ম আছে। যে পুরুষ যৌনতায় অক্ষম তার ফলে সে যখন চরম নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে তখন তার সেই নিষ্ঠুরতাকে বলা হয় sadomasochism। ব্যক্তিগত নিষ্ঠুরতার উদাহরণ, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, অফিসের অধস্তনের প্রতি উচ্চপদের, চাকরের প্রতি কর্তার, পশুদের প্রতি এবং অজস্র উদাহরণ। ম্যাসোকিজম এর আসল অর্থ হল যে নিজেরই শারিরীক যন্ত্রণা মনে প্রাণে চায় এবং যন্ত্রণাতেই তার চরম আনন্দ। নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত প্রাচীনকাল থেকেই আছে। আমাদের পুরাণে কংসের সদ্যজাত শিশুদের পাথরে আছড়ে নৃশংস খুন, যীশুখৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ। এসব আর মনে আবেগ জাগায় না। কেননা নিষ্ঠুরতা আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে।

১৯৪৫ এর আগস্টে হিরোশিমা নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের কথা আমরা সবাই জানি। তখনকার সময়ে প্রায় দেড়লাখ মানুষ মারা গেছে। এই জেনোসাইডের পরবর্তী পর্যায়ে অগণিত ক্যানসারগ্রস্ত মানুষের দুর্দশার কথা আমরা জানি। এই নিষ্ঠুরতা হল পরোক্ষ। কয়েকজন মানুষ নিজেদের রাষ্ট্রের পরাজয়ের আশঙ্কাতে এবং অসহিষ্ণুতাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই পাশবিক সিদ্ধান্ত একজনের নয়। আবার ওই দেশেরই মানে জাপানীদের সেই সময়ের আগেকার হিংস্রতার কথা কারো অজানা নয়। হিংস্রতা ও হৃদয়হীনতা সামুরাইদের জীবনের অঙ্গ ছিল। নিজেদের পেট চিরে আত্মহত্যা হারিকিরি সবাই জানে। এই নিষ্ঠুর ভয়াল দেশজ পরোক্ষ নিষ্ঠুরতা সামুরাইদের সভ্যতা ছিল।

পৃথিবীর সব প্রাচীন শাসকরাই ছিলেন নিষ্ঠুর ও কসাই। অতীতে শাসকদের মধ্যে কে কত ধরনের নিষ্ঠুরতা দেখাতে পারে তার একটা প্রতিযোগিতা চলত। একজন অত্যাচারী ইউরোপিয়ান সম্রাট প্রতিটি আক্রমণ ও বিজয় বীভস ধ্বংসলীলা ও নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে হত। এই জন্যে ইউরোপীয় ইতিহাসে তাকে 'ঈশ্বরের অভিশাপ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কোনো দেশ দখল করার পর তিনি পরাজিত সম্রাটের কাউকেই বাঁচিয়ে রাখতেন না। এমনকী শিশুদেরও না। জ্যান্ত শিশুদের বুক চেরা দেখতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। সেই সঙ্গে ভালোবাসতেন শিশুদের টকটকে কলিজা তার প্রিয় চিতাদের খাওয়াতে।

জোসেফ স্ত্যালিনকে ধরা হয় বিংশ শতাব্দীর কুখ্যাত গণহত্যাকারী হিসাবে, যে তালিকায় হিটলার এবং মাও সে-তুংও আছেন। এই কুকর্মটি করিয়েছিলেন জেল অভ্যন্তরে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত এক্সটারমিনেশন ক্যাম্পের মাধ্যমে। ধারণা করা হয় ইউক্রেনে প্রায় দশ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করেন স"্যালিন। এই দশমিলিয়নের মধ্যে দুই মিলিয়ন হল দুর্ভিক্ষ পিড়িত ইউক্রেনিয়ান কৃষক। হিটলারের নাজি বাহিনী কর্তৃক ইহুদিদের ইউরোপ মহাদেশে অবাঞ্চিত ঘোষণার প্রেক্ষিতে প্রায় ১১ মিলিয়ন হত্যা সংগঠিত হয়েছিল যার অর্ধেকই ছিল ইহুদি। হিটলারের প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল- ইউরোপিয়ান ইহুদি, সমকামী, মানসিক রোগী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নির্মূল করে একটি বিশুদ্ধ জার্মানি তৈরি করা, যেখানে কেবল আর্য জাত কর্তৃত্ব করবে। এই পরিকল্পনা সার্থক করার উদ্দেশ্যে হিটলারের গ্যাস চেম্বার তৈরি এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তো সবাই জানে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে আনুমানিক ত্রিশ লক্ষ গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল বাঙালিদের স্বাধীকারের দাবিকে চিরতরে নির্মূল করতে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এই কাজে যুক্ত ছিল। দীর্ঘ নয় মাসের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে, দুই লক্ষ থেকে চার লক্ষ বাংলাদেশী মহিলাকে তারা পরিকল্পিতভাবে ধর্ষণ করে।

এইসব গণহত্যা শুধু যে রাজনৈতিক কারণে সংগঠিত হয়েছে তা নয়, বরং ব্যক্তিস্বার্থ, লোভ, ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ এবং মানসিক বিকৃতিও এর অন্যতম কারণ। এরা শুধু অন্য দেশেরই নয় নিজের দেশের, নিজের সম্প্রদায়ের লোকগুলোকেও হত্যা করেছে নির্মম ভাবে। এই সবই পরোক্ষ নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পড়ে।

আত্মহত্যার প্ররোচনা একটি পরোক্ষ নিষ্ঠুরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অধুনা মোবাইলে একটি সাইবার গেম ব্লু হোয়াল বা নীল তিমি খেলায় প্রচুর যুবক আত্মহত্যা করেছে। খেলাটিই এমন, যে শেষ পর্যায়ে তাকে বাধ্য হতে হয় মৃত্যুবরণ করতে। আশ্চর্য হতে হয়, সে কেমন শয়তান, যে নিজেকে গুপ্ত রেখে তার পৈশাচিক আনন্দ চরিতার্থ করতে কাউকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। কর্মক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত অবহেলাতে কত মানুষ মারা যায়, কত মানুষের জীবন সংশয়, কত মানুষের সংসার রসাতলে চলে যায়, কত মানুষের জীবনধারা অন্য খাতে বয়ে যায়। সেই ইচ্ছাকৃত অবহেলা একধরনের পরোক্ষ নিষ্ঠুরতা। তার হয়তো সামাজিক আদালতে শাস্তি হয়না কিন্তু আজীবন নিজেরই অন্তরে আত্মিক লড়াইতে তাকে কুরে কুরে খায় সেই অবহেলা। কোনো দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে আহতকে দেখতে দেখতে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া বা তাকে না বাঁচাবার চেষ্টা করে ভাইরাল করতে ছবি তোলা এসব

পরোক্ষ নিষ্ঠুরতার মধ্যে পড়ে।

কোনো কোনো সাম্যবাদী আন্দোলনের পরিশীলিত প্রতিহিংসা নীতিভ্রষ্ট অসফল হয়ে পড়লে শুধুমাত্র নিষ্ঠুরতা ছড়িয়ে পড়ে মানব সমাজে। সেই নিষ্ঠুরতা পরম্পরাগত নীতিহীন হয়ে ব্যানারকে হাতিয়ার করে কিছু মানুষ জীবিকা করে নেয় এবং হয়তো শোষক শ্রেণীর হাতিয়ার হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য লড়াই ও নিষ্ঠুরতা শেখায়। যেকোনো উপায়ে অন্যকে অবদমিত করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার খুনখার লোভ লালসা মানুষকে এমন নিষ্ঠুর করে তোলে যার উদাহরণ ইতিহাস সমাজ ও এখন সংবাদের পাতায় পাতায়।

ভিন দেশের মানুষ যখন অন্যদেশে রিফিউজি হয়ে আসে তখন তার মানবিক মূল্যায়ন না করে তার ওপর পশুতুল্য ব্যবহার করা হয়। চোখের সামনে নিষ্ঠুর ভাবে নির্যাতিত হতে দেখে প্রচুর মানুষ উল্লসিত হয়। এও একধরনের পরোক্ষ গণনিষ্ঠুরতা। এর ভাবী প্রতিক্রিয়া ভয়ানক হয়।

আজকাল বেশিরভাগ টিভি নিউজ চ্যানেলে সংবাদপত্রে, ভাইরেলে, সিনেমা ও সিরিয়ালগুলিতে হিংসা প্রতিহিংসা নিষ্ঠুরতা চরমে। এখনকার সিনেমাগুলি অধিকাংশই ভায়োলেন্সে ভরা। এখন সাউথইন্ডিয়ান সিনেমাগুলি প্রযুক্তির সুযোগে ডাবিং হচ্ছে বাংলায়। সেগুলি প্রচুর মানুষ বিনোদনের নামে নিষ্ঠুরতা শিখে নিচ্ছে। বাচ্চাদের ভিডিও গেমগুলি ও গ্রাফিক ভাইওলেন্স তো জন্ম থেকেই নিষ্ঠুরতা ঘিলুর ভিতরে পুরে দিচ্ছে। যেহেতু সিনেমা সিরিয়ালে নিষ্ঠুরতা পাবলিক পছন্দ করে তাই বিনোদন ও সংবাদের মাধ্যমে মুনাফাখোর প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের মস্তিষ্ক বিবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিষ্ঠুরতার পরোক্ষ শিকার হওয়া মানুষ মানসিক ও আবেগজনিত সমস্যায় ভুগে। যে ভাবেই হোক, সমাজ এখন আমাদের অনেক রকমের নিষ্ঠুরতা শেখাচ্ছে। নিষ্ঠুরতা এখন একটি শিল্প সংস্কৃতির অঙ্গ। সামাজিক পরিবেশ আমাদের প্রশ্রয় দেয় কি ভাবে আমরা নিষ্ঠুর হই।

ইদানিং বেড়েছে নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতা। সারা পৃথিবী জুড়ে বিগত দুবছর ধরে অসংখ্য নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। যার মধ্যে ধর্ষণের পর হত্যাকাণ্ডের শিকার, আত্মহত্যা, যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার, হত্যা, আর প্ররোচিত আত্মহত্যা রয়েছে। পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন অনেকে।

গরু বা ছাগলের মতো গৃহপালিত জন্তুর সাথে গ্রামের মানুষের যে ভালো ব্যবহার হয়, তা শহুরে মানুষের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায় না। জীবজন্তুর সাথে অবশ্যই খাদ্য খাদকের সম্পর্ক স্বাভাবিক কিন্তু অনেক সময় অকারণেই জীবজন্তুর সঙ্গে বাড়াবাড়ি রকমের নির্দয় আচরণ করা হয়। এ ধরনের নির্দয় আচরণ ধর্মগুলোতে যেমন গর্হিত, আমাদের দেশীয় আইনেও তেমনি নিষিদ্ধ। বিড়াল ও কুকুরের মতো প্রাণীকে নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। তাদের সঙ্গী করে আয়েসে আরামে অনেকে রাখেন। কিন্তু বয়স হলে নির্দয় ভাবে রাস্তায় ছেড়ে দেয়। জীবিত থাকাকালীন বধ্যের সাথে নির্মম ব্যবহার যারা দেখে তাদের অবচেতন মনে স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্ক ও ঘৃণা বাসা বাঁধে।

(২)

বিবর্তনবাদের শেষপর্যায়ে এখন আমরা মানুষেরা। কিন্তু প্রকৃতির এমন অমোঘ নিয়ম যে আমাদের জীবনক্রম ধারায় কোটি কোটি শাখার প্রাণীরা, যাদের বিবর্তনের শেষক্রমে মানুষ, তারাও এখন পৃথিবীতে বর্তমান। মজার কথা হল, হোমোস্যাপিয়ন মানে মানুষেরও কয়েক কোটি বছর ধরে বিবর্তন তো হয়েছে ঠিকই কিন্তু শারীরগত অতটা নয়, মানসিক ও বুদ্ধির দিক দিয়েই ক্রমবিকাশ বেশি হচ্ছে। চেহারা ও আচরণগত পরিবর্তন নয় বলেই আমরা পরস্পরকে বুঝে উঠতে পারি না কার ভিতরে সুপ্ত রয়েছে নৃশংসতা পশুভাব এবং কার ভিতরে নৈতিকতা। ক্রমবিকাশের সূত্রে আমরা মানুষেরা উন্নতশীল প্রাণী। তাই প্রকৃতি বিবর্তনের সূত্রে আমাদের দিয়েছে নৈতিকতা ও নৈতিকতার উর্দ্ধগমন। আমাদের ভিতরে জান্তব ক্রূরতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু নৈতিকতা সবসময় নিষ্ঠুরতাকে অবদমিত করে রাখে। প্রকৃতির এই প্রবল ক্রমোন্নতির টানে তাই নৈতিকতা পাশবিকতার ব্যাস্তানুপাতিক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের মস্তিষ্কের frontal cortex আমাদের আচরণ থেকে প্রতিহত করে। কিন্তু যাদের এই বস্তুটি কমজোর থাকে তারা কনট্রোল করতে পারে না। অন্ধের মতো আচরণ করে কুকর্মটি করে ফেলে নিজেই হতবাক হয়ে ভাবে, এটা কী করলাম? এটা হয়তো আমি করিনি, আমাকে দিয়ে কোনো কিছু অপশক্তি করিয়েছে। চিকিসা বিজ্ঞান বলে ব্রেনের এমিগডালা অংশটির এই নিষ্ঠুর আচরণে বিশেষ ভূমিকা থাকে। তবে কী মানুষের মস্তিষ্কে মননকোষে এটি একটি বংশানুগতিক উপাদান? এটি কী একটি ক্রমবিবর্তনের অঙ্গ? কেউ কেউ তার তীব্র বিরোধীতা করেছেন ঠিকই। কিন্তু সমীক্ষাতে প্রমাণ মিলেছে এই ক্রমবিবর্তনবাদের সত্যতা।

হায়দ্রাবাদে সেল্যুলার এন্ড মলিক্যুলার বায়োলজি সেন্টারে, একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের ওপরে অনেকদিন ধরে রিসার্চ ওয়ার্ক চলেছে। মানুষের দেহকোষের ডিএনএতে এক ধরনের জিনের অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই জিনটির নাম Androgen Receptor সংক্ষেপে ট্রব। এই জিনের মধ্যে তিনটি অনুর নিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্তন হয়। সাধারণ সুস্থ মনের মানুষদের এই পরিবর্তনের হার ২১ বার। যদি এই পরিবর্তনের হার ১৮ বা তার চেয়ে কম হয় তবে তার মধ্যে বিকৃত অসামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটতে থাকে। তার মধ্যে হত্যা ক্রূরতা ধর্ষণেচ্ছার প্রবণতা দেখা দেয়। ভারতে ৬৪৫ জনকে নিয়ে এই পরিবর্তনের হারের সমীক্ষা করা হয়েছে যার মধ্যে পরীক্ষা অনুযায়ী ২৭১ জন সুস্থ বাকি জন ধর্ষক খুনী ও নিষ্ঠুর আতংকবাদী। নৃশংসতার বিষয়ে, বিখ্যাত নিউরো সায়েন্টিস্ট ক্যাথলিন টেলর নিষ্ঠুরতা, হিংসা, যৌন নির্যাতন, গণহত্যা এবং অন্যান্য অত্যাচারের পিছনে কারণগুলো কি তার খোঁজ করেছেন। ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও স্নায়ু বিজ্ঞান এইসব বিষয় নিতে তিনি মানব বিবর্তনে নিষ্ঠুরতা কেমন করে ধাপে ধাপে পরিশীলিত হয়ে এখনকার সভ্য মানুষের আচরণে এসেছে তার বিশদ আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লিথুয়ানিয়াতে বন্দীদের পিটিয়ে মেরে ফেলা ও এই দৃশ্য দেখে সেখানের নাগরিকদের তুমুল উসাহ ও হাততালি দেওয়ার খবর পড়ে তিনি এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণার কথা ভেবেছেন। বর্বরতা ও নির্যাতন খুন দেখে একটি ভিড় উসাহ দেয়, হত্যাকারী এবং সমুহ দর্শক কি মানসিকভাবে অসুস্থ? আমরাও কি ওদেরই মতো? যারা এই বিষয় নিয়ে পড়ছি ও জানছি তারাও কী অসুস্থ? টেলর এমন বিকৃত আবেগ ও নিষ্ঠুর প্রবৃত্তির সন্ধান করেছেন যার প্রতারণায় সাধারণ ভালো মানুষ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী মানুষও হত্যার মতো ভয়ঙ্কর কাজ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি দেখান কিভাবে কোনো অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে হিংসক হয়ে যেতে পারে। এই ধরনের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, তিনি নিষ্ঠুরতার একটি স্পষ্ট, সূক্ষ্ম এবং চিন্তাশীল বিশ্লেষণ করেছেন করছেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ড্রাইভের প্রথম পদক্ষেপে প্রথমেই গোপন হিংসার ইঙ্গিত খুঁজে নেওয়ার কথা টেলর বলেছেন। তিনি এই 'অপ্রতিরোধ্য লুকোনো হিংসা বা নিষ্ঠুরতা' খুঁজে 'তাদেরকে' 'আমাদের' থেকে আলাদা করতে বলেছেন। তিনি জটিল সামাজিক আচরণকে মস্তিষ্কের প্রসেসগুলির মধ্যে হ্রাস করার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে কাজ করেছেন।

নিষ্ঠুরতা মানবতার অবক্ষয়, সেটিকে বিশ্লেষণ করে মানুষকে সচেতন করার জন্য টেলরের একটি সাহসী প্রচেষ্টা। টেলর নিপুণ ও সূক্ষ্মভাবে জৈবিক ও সামাজিক স্তরে নিষ্ঠুরতার প্রভাব দেখিয়েছেন। এবং এটাও ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমরা অধিকাংশ সময়ে কেন নিষ্ঠুর নই। আমাদের জিনে এই দোষ থাকা সত্ত্বেও রাস্তা ঘাটে আমাদের বেশিরভাগ লোক কেন বাচ্চাদের, মেয়েদের, একে অপরের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করি না। মনের মধ্যে ধর্ম জাতি উঁচু নিচ বিভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা শান্ত থাকি কেন? কোন হিসাবে অমানুষ সাধারণ সময়ে নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে? এবং অসময়ে কেন নিষ্ঠুর হয় সাধারণ মানুষ? এই বিষয়ে গভীর মননশীল ব্যাখ্যা দিয়েছেন টেলর।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, ইদানিং মানুষ তার ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করেই তাক্ষণিক তার বহিঃপ্রকাশ করে ফেলছেন। যার ফলে গণপিটুনি নারী ও শিশু হত্যা বাড়ছে। অপরাধীর হত্যাকাণ্ডেও এসেছে নানান শৈল্পিক পৈশাচিকতা নিষ্ঠুরতার নানা ধরণধারণ। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনা মহামারী রূপ নিয়েছে। মানুষের মন থেকে কোমল অনুভূতি কমে আসছে। ক্রমেই পাশবিকতার ভিক্টিম হয়ে পড়ছে। এখন নিষ্ঠুরতার মূল কারণগুলি হল, অর্থলোভ, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবসায়িক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্থিরতা, দাম্পত্যকলহ, মাদকাশক্তি ও বিচার ব্যবস্থার অভাব। এছাড়া নোংরা পরিবেশ,

ব্যক্তিগত কুআচার ও নির্লজ্জ বেহায়া অনুভূতিহীন হয়ে অসামাজিক হয়ে বসবাস, শারীরিক বিকৃত যৌনতায় রুচি, মদ্যপান, অহেতুক স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ ইত্যাদি।

নিষ্ঠুরতা মানুষের আভ্যন্তরীণ অসুরক্ষার ফল। আমাদের আতঙ্ক লোভ লালসা এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চতার কল্পনা টাকা কড়ি সম্পদ প্রেসটিজ পাওয়ার সেফটি সিকিউরিটি এইসবগুলির অতিচিন্তায় মনের মধ্যে ভয়ের পাশাপাশি নিষ্ঠুরতা বাসা বাঁধে। নিষ্ঠুরতা এক ধরনের কষ্ট সুখ। দস্তয়োভস্কির কথায় এই মানসিক পীড়নটি সুখের জন্যে। ক্ষণিক কিংবা দীর্ঘদিন পরে হলেও এই উল্লাসটির মানুষ দাস হয়ে পড়ে। কিন্তু এটিই তার দীর্ঘ জীবনে দুঃখের কারণ। এই সুখ শান্তির নয়।

শ্রীরজনীশের কথায়, আমাদের মনের মাত্র এক দশমাংশই চেতন। বাকি পুরোটাই আঁধার। অজ্ঞানের অন্ধকার। কোনো ভালো কাজ নিঃস্বার্থ ভাবে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে যদি কেউ পিছিয়ে আসে তখন ওই নয়ের দশভাগ অন্ধকার তাকে গ্রাস করে ফেলে। চেতন সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু আঁধার তা হতে দেয় না। চেতন ক্ষমা করতে চায় কিন্তু বাকি অংশ উগ্র হয়ে পাশব সুখ খোঁজে। সারা জীবন ধরে নিষ্ঠুর ব্যক্তির ভিতরে চেতন ও অচেতনের হাইড এণ্ড সিক খেলা চলতে থাকে। একটি ভাগ ভাবে এটা করা উচিত না। ধরা পড়ে গেলে পরে আমার শাস্তি হবে। জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই তেড়েফুঁড়ে ওঠে ওই অন্ধকারময় অচেতন।

আধ্যাত্মিকতাবাদে বলে, বায়ু ও জলের মতো আত্মারও একটি নিজস্ব পরম শুদ্ধতা আছে। শুদ্ধ জল ওবায়ু যেমন নিখুঁত ভৌতিক রাসায়নিক ও জৈবিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতে সঠিক ও নির্ভুল বিক্রিয়ালব্ধ দ্রব্য তৈরি করে তেমনি শুদ্ধ আত্মা প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনের ধারা প্রবাহটি নিখুঁতভাবে বজায় রাখে। এখন বায়ু ও জল আবহাওয়া দূষিত হওয়ার সাথে সাথে আত্মা ও প্রকৃতির চক্রটিও দূষিত হয়ে যাচ্ছে। তার ফলস্বরূপ প্রজন্মের নিষ্ঠুরতা বেড়ে চলেছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ যত বেশি হবে প্রকৃতির বিরূপতা তত বেশি মানুষের দেহে মনে শিকড় গজাবে। প্রকৃতির ছোটো পর্যাবৃত্তগুলি যেমন প্রাণবায়ু জল আবহাওয়া উদ্ভিদ প্রাণীকূল ও মানুষের পারস্পরিক ইকো সিস্টেম যত বাধাপ্রাপ্ত হবে মানুষ ততই প্রকৃতি বিপর্যয়ের জন্য উন্মাদ ও নিষ্ঠুরের মতো আচরণ করবে।

অধুনা সাইকোলোজিস্টরা বলেন, মানুষের নেগেটিভ এটিচ্যুড থেকেই তার emotional disturbance শুরু হয়। এবং সে ধীরে ধীরে গভীর ডিপ্রেশনের শিকার হয়ে পড়ে। এবং তার ফলে সে উদ্ভান্তের মতো খতরনাক বৃত্তির যেমন ঈর্ষা প্রতিশোধ পরায়নতা সঙ্কীর্ণতা এবং শেষে মারমুখী নিষ্ঠুর দরিন্দা হয়ে পড়ে।

ক্রুর নিষ্ঠুর খুনী ধর্ষক বা বর্বর অসামাজিক নষ্টকারী মানুষের শাস্তি বা ক্যাপিটেল পানিসমেন্ট নিয়ে দুরকম বিচারের রায় আছে। একদল বলেন, ক্রিমিন্যালিজম ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধির মতোই সমাজকে দূষিত করে। ওদের শেষ করে দেওয়া উচিত। মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র কাম্য। হিব্রু আইনে বলে 'চোখের বদলে চোখ'। সমাজের শুদ্ধিকরণের জন্য কৌটিল্য আমলে মৃত্যুদণ্ডই ছিল খুনীর শাস্তি। অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে স্বাভাবিক নির্দোষ ও সামাজিক মানুষ যদি বারবার খুনী ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড দেখে বা শোনে তবে তার অপরাধ বিষয়ে ভীতি জন্মায়। তাই সমাজ সংস্কারের জন্য এটি একটি উত্তম প্রথা। এইসব চরম নিষ্ঠুরের মৃত্যুদণ্ডই বিধেয়। কারণ, সে খুন করে বা অন্যের বাঁচার অধিকার হরণ করে। সাধারণ সভ্য মানুষের মনে আতঙ্কের বীজ বপন করে। নিষ্ঠুর বিকৃতমনা খুনীর মৃত্যুদণ্ড হলে অনেক ক্ষেত্রে তার পরিবারবর্গ স্বস্তির নিঃশ"াস ফেলেন। অতীতে নানান নিষ্ঠুর উপায়ে প্রাণদণ্ড দেওয়া হত। পাথর ছুঁড়ে, টুকরো করে কেটে, ফাঁসি, বন্ধুকের গুলি, বিষাক্ত গ্যাসচেম্বার, ইলেকট্রিক চেয়ার এবং আরও।

এখন বেশিরভাগ সমাজ সংস্কারক মানবতাবাদী। তাঁরা বলেন, মৃত্যুদণ্ড সবসময়ের সবার ক্ষেত্রেই হিংস্র ও নিষ্ঠুর ও অমানবিক। পৃথিবীর প্রায় একশটি দেশ থেকে মৃত্যুদণ্ড উঠে গেছে। কেবল ভারত, চিন, আমেরিকা, পাকিস্তান, ইরাক, ইরান আদি দেশে এখনো রয়েছে। অনেকে বলেন, হত্যা যদি নিষ্ঠুর হয় তবে মৃত্যুদণ্ড নিষ্ঠুর হবে না কেন? যেহেতু অপরাধী সমাজেরই সৃষ্টি অতএব সমাজকে সুস্থ গড়ে তোলাই এর প্রতিকার। নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিলে নিষ্ঠুরতা বাড়ে বই কমে না। এখন সবচেয়ে মূল্যবান কাজ হল আমাদের নিজেকে জানার চেষ্টা করতে হবে। অনেক সময় আমরা একটা সাময়িক প্রবাহে ভেসে যাই। ভাসতে বাধ্য হই। খেয়াল থাকে না কি করছি। তবে, একটু থমকে দাঁড়ানো, একটু ভাবা আমি কী? কী করছি। কেন করছি। কিসের জন্য করছি। তাহলেই আমরা বাঁচবো। আর আমাদের বাঁচা মানেই প্রকৃতি সিস্টেমকে বাঁচানো।

(৩)

নিষ্ঠুরতা মানুষের মনের একটি ঋনাত্মক বিবশতা। নিজের আত্মসচেতনতার দুয়ার রুদ্ধ করে একটি অবসাদ সুখ। যে মানুষ ক্রুর হয় সে বুঝতে পারে না তার ভিতরে এইসব বিরুপ ঘটনা তার অচবেচতন মন তার বহির্মনের আড়ালে থেকে এইসব তাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। মানুষের অবচেতন মন প্রকটতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি। মানুষের ভিতর থাকে অন্য এক মানুষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিখ্যাত জাদু ডাক্তার ফ্রাঞ্চ আন্তন মেসজার ও মনোচিকিসক জঁঅ মার্টিন শারকো মানসিক রোগীদের সম্মেহিত করে অনেক গোপন স্মৃতি ও অনুভূতির খোঁজ পেয়েছেন। সিগমন্ড ফ্রয়েড বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সবচেয়ে প্রথমে অবচেতন মনের এক মডেল তৈরি করেন। ফ্রয়েডের এই মলেলে রয়েছে মানুষের তিনটে মন। বহির্মনটি হল চেতন মন। তার ঠিক ভিতরের বৃত্তে থাকে প্রাকচেতন মন এবং গভীর কেন্দ্রে থাকে অবচেতন মন। অবচেতন বা সুষুপ্তির মানসিক উপাদান হল ইড। এই ইডের শক্রিকে বলা হয় লিবিডো বা কামপ্রেরণা। আমাদের কোমরের নীচে এক ত্রিকোণ বর্মের গর্তে থাকা মেরুদাড়ের বাঁকানো শেষপুচ্ছের জালজট। সেখান থেজে সংবেদন প্রবাহবাহী স্নায়ুসুতোগুলো দিয়ে ঘিলুর বিশেষ একটি অংশে নিরন্তর একইসাথে প্রবাহিত হচ্ছে সৃ"শীলতা আত্মজ্ঞান ঈশ্বরবোধ ও যৌনশক্তি। সেটি লজ্জা অপরাধবোধ ও ক্রোধের মতি আবেগ ও সংবেগের জন্ম দেয়। অপরাধ প্রবণতা ও বিকৃতকামের জন্ম হয়। আবার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যেকোনি স্তরে যেকোনো অনুভবে ও যেকোনো পরিস্থিতিতে যেমন, আকর্ষণ, আবেগ, জাগরণ, সতর্কতা, আবেগ, আগ্রহ , অনুপ্রেরণা,উত্তেজনা, সৃজনশীলতা, উসাহের ভিন্ন ভিন্ন পিরিমাপে কম বেশি যৌনশক্তি কাজ করে। এই লিবিডোকে অবচেতন স্তরে যে কোনোভাবে উদ্দীপিত করে তার চেতন স্তরে তেমনি কর্ম হয়। এই ইড মনুষ্যত্বকে দমন করে রাখতে চায় আবার আদিম হিংস্র পশু প্রবৃত্তিকে ও আচ্ছন্ন করে রাখতে চায়। কিন্তু ইড এর শক্তি এতই দুর্দম হয় যে মাঝেমাঝেই ইগোর পদস্খলন হয়। ইগো যেহেতু বুদ্ধিমান তাই হিংস্র কাজ করে ফেলার পরে মানুষের মনে অনুশোচনা আসে। আর এই অনুশোচনায় কনফেসন হয়ে সে অবচেতনার তৃতীয় অংশের কাছে আসে। তি তৃতীয়টাই হল বিবেক বা সুপার ইগো। এই সুপার ইগো বা নৈতিক তাড়নায় চলে। কিন্তু ইগোর বুদ্ধিবৃত্তি ও সুপার ইগোর ববেকের চোখে ধুলো দিয়ে ইড চরম উল্লাসে বিপথে তার হিংসা ও কাম তাড়না চরিতার্থ করে। ফ্রয়েল এই প্রতিক্রিয়ার নাম দিয়েছেন সাবলিমেশন। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর মানুষটির মনে ইগো এবং সুপার ইগোর বিস্ময় উথলে পড়ে। কি করে আমি এই কাজ করে ফেললাম? নিশ্চয় এই কাজ আমি করিনি। শয়তান ভর করেছিল আমাতে। লিবিডোর উপত্তিস্থল আমাদের দেহের একেবারে নিচে মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে, যেখানের নাম আমাদের হিন্দু শাস্ত্র মতে, মূলধার চক্র। শাস্ত্র বলে এই চক্রটি মনুষ্যত্ব ও পশুত্বের সঙ্গমস্থল। এই চক্রটি জীবত্ব ও জড়ত্বের সঙ্গমস্থলও বলা হয়। এইখানেই যোগীরা ধ্যানকেন্দ্রিক করে আত্মচতনা জাগরিত করেন সদবুদ্ধি লাভের জন্য। যেহেতু ধ্যান ব্যাপারটি একান্তই আমাদের ভারতীয় সম্পদ তাই এর মহত্ব আমরা বুঝি না। কিন্তু এখন সারা বিশ্বে বুদ্ধিজীবি জ্ঞানীরা এটি অত্যন্ত পবিত্রভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মানবিক শক্তি উত্তরণের এক অব্যর্থ পথ জেনে গ্রহণ করছেন। বুদ্ধিমত্তা ঈশ্বর পরায়নতা ও মস্তিষ্কের বিকাশ এইসব নাভির ওপরভাগেই সংঘটিত হয় তাই এই ধ্যান সব মানুষেরই দিনচর্চার মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা হিসাবে যদি রাখা হয় এবং তা করতে যদি বাধ্য করা হয়, মনে হয় আমাদের সমাজে অসামাজিকতা দ্রুত কমে আসবে। শারীরিক ও মানসিক বিশৃঙ্খলা, অবসাদ, মাদকাসক্তি, নিষ্ঠুরতা, ধর্ম ও বর্ণ বৈষম্য দূর হতে পারে বলে অনেক সমাজ সংস্কারকের ধারণা।

উপন্যাস

প্রেম ও পরিণতি

সুবিমল সরকার

অপালা

আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। চা দিতে এসে ঋতবানকে ভ্রুভঙ্গিতে যেভাবে শাসন করে গেল সেটা করে প্রেমিকারা। বেশ কয়েকদিন হল ঋতবান কলেজে আসছে না — কয়েকদিন মন খারাপ করে থাকার পর ওর বাড়ি গেছি — কেন আসছে না জানতে। ঠিকানা জোগাড় করেছি কলেজ রেজিস্টার ঘেঁটে। নামেই বি. টি. রোডে থাকে বলেছে — আসলে বড়ো রাস্তা থেকে গলি — তস্য গলি — অন্য কেউ হলে ফিরেই যেত। নিতান্ত আমি উতলা, তাই বাড়ি খুঁজে বের করেছি। ক্লাসে শোনাত বি. টি. রোডের মহিমা, এই তো তার ছিরি। সে যাক আসল কথা হল মেয়েটা। ঋতবান বললো কাজের মাসির মেয়ে, ওর মাকে হেল্প করতে চলে আসে, থাকে। সে না হয় আসুক — কিন্তু ওরকম ভ্রুভঙ্গি এবং আর কিন্তু চা পাবে না। দু'কাপ হয়ে গেছে এ কথাবলার অধিকারটা কোথায় পেল?

ঋতবানকে জিজ্ঞেস করলুম — ওর নাম কি, বলল ইন্দ্রাণী। আমি রীতিমতো চমকে গেলাম। কাজের মেয়েদের নাম যদি ইন্দ্রাণী-ফিন্দ্রানী হয় তাহলে তো আমাদের ফুটুর ডুম। আমার যেন মনে হল ব্যাপারটা সহজ নয়। ওর পোশাকেও কোনো মালিন্য চোখে পড়ল না। রীতিমতো ভদ্র ঘরের মেয়েদের মতো পোশাক। সবচেয়ে খারাপ লাগছিল মুখ চোখের প্রসন্নতা, কাজের মেয়ের মুখ অত হাসিখুশি হয় নাকি! ওকে মোটেই কাজের মেয়ের মতো মনে হচ্ছে না।

আমার চোখের স(চাউনি দেখে ঋতবান রীতিমতো রেগে গেল, বলল — কাজ করে খায় বলে কি সুন্দর নাম হতে পারবে না। এরকম প্রাগৈতিহাসিক মানসিকতা পেলি কোথায়। আমি একটু থমকে গেলুম। সত্যিই তো, তবু আত্মর(ার জন্য ঢোঁক গিলে বললুম তোর সঙ্গে তো ইয়ার-দোস্তের মতো কথা বলছিল। আবার বলছিস থাকেও।

ওর জবাব — হ্যাঁ-রে মেয়েটা একটু রোম্যান্টিক আছে। শুনে আমি একেবারে থ। ঋতবান বলে-কী, কাজের মেয়ে রোম্যান্টিক — তাহলে আমি কী? একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। আমি কী? আমি কী? আমি নিজেকে সামলাতে পারলুম না। কেন যে হঠাৎ মাথাটা এত গরম হয়ে গেল, আমি ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলুম।

ছোট থেকে দেখছি সারা সকালটা আমার বাবা স্লিপিং গাউন আর মা নাইটি পরে ঘুরে বেড়ান। আর বাবার মুখে সারা(ণ পাইপ ঝুলছে।

আমার যে কি অসহ্য লাগে সে কথা বলে বোঝাতে পারবোনা। ওরা কখনো কাছে ডেকে আমাকে আদর করেছেন সে কথাও মনে করতে পারি না।

অথচ বন্ধুদের বাড়ীতে যাই তো — দেখি তাদের বাবা মায়েরা কত সহজ সরল। আমার মা-বাবার মতো একটুও রাশভারী নন্। কাছে ডেকে আদর করেন — কথা বলেন। বরং ওরা যখন আদর করেন তখন আমিই আড়ষ্ট হয়ে থাকি। মন খুলে কথা বলতে পারিনা।

আমার খুব সংকোচ হয় — অথচ কিসের সংকোচ সেটা নিজেই বুঝতে পারিনা। আসলে আমার বেড়ে ওঠা এমন একটা বড়লোকি পরিবেশে যে আমি কারোর সঙ্গেই সহজ হতে পারি না।

এই সহজ হতে না পারার কারণে কলেজে আমার সে রকম কোন বন্ধু নেই। থাকবে কি করে। আমার যা মেজাজ তাতে সবাই সব সময় সন্ত্রস্ত থাকে, বেশী কথাও আমার সঙ্গে বলেনা।

হয়তো বড়লোক বলে আমার একটু দেমাক আছে সেজন্য সবাই এড়িয়ে চলে।

কিন্তু ঋতবানের সঙ্গে পরিচয়ের পর জীবনের মধুর দিকটার সন্ধান যে আমি পেয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম, সেই ঋতবানই হলো আমার জীবনের একমাত্র আশ্রয়। যার সঙ্গে বন্ধুত্ব মেলামেশা আমাকে দেবে একটা নতুন জীবনের সন্ধান।

সমস্যা হলো ঋতবান ভয়ানক চুপচাপ থাকে। কারো সঙ্গে বেশী কথা বলেনা। আমি অবশ্য আঠার মতো ওর সঙ্গে লেগে থাকি। অন্য কোন বন্ধুদের ওর কাছে ঘেঁষতেই দিইনা।

আমার এই স্বভাবের জন্য ঋতবান খুব বিরক্ত(হয়। আমাকে মৃদু বকে। কিন্তু ওর বকুনিকে আমি পাত্তা দিইনা।

ওকে আগ্‌লে রাখাই আমার একমাত্র কাজ। আর কারো সঙ্গেই ওকে আমি বন্ধুত্ব করতে দেবো না।

যদিও জানি ঋতবান কারো সঙ্গেই বন্ধুত্বে আগ্রহী নয়। এতো চুপচাপ থাকে যে মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হয়।

কিন্তু ওকে আমি ভালবাসি — পাগলের মতো ভালবাসি। ওকে আমি কারো কাছে তুলে দিতে পারবো না

কিন্তু কয়েকদিন হলো ঋতবান কলেজে আসছেনা। কেন আসছেনা, কেন আসছেনা — ছটফট করতে করতে অস্থির হয়ে অবশেষে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হলো।

ঋতবান

এই হয়েছে এক জ্বালা কয়েকদিন কলেজে যাইনি, যাইনি কারণ ভালো লাগছিল না। ভালো না লাগলে আমি কিছু করি

না। মুশকিল হল একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে অপালা এসে হাজির। এসেছিস বেশ করেছিস, তাই বলে কাজের মেয়েকে নিয়ে একটা সিন্ করার দরকার কী ছিল! কার বাড়িতে কে থাকে, তাদের কী আচরণ, সেসবে তোর কী দরকার। সেই কবে বাবা মারা গেছে। মা আমাকে কত কষ্ট করে মানুষ করছেন। আমরা তো আর অপালাদের মতো বড়লোক নই। এই এক চিল্‌তে ঘরে মা-আর ছেলের গড়াগড়ি। ভাগ্যিস বাবার জায়গায় মা কাজটা পেয়েছিলেন তাই বেঁচে বর্তে আছি। পড়াশোনা সে তো উপরি পাওনা। ক্লাসে তো কারও সঙ্গে মিশতেই পারি না। সবাই পয়সার বারফাট্টাই করে। এই বাড়িয়ে বলা ব্যাপারটা আমি একটু ও পছন্দ করি না। কিন্তু আমাকেও করতে হয়। কী করব, টিকে থাকতে গেলে যে গে(য়া ধরতে হয়। অনেকবার ভেবেছি নিজেকে এভাবে ছোটো করব না। ভাবলেই তো হল না, এটা আমার আয়ত্তের বাইরে সেটা বেশ বুঝতে পারি। সেজন্য এখন আর কষ্ট হয় না।

অপালা এসে আমাকে একেবারে বে-আব্রু করে দিয়ে গেল। সেজন্য বেশি চিন্তা করছি না। চিন্তা হচ্ছে ইন্দ্রাণীর জন্য। মা তো অফিসে চলে যায় — ওরা মা-মেয়েই আমাদের সংসারের সব কাজ দেখাশোনা করে। দুজনেই আমাকে একটু আধটু ধমকায়, সেজন্য আমি তো কিছু মনে করি না। ওরা তো প্রায় ঘরের লোকের মতোই। অপালা এসে যে এরকম একটা অশান্তি করবে সেটা কী করে বুঝব। কী করে যে ঠিকানা খুঁজে পেল কে জানে।

শুধু শুধু ইন্দ্রাণীকে নিয়ে একটা নাটক করে চলে গেল। অপালা-র জন্য মন খারাপ হচ্ছে না। ওই তো আমাদের এক চিলতে ঘর। ইন্দ্রাণী নিশ্চয় সব শুনতে পেয়েছে। খারাপ লাগছে, খুব খারাপ লাগছে, বেচারি কোনো দোষ না করেও আমার জন্য একগাদা কথা পরো(শুনতে বাধ্য হল।

এইসব বড়োলোকের মেয়েগুলো সামান্য সহবত পর্যন্ত কেন যে শেখে না। আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঝড়ের মতো চলে গেল, তাতে বুঝতে পারছি, কাল ক্লাসে গেলে আমার কপালে কী দুঃখ আছে।

অপালা

সেদিন যে কি হয়ে গেল — ভাবতেই এখন খারাপ লাগছে। সেদিনের পর প্রায় তিনদিন কেটে গেছে। কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। কিছুই ভাল লাগছেনা। কেবলি ভেবে চলেছি — কেমন করে আবার ঋতবানের সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ করে নেবো।

বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছি ওই ইন্দ্রানী মেয়েটার সুন্দর চেহারা আর হাসি খুশি মুখ আমি মেনে নিতে পারিনা। আমার মধ্যে জন্ম নিয়েছে এক তীব্র অসূয়া। ঋতবান একজন সুন্দরী পরিচারিকার সঙ্গে থাকে এই ব্যাপারটাও আমি মেনে নিতে পারিনি বলেই ও-রকম অসহিষু(ব্যবহার করেছিলুম।

বুঝতে পারছি ঋতবান সে জন্য খুবই বিরক্ত(হয়েছে। জানিনা এরপর আমার সঙ্গে আর স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখবে কিনা। কি- যে হয়ে গেল — কেন যে ওর বাড়ী গেলুম আর তারপর নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আন্‌লুম।

জানিতো ঋতবানের যা চরিত্র এরপর আর আমাকে হয়তো সহজ ভাবে গ্রহণ করবে না।

যদি সহজ ভাবে গ্রহণ না করে — যদি আবার স্বাভাবিক সম্পর্কে ফিরে যেতে না পারি তাহলে তো আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ওকে ছাড়া আমি যে বাঁচার কথা ভাবতেই পারছিনা। আমার পড়াশোনা শিকেয় উঠেছে। এমন একটা অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটাচ্ছি যে সে কথা বলবার নয়।

সবচেয়ে বড়ো মুশকিল হলো আমার সমস্যা নিয়ে কথা বলবো এমন কোন বন্ধু আমার নেই।

নিজের বাবা মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক তো পরের মেয়ের মতো। আমি যে ওদের একমাত্র মেয়ে সে কথা আমি যেমন বুঝতে পারিনা তেমনি ওরাও বোধ হয় অনুভব করে না যে একমাত্র মেয়ের সঙ্গে দু-দণ্ড কথা বলি, তার ভালোলাগা-না লাগা একটু খতিয়ে দেখি।

আমার কাছে ওরা হলো - রোবট মা-বাবা আর আমি রোবট কন্যা।

এখন আমি এই অসহনীয় অবস্থা থেকে কেমন করে মুক্তি(পাবো জানিনা।

শুধু বুঝতে পারছি এক গভীর সমস্যায় আমি তলিয়ে যাচ্ছি — যে সমস্যা আমার সমস্ত জীবনকে ছারখার করে দেবে। জানিনা কেমন করে এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবো।

মনে হয় ভুলই করছি। ঋতবানের প্রতি ভালবাসা আমার সমস্ত যুক্তি(বোধকে নষ্ট করে দিচ্ছে। ওর মতো সংবেদনশীল মানুষের সংস্পর্শে এর আগে কখনো আসার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

আমি তো কলেজের অন্য ছেলেদের যেমন দেখছি তেমনি দেখছি আমার সমস্ত পরিজনদের। নিজের বাবা আর মায়ের কথা বলতে আমার ইচ্ছে হয়না। বাবা আর মায়ের বিলাসী জীবন এবং অন্য সকলের প্রতি বিশেষ করে দরিদ্র মানুষদের প্রতি অবহেলা আমার চূড়ান্ত বিরক্তি(র কারণ হয়ে উঠেছে।

খুবই আশ্চর্য্যজনক ভাবে ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই কৃত্রিম। আমি ওদের সন্তান ওরা আমাকে সব দেয় শুধু স্নেহ আর ভালবাসা ছাড়া

বাবা আমাকে টাকা দিতে কখনো কার্পন্য করে না। চাইলেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত(দেয়। কিন্তু মনে পড়ে না ওদের বুকে মুখ লুকিয়ে কখনো কেঁদেছি। মনে পড়েনা ওদের আদর খেতে খেতে ঘুমিয়েছি।

আমার পুরো শৈশব কেটেছে আয়ার হাতে। যে আয়া

শি(ত বটে কিন্তু যেহেতু আমি ওর সন্তান নই, — সন্তান স্নেহ কখনো পাইনি।

অন্য মেয়েদের মায়েদের দেখে আমার খুব কষ্ট হোত। কতো মেয়েকে দেখেছি বাবা কোলে করে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি কি কখনো বাবা মায়ের কোলে চড়েছি।

পৃথা

দেখতে সুন্দরী হওয়া যে কী বিপদ সেটা আমার চেয়ে বেশি কে আর বোঝে। দশ বছরের ঋতবানকে নিয়ে যখন বিধবা হলুম, তখন থেকে শু(উৎপাত। উৎপাত বলাটা ঠিক নয় — সমস্যা। ওর বাবা মারা যাওয়ার পর তো চোখে সর্ষে ফুল দেখছিলাম। নিজের বাবা-মার তো নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, যাব কোন্ চুলোয়। শেষ পর্যন্ত চাকরিটা পেয়ে অন্তত দুমুঠো-র সমস্যা মিটেছে। শু(হয়েছে নতুন সমস্যা।

না চাইতেই অফিসের সবাই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। এগিয়ে আসাটা ভালো লাগত। খুবই ভালো লাগত এবং সেজন্য সবাই-র সঙ্গেই ছিল মধুর ব্যবহার। ত্র(মেশ বুঝতে পারলুম এ সাহায্যের জন্য প্রতিদানের দাবি আছে। সে দাবি অন্য কিছু নয়, শরীর। এ শরীরের আর আছে কী। কতদিন হল শরীরকে ব্যবহার না করতে করতে শরীরের যে একটা চাহিদা আছে সেটাই ভুলে গেছি। শরীরটাকে তো পোড়া কাঠ মনে হয়। সে পোড়া কাঠের জন্যও যে এত লোকের আগ্রহ, সেটা দেখে অবাকই লাগে। অবশ্য শরীরকে আমি পোড়া কাঠ মনে করলে কী হবে, আমার মন এখনও কল্পনা করতে ভালোবাসে, হায় আমার নতমুখী মন, কে আর সেদিকে নজর দেয়।

নিজেকে আমি ভালোবাসি। খুব ছোটোবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল ভীষণ সাজব, সেজে বি(সুন্দরী হব। আমার মা-কে সবাই বলত, তোমার মেয়ে কী সুন্দর, যার ঘরে যাবে আলো করে থাকবে। আমার এমন কপাল, ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো হয়েই এসেছি। পয়সা, পয়সাই সব — পয়সা না থাকলে যত গুণই থাক, সব মাটি। আলো কালো হয়ে থাকে। নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলাম গরিব স্বামীর সঙ্গে। সবই ঠিক ছিল — লোকটা মরে গিয়ে আমাকে ঠেলে দিল হাঙর-কুমিরের সামনে। পু(ষের যে এত খিদে সেটা জানতে পারলুম চাকরি করতে এসে।

এখানে সবাই উপোসী, কে নয়, বড়োবাবু, ছোটোবাবু, পিওন, জমাদার — সকলেই হাঁ করে বসে আছে। অফিসে তো আরও মেয়ে আছে, তাদের কথা জানি না। মনে হয় সবার খিদে মেটানোর দায় আমার।

আমার নিজেরও খিদে আছে — কিন্তু এদের কাউকে নিজের খিদে মেটানোর উপযুক্ত(মনে করি না। হা ঈ(র, এদের মধ্যেই সারাজীবন আমাকে থাকতে হবে। মানুষ বোধহয় সব পারে, এই যেমন আমি পারছি।

ইন্দ্রাণী

আমাদের তো সাত বাড়িতে ঘুরে কাজ করে খেতে হয় তাই আমি বুঝি সেদিন দিদিটা কেন এত রেগে গিয়েছিল। আমার মা বলেন সব বাড়ির পু(ষ মানুষগুলো যে ধাঁচের মেয়ে মানুষগুলো ঠিক তার বিপরীত ধাঁচের। দশ বছর বয়স থেকে এই ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে কাজ করে কম অভিজ্ঞতা তো হল না। আমার মা'র মতো একেবারে মূর্খ তো নই, অন্তত ক্লাস সেভেন পর্যন্ত তো পড়েছি। আর চোখ-কান তো খোলা থাকে। আমার মা যেমন কোনো ব্যাপারে সহজে ভেঙে পড়ে না আমিও তেমনি সহজে ভাঙার পাত্রী নই। অন্য বাড়ির সঙ্গে ঋতদার বাড়ির একটা তফাত তো আছেই। এ বাড়িতে মা আজ দশ বছর ধরে কাজ করছে। শুধু কাজ নয়, এ বাড়ির সব দায়িত্বও আমার মা'র উপর। ঋতদার মা তো সেই কোন্ সকালে অফিস চলে যায়। তারপর সারাদিন দফায় দফায় হয় মা না হয় আমি এভাবেই চলছে এ বাড়ির কাজ।

সারাটা দিন অবশ্য খুব ভালোভাবে কেটে যায়। কাজ আর কতটুকু, টুকটাক ঋতদার ফাইফরমাশ আর ভাত-ডাল আর মাছ রান্না। সে তো দু'ঘণ্টাতেই হয়ে যায়। বাকি সময় কাটে ঋতদার সঙ্গে গল্প করে অথবা শুয়ে-বসে। কখনও মনে হয় না এ বাড়িটা আমার নয়। কেমন করে যে আমি আর আমার মা এ বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গেছি সেটা আমার মাও যেমন বোঝেনি আমিও সেটা বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারিনি বলেই তো ধাক্কাটা খেতে হল।

আজ যে আমায় এত অপমান সহ্য করতে হল সেটার কারণ তো আমার বয়স। ওই মেয়েটা, ঋতদা যাকে অপা-অপা ডাকছিল তার পাকা ধানে আমি তো মই দিইনি। তবু কী কুৎসিত ঝগড়া করল ওরা। এই রাগী ঋতদাকে আমি চিনি না, ও যে এত ধম্কে কথা বলতে পারে সেটাই আমার কাছে নতুন। আমার জন্য ঋতদা কেন এত ঝগড়া করতে গেল। আমি কে, সামান্য একটা ঝিয়ের মেয়ে, আজ আছি, কাল নেই। স্রোতের টানে কোথায় ভেসে যাব জানি না। সত্যি জানি না, দিনরাত চারপাশে এত হায়না-শেয়ালের আনাগোনা, নিজেকে ঠিক রাখতে চেষ্টা করেও পারছি কই। সেসব তো আমাদের মতো মেয়েদের কপালে আছেই। আমার মাও বলেন দেখ কতদিন নিজেকে ঠিক রাখতে পারিস। আমি কি নিজেকে ঠিক রাখতে চাই। তাহলে এত ঋতদার কথা ভাবছি কেন?

পৃথা

বিয়ের আগে বা পরে সুখ বলতে যা বোঝায় তা কোনোদিন পাইনি। বাবা-মার সংসারে বড়ো হয়েছি পেটেভাতে। স্বামীর সংসারে এসেও সেই এক চিলতে ঘরে শাশুড়িকে নিয়ে দিনযাপন। তারপর শাশুড়ি মারা যাওয়ার পর ঋতকে নিয়ে

সেই থোড়বড়ি খাড়ার জীবনে ছিলাম অভ্যস্ত। এখন আমার মাইনে বেশি নয় বটে তবে মা ছেলেতে বেশ চলে যায়। দু'পয়সা জমাতেও পারি। পয়সার অভাব যে খুব আছে তা নয়। অভাব মনের খাদ্যের। এখন আমার খুব ইচ্ছে হয় একজনকে কাছে পেতে, শুধু দু'বেলা পেট ভরলেই তো খিদে মেটে না, কাকে আমি পেতে চাইব, সবাই তো আমাকে পেতেই হাঁ করে বসে আছে। এর মধ্যে কি ভালো লোক নেই — আছে তো বটেই কিন্তু আমার ভয় করে। ভয় শুধু ছেলের জন্য, অত বড়ো ছেলে সে কীভাবে নেবে।

ঋত অবশ্য মাঝে মাঝে বলে তোমার উচিত ছিল আর একটা বিয়ে করা। ভয়ে ওর মুখের দিকে তাকাতে পারি না, ভাবি ও কি আমার মনের কথা বুঝতে পারে। এখন অবশ্য আমি বিয়ের কথা ভাবি না — ভাবি একটা বন্ধুর কথা। যে আমাকে বুঝতে পারবে, থাকবে আমার পাশে।

শরীরের চাহিদা তো আছেই কিন্তু সেটা নিয়ে ভেসে যাওয়া নয়। কখনও কখনও সেটাকেও না হয় প্রশ্রয় দিলাম। আসল কথা ভয় পাই — মেয়ে মানুষ, তার যে কত ভয়, সবচেয়ে বড়ো ভয় তার শরীর — নিজেই সে তার ভার বহন করতে পারে না। নিজের প্রতিই এই অবিশ্বাস আমাকে প্রতিনিয়ত কুঁজো করে রাখে। সাহস করে সোজা করে পারি না তাকাতে কারও দিকে। নতমুখী পৃথা তার খিদে নিয়ে জ্বলতে থাকে। অথচ কিছুদিন আগেও কিন্তু নিজের শরীরকে পোড়াকাঠ মনে হত। শরীরের প্রতি ছিল অনীহা। নিজের এই পরিবর্তন আমার কাছেই অচেনা। মনের মধ্যে রিন-রিন করে বাজে তেমন বয়স হয়েছে কি? শরীরের প্রতি চোরা একটা টান অনুভব করি।

এই চোরা টান অনুভব করি বলেই — পু(ষের সঙ্গ পেতে বড়ো ইচ্ছা হয়। সে ইচ্ছাকে কিছুতেই ডানা মেলতে দিইনা কারণ কোন এক অজানা কারণে রয়েছে পু(ষ ভীতি আর সংস্কার। খুব ইচ্ছে হয় ভয়কে জয় করি — সংস্কারকে ভাঙি। কিন্তু সে কেবল মনেই থাকে। মনের মধ্যে হাজারবার তার আসা যাওয়া চলতে থাকে। কতো রাত ঘুমুতে পারিনা। অনুভব করি শরীরের জ্বালা। সতর্ক ভাবে বিছানা ছেড়ে উঠি-জল খাই। পাশের ঘরে ছেলে শুয়ে আছে। পায়চারী করার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হয়। যদি পায়ের শব্দে ছেলের ঘুম ভেঙে যায়।

মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছি বলে নিজেকে ছোট মনে হয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সামনের জন্মে যেন মেয়ে মানুষ না হই।

পু(ষ মানুষের ভালবাসা পেতে কেন যে এতো লোভ হয় — সে কথা বুঝতে পারিনা। ভয় হয় যদি এই লোভের কথা কেউ বুঝতে পারে তাহলে নিশ্চিতই বিপদ হবে। সে ভয়ে শিউরে উঠি। কথা কম বলি। শুধু পু(ষ কেন — মেয়েদের সঙ্গে ও বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কথা বলি না।

এই কথা না বলা ত্র(মশঃ আমাকে ঠেলে দিচ্ছে যন্ত্রনার দিকে। এ যন্ত্রণা তো শুধু মনের নয় — বোধ হয় শরীর ও আমাকে যন্ত্রনা দেয়।

কি করবো — কি করবো, ভেবে ত্র(মশঃ দিশাহারা হই।

ঋতবান

আমার সবচেয়ে বড়ো চিন্তা মাকে নিয়ে। আমি জানি মা সারাজীবন কত কষ্ট পেয়ে এসেছে। কোনোদিন সুখের মুখ দেখেনি। এই যে এতগুলো বছর আমাকে মানুষ করার জন্য মুখ বুজে অফিস আর বাড়ি করে চলেছে প্রথমে সেটা অনুভব না করলেও এখন আমার কাছে তা খুবই বেদনাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা মানুষ শুধু অন্য একটা মানুষের সুখের জন্য নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করবে তার মধ্যে আমি মানবিকতার অভাব দেখতে পাই। সব মানুষের নিজস্ব একটা চাওয়া পাওয়ার জগৎ থাকবে। শুধু কর্তব্যের খাতিরে একজনের সুখের জন্য অন্যজন তার সুখ ত্যাগ করবে তা মেনে নিতে পারি না। মা তার সন্তানের জন্য বা সন্তান তার মায়ের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবে এর মধ্যে মহত্ত্ব থাকতে পারে, সবসময় যে তাতে আনন্দ আছে আমার তা মনে হয় না। নিজের সুখের পাশাপাশি মায়ের সুখের কথা যদি না ভাবি সেটা হবে নিতান্তই আত্মসুখী মানুষের কাজ। মা যেমন আমাকে সুখী দেখতে চান মাকে সুখী দেখতে চাওয়াটাও আমার সবচেয়ে বড়ো কাজ।

মা'র একাকীত্ব দূর করার জন্য আমি খুব হালকা ভাবে বলেছি মা তুমি আর একটা বিয়ে করো। মা ম্লান হেসেছেন। আমি বুঝি তিনি ভাবেন আমি যা বলি তাতে বিশ্বাসের শেকড় নেই। এই দেশটা যদি আমেরিকা বা ইউরোপের উন্নত দেশগুলোর মতো হত যেখানকার ছেলেমেয়েরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে মা-বাবার বিষণ্ণতা দূর করার জন্য তাদের বিয়ে দিচ্ছে তাহলে আমার মায়ের মতো কত ল(ল(মা নিজের জীবনে অন্তত একটুকু সুখ পেত।

কিন্তু সে-তো হওয়ার নয়। এখানে ছেলে উদ্যোগী হয়ে মায়ের বিয়ে দিলে প্রথমে ছেলেকে পাগল বলবে নয়তো বলবে ছেলের নিশ্চয় কোনো অন্য ধান্দা আছে। তারপর পরিজন-পড়শি আর সমাজের ছি-ছিক্কার সারাজীবন সে ছেলের সঙ্গী হবে। আমি যদিও ওসবকে পরোয়া করি না, কিন্তু আমার মা, দীর্ঘ কয়েকহাজার বছরের সংস্কার তো তারও সঙ্গী। সেও বিয়ের কথা বললে গুটিয়ে থাকে। জানি তার পাখা মেলা মন শরীরকে বহন করতে পারে না। শরীরের ভারে সে ক্লান্ত। আমাদের দেশের মেয়েরা তো শরীর নিয়ে বাঁচে। সারাজীবন গঙ্গা জল ছিটিয়ে শরীর পবিত্র রাখে। মন হোক না তার বাস যেখানে ইচ্ছে।

ইন্দ্রাণী

সেদিনের ঘটনার পর থেকে আমি ঋতদার সঙ্গে আমার ব্যবহার পালটে ফেলেছি। আমার নিজের মনই এখন আমার

সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। দিদিমণিটা যে বারবার বলছিল ও তোর প্রেমিকা নাকি। আমার ভেতরটা একেবারে নাড়িয়ে দিয়েছে। ঋতদাকে আমি কোনোদিন অন্য চোখে দেখিনি। সে স্বপ্ন আমার চোখে ছিল না। আমার হয়ে ঋতদার ওই দিদিমণিকে বলা কথাগুলো এখন আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আমি কোনোদিন ভাবিনি ঋতদা আমাকে এত সহানুভূতি নিয়ে দেখে। আমার যে এত গুণ আমি যে এত ভালো ঋতদা না বললে নিজেই কোনোদিন অনুভব করতে পারতাম না। অবশ্য ওর স্নেহ-ভালোবাসাই তো আমাদের আশ্রয়। কত সহজ করে ঋতদার সঙ্গে কথা বলতাম। এখন একরাশ সংকোচ এসে আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কিছুতেই ওর কাছে যেতে পারছি না। আমাকে আর ঋতদাকে নিয়ে ওই দিদিমণিটার খারাপ খারাপ কথাগুলো যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না, সেগুলোর কথা মনে পড়লেই লজ্জায় শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে। একদিনেই আমি যে অনেকখানি বড়ো হয়ে গেলাম। এই বড়ো হয়ে যাওয়াটা যাতে ওর চোখে না পড়ে সেজন্যই তো নিজেকে আড়াল করতে চাইছি। যখন প্রেমিকা বলছিল তখন খুব শিহরণ হচ্ছিল। তারপর শোয়াটোয়া নিয়ে যাসব বিচ্ছিরি কথা বলছিল ভাবলেই গা শিরশির করছে।

সেজন্য একবার ডাকলে যেখানে পাঁচবার ছুটে যেতাম। সেখানে বারবার ডাকলেও না শোনার ভান করে এড়িয়ে যাচ্ছি। ঋতদা কি আমার কোনো পরিবর্তন বুঝতে পারছে। যদি পারে সেটা ভীষণ লজ্জার। তাহলে তো কোনোদিন আর ওর সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারব না। আমার মা যেসব বাড়িতে কাজ করে সব বাড়িতেই মুখ ঝামটা খায়। সবসময় কাজের খুঁত ধরে। আবার একদিন কামাই করলে তার জন্য কত হম্বিতম্বি। যার কাজে অত খুঁত সে না এলে অত কষ্ট কীসের। আসল কথা আমার মা'দের মতো মেয়েরা না থাকলে বাবুদের বিবিরা যে আর আরাম করতে পারেন না, সব কাজ নিজেকেই করতে হয়। সেজন্য আমার মা বলে ওসব মুখ ঝামটা মনে নিতে নেই। আমাদের কাজ করে খেতে হবে, কথা গিলে লাভ নেই।

আমার যে কথা গেলাই কাল হল। কেন আড়ি পেতে ঋতদা আর ওই দিদিমণির সবকথা শুনতে গেলাম। শোনা পর্যন্ত না হয় ঠিকই হল কিন্তু মনে কেন নিতে গেলাম। আমি তো কোনোদিন স্বপ্ন দেখিনি। স্বপ্ন কেন এসে আমার মনে বাসা বাঁধতে চায়। আমি যে বুঝতে পারছি আমার এ স্বপ্নটা ঠিক স্বপ্ন নয়।

অপালা

ওই ঘটনার পর ঋতবানের সঙ্গে আমার সম্পর্কের সুরটা যেন কোথায় থমকে গেছে। প্রতিদিন আগের মতো দেখা হচ্ছে কথা হচ্ছে — ওর কথাবার্তা
ভাবভঙ্গিতে মনে হয় আমাদের মধ্যে কোনোদিন কোনো ঝগড়া হয়নি। তাহলে আমি কেন সেদিনের ঘটনা ভুলতে পারছি না, পারছি না সহজ হতে।

বারবার ভেবেছি ওর সঙ্গে সেদিনের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব। ওর কোথায় ভুল সেটা ওকে বুঝিয়ে বলব। কোনো সুযোগই ও আমাকে দিচ্ছে না। এমন ভাব করে যেন কোনোদিন আমাদের মধ্যে কোন কলহ হয়নি। একটা মানুষ কেমন করে এরকম নির্মোহ হতে পারে। ঝগড়া তো নিশ্চয় হয়েছে — আমি কিছুতেই মন থেকে ওই মেয়েটাকে মেনে নিতে পারছি না। সবচেয়ে বড়ো কথা সামান্য একটা কাজের মেয়ের জন্য ও কেন বড়ো বড়ো সওয়াল করবে। মানবিকতা, সেটা কি আমি না দেখাতে বলেছি। বলেছি তো ওরা যদি অত বিশ্বস্ত হয়, অত সেবা করে, তাহলে ওদের মাইনে আরও বাড়িয়ে দাও। সেবা তো করে পয়সার জন্য — তো সে পয়সা দিলে ল্যাটা চুকে যায়। তা-না যেন মাথায় রাখতে চায় — সেজন্যই তো মাথা অত গরম হয়ে গেছে।

আমার যে কোথায় ভুল সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না। অসহ্য, আমার অসহ্য লাগছে। কাজের মেয়ের শাসন মেনে বাস করা, কী করে ঋত-রা মেনে নেয়। এটা নিশ্চয়ই এত সহজ-সরল ব্যাপার নয়। আমিও তো একটা মেয়ে। আর একটা মেয়ের চোখ দেখে ভঙ্গি দেখে কিছু বুঝব না হয় নাকি। কাজের মেয়ের চোখের ঝিলিক কী করে মেনে নেব। আমার অত বুকের পাটা নেই। ওর হয়ে ঋত-র এতো সওয়াল মেনে নেওয়া আমার পে(অসম্ভব।

পারব না, কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারব না। ঋত-র এই শীতল ব্যবহার, যেন কিছু হয়নি এমন মনোভাব — এসব আমার কাছে অসহ্য লাগছে। কী করে এসব মেনে নেব। আমাকে মেনে নিতে হচ্ছে — কারণ আমি ওর জন্য উতলা, ওকে আমি হারাতে চাই না। শুধু সেজন্য সমস্ত যন্ত্রণা আমাকেই বইতে হচ্ছে। আমার প্রতি সামান্য ভালোবাসাও যদি ওর মনে থাকত তাহলে নিশ্চয় ওরও আমার সঙ্গে এই ব্যবহারের জন্য কষ্ট হত।

ঋতবান

আমি অপালার কষ্ট বুঝতে পারছি — কিন্তু ওকে মেনে নিতে পারছি না। পয়সা দিয়ে মানবিকতা কেনা — ছিঃ, ব্যাপারটা ভাবতেই লজ্জা হচ্ছে। আমি জানি হাজারটা সংস্কার নিয়ে আমরা বড়ো হই কিন্তু এই নতুন পৃথিবীর নির্মাতা আমরা। আমরা কি শুধু ধর্ম-অর্থ আর (মতার কাছে মাথা নত করতেই থাকব। তাহলে আর অন্যকে দোষ দিই কেন? আমার নিজের মধ্যে যে ঔদার্য্য নেই কী করে সেটা অন্যের কাছে আশা করি। চোখের সামনে দেখতে পাই সারা পৃথিবীটা কী অদ্ভুত সুন্দর ভাবেই না পালটে যাচ্ছে। কত সব পুরোনো ধ্যানধারণা সংস্কারকে তুচ্ছ করছে, সেখানে আমরা শুধু স্বজনদের সমালোচনা আর পড়শিদের কটূক্তি(র ভয়ে নিজেকে করে রাখছি কূপমণ্ডুক। নিজেদের ভালো লাগা না লাগা সাহস করে কেন বলতে পারব না।

জানি আমরা সবাই অর্থের স্রোতে ভেসে চলেছি। অর্থ নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে থাকবে — কিন্তু অর্থের সঙ্গে মানবিকতার কোনো বিরোধ তো আমার চোখে পড়ে না। বরং চোখে পড়ে যাদের একটু পয়সা আছে তাদের মানবিক বোধটা যেন একটু কমের দিকে। সেটাই বেশি কষ্ট দেয়। অপালার সেদিনের ভাষাগুলো সেই মানবিক বোধের অভাব থেকেই তো উঠে এসেছে। আমি ওর ওপর রাগ করিনি, অপালাকে আমার কখনও খারাপও লাগেনি। কলেজে এসে ওর সঙ্গে পরিচয়। কলেজ ফাংশানের গানের সূত্রে নিজেই এসে যেচে আলাপ করেছে। আমার কোনো উদ্যোগই ছিল না। রবীন্দ্রনাথের 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে' গানটা আমি গেয়েছিলাম। মোটেই ভালো গাইতে পারিনি। আলাপ করার ছুতোয় অপালা বলেছিল তুমি ভীষণ ভালো গেয়েছ। তোমার গান আমাকে নাড়া দিয়ে গেছে, তাইতো আলাপ করতে এলাম। সেদিন যেভাবে ও আমার হাত জড়িয়ে ধরে কথা বলেছিল তাতে অবশ্য আমিও একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলুম। ভীষণ ভালো লাগছিল ওর আন্তরিক ব্যবহারে।

স্বাভাবিকভাবেই সে আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমি বড়ো সাবধানী। ওর মতো বড়োলোকের মেয়ের সঙ্গে কতদিন তাল মেলাতে পারব জানি না। ওর থেকে মানসিকভাবে নিজেকে কিছুটা বিযুক্ত(রাখতে পেরেছি বলেই তো আজ কষ্ট কম হচ্ছে।

সুদেব

পৃথা আমার সহকর্মী। এর আগে ওর স্বামী ছিল আমাদের অন্য অফিসের স্টাফ। তাকে আমি চিনতাম না। পৃথা জয়েন করার পর তার কথা জেনেছি। আমি বেশ খাচ্ছিলাম-দাচ্ছিলাম আর বগল বাজিয়ে বিন্দাস ছিলাম। পৃথা আসার পর আমার সব কাজ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এরকম সুন্দর একটা মেয়ে অল্প বয়সে বিধবা হয়ে গেল। অন্যদের মতো আমিও এটা মেনে নিতে পারছিলাম না। কত সুন্দরী মেয়েই তো বিধবা হয় — সেটা নিয়ে তো আমরা মাথা ব্যথা করি না কিন্তু এর বেলায় সেটা খাটল না। দুবেলা আমাদের চোখের সামনে রূপের ডালি নিয়ে বসে থাকবে সেটা আমাদের কারোরই সহ্য হচ্ছিল না। প্রায় সকলেই হামলে পড়েছি, কিন্তু আশ্চর্য পৃথা সেই যে প্রথমদিন থেকে একটা খোলসে ঢুকে বসে আছে আজ এতদিন হয়ে গেল সহজ কথাবার্তা হয়, কিন্তু সে খোলস থেকে বের হচ্ছে না।

আমি পৃথার সমবয়সী, দুটো বাচ্চা আছে একটা ছেলে, একটা মেয়ে। আপাতভাবে বেশ সুখী জীবন। পৃথা আসার পর সেই সুখী জীবন আর বিন্দাস থাকার মধ্যে একটা সাপ ঢুকে পড়েছে। কিছুতেই সে সাপটাকে তাড়াতে পারছি না। অন্য সকলের মতো আমি ওকে ভোগ করতে চাইছি না, ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছিলুম, চাইছিলুম ওর সহমর্মী হতে। মেয়েদের সহমর্মী হওয়া কেউ অবশ্য ভালোভাবে নেয় না।

কিন্তু ওর শীতল ব্যবহার আমার মধ্যে একটা জেদের জন্ম দিয়েছে। এই জেদ আমার বিন্দাস জীবনে এনেছে ঝড়। এই ঝড়ের মোকাবিলা করতে গিয়ে বাড়ছে ত্রে(ধ কিন্তু পৃথাকে দেখার পর আমি নিস্তেজ হয়ে পড়ছি। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি ক্লান্ত, জানি না ওকে পাবার ইচ্ছাটা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে। হঠাৎ যেন নিজেকে কেমন অসহায় লাগছে। সব মানুষের জীবনে বোধহয় একটা সময় আসে যখন নিজেকে ফিরে দেখতে ইচ্ছে হয়। পৃথার সঙ্গে বন্ধুত্বের ইচ্ছা — তাকে পাওয়ার ইচ্ছা আমার মধ্যে কেন ত্রে(ধ আর অসহায়তার জন্ম দিচ্ছে তা ভেবে দেখতেই হবে। আমি তো একটা মনেরই সঙ্গী চাইছি। তাহলে এরকম কেন হবে?

স্যালারি ডিপার্টমেন্টে কাজ করি সেজন্য প্রায় সব স্টাফই একবার করে আসে। খোঁজ খবর নেয়। ডি-এর কোন খবর এলো কিনা অথবা নানারকম ডিডাকস্ন এর খোঁজ খবর ইত্যাদি চলতে থাকেই।

সেজন্য সব স্টাকের সঙ্গেই আমার সখ্য সম্পর্ক। একমাত্র পৃথাই আসে না। তার কোন কৌতুহল নেই। মাথাতে স্যালারি ছাড়া তার কোন প্রয়োজনই কারো কাছে নেই।

নীরবে মাথা নীচু করে কাজ করে। কারো সঙ্গে নেই ভালো আলাপ বা বন্ধুত্ব। কেউ কেউ দেমাকী মনে করে। কেউ বলে গম্ভীর প্রকৃতির আবার কেউ বলে মিশতে জানেনা। আবার এমন কথাও শুনেছি সুন্দরী তো তাই মিশতে ভয় পায়। কোনটা সত্যি জানিনা।

সত্যিটা আমার জানার দরকার নেই। দরকার ওর সঙ্গে আলাপ এবং বন্ধুত্ব। প্রতিদিন অফিসে গিয়ে ওর দিকে চোখ পড়লেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। ভাবি কেমন করে আলাপ করবো। কোন অজুহাত খুঁজে না পেয়ে হতাশা বেড়ে যায়।

কিন্তু ভাগ্য যদি মানুষের সঙ্গে থাকে তাহলে পঙ্গু ও গিরি লণ্ডন করতে পারে। একদিন অফিসে গিয়ে দেখি হেড্ অফিস থেকে একটা চিঠি এসেছে যে পৃথার স্যালারি কম দেয়া হচ্ছে। যেহেতু ও মাধ্যমিক পাশ — সুতরাং আরো দুটো ইন্ত্রি(মেন্ট ওর প্রাপ্য।

পৃথার হয়েছে ইনত্রি(মেন্ট, আর আমার খুশিতে পাগল হওয়ার মতো অবস্থা। চিঠিখানা হাতে নিয়ে ওর টেবিলের সামনে গিয়ে দাড়ালুম।

চোখ তুলে চাইতেই বল্লাম — ম্যাডাম কোন কথা শুনবো না। খাওয়াতে হবে কিন্তু। তারপর পুরো চিঠি ওকে পড়ে শোনালুম। দেখলাম আশ্চর্য এক সুন্দর হাসিতে মুখখানা ভরে গেল।

আঃ এই হাসিটা পাওয়ার জন্যই তো এতোদিন বুকের মধ্যে কষ্ট নিয়ে অফিস করছি।

তারপর অকারণে অনেক(ণ ওর টেবিলে বসে কথা

বলতে লাগলাম, বুঝতে পারছি সামান্য দূরে দূরে বসা সহ কর্মীরাই কাজ বন্ধ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

অবশেষে যখন ওর টেবিল থেকে উঠে আসছি — বল্লো একদিন বাড়ীতে আসুন নিশ্চয় খাওয়াবো।

বাড়ী যাওয়ার নেমতন্ন করবে এতটা আমি আশা করিনি। বুঝলাম মেয়েটা সরল এবং বোকা। কারণ কোন মহিলা সহকর্মীই কোন পু(ষ সহকর্মীকে সামান্য আলাপে বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানায় না।

আমি ওর সরলতার সুযোগ গ্রহণ করলাম এবং বাড়ী যাওয়ার দিন ও ঠিক করে ফেল্লাম।

তারপরে ডিপার্টমেন্টে এসে ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টা ভাবার পর বুঝতে পারলাম এই ঘটনায় সহকর্মীদের মধ্যে কি ভীষণ ঝড় উঠবে। একবার ভাবলাম গিয়ে বলে আসি বাড়ী যাবো না, অফিসেই খাওয়াবেন।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমার লোভ জয়ী হলো। স্থির করলাম ওর বাড়ীতেই যাবো -তা - না হলে ওর সঙ্গে শুধু অফিসে বসে সখ্য সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না।

মেঘ না চাইতেই জলের মতো ঈ(ের যে সুযোগ আমার হাতে তুলে দিয়েছেন তা কিছুতেই ছাড়া যাবেনা। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই হবে। যা থাকে কপালে ওর বাড়ীই যাবো।

জানি বাড়ীতে কেবল ওর ছেলে থাকে, আর কেউ নয়। সুতরাং সেখানে আলাপ করার অনেক বেশী সুযোগ পাওয়া যাবে।

এই সুযোগে কথা বলে ওর সঙ্গে বন্ধুত্বটা বাড়িয়ে নিতে হবে।

সেদিন বাড়ী এসে খুশিতে মন আর বাধা মানছিলো না। অনেকদিন পর ছেলে মেয়ে দুটোকে জড়িয়ে ধরে আদর করলাম।

বল্লাম তোরা তো কোনদিন বলিসনা অফিস থেকে ফেরার সময় তোদের জন্য কিছু আনতে হবে কিনা।

আমার এই হঠাৎ আদর পেয়ে ওরাও একটু যেন থম্‌কে গেল। বুঝতে পারছিলো না কি বলবে।

আমার বউ স্বপ্না অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। অফিস থেকে ফিরে প্রতিদিন ক্লান্ত হয়ে কিছু(ণ শুয়ে থাকি। আজ কি হলো।

আমার খুশির কারণ বুঝতে না পেরে স্বপ্না শুধু আমাকে দেখতেই থাকলো।

ইন্দ্রাণী

আমি ঋতদার কাছ থেকে পালাতে চাইলে কী হবে — ঋতদা আমাকে পালাতে দেবে কেন? কেবলই জিজ্ঞেস করছে তোর কী হয়েছে, তুই একদম আমার সামনেই আসছিস না। আমরা দুজনেই যে দুজনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছি সেটা বেশ বুঝতে পারছি এবং কেউ কারও কাছে ধরা দিতে চাইছি না। আমি তো নিজের কাছে ধরা পড়েই গেছি। এই ধরা পড়াটা ঋতদা না বুঝলেই হল। কিন্তু আমি না চাইলেই তো হবে না সব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। ওকেও মনে হচ্ছে এখন চিনতে পারছি না। ওর ব্যবহার কেন আগের মতো নয়। এত আন্তরিক এত সংবেদনশীল ঋতদাকে তো এর আগে পাইনি। পালটে গেছে, আমার মনে হয় ঋতদাও আমার মতো পালটে গেছে। ও কেন আমার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকায় না। ঋতদা তো এমন ছিল না, সেদিনের ঘটনার সব দায় দিদিমণিটার। ওর সব দোষ নিজের কাঁধে নিয়ে আমার কষ্টের জায়গাটা সারিয়ে দিতে চায়। এতদিন ধরে তো দেখছি, ও খুব বড়ো মাপের মানুষ। কোনোদিন আমার মা বা আমার সঙ্গে কটূ কথা বলেনি। ওর মাও আমাদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করে, আর সেইজন্যই তো এই সংসারের সব দায়িত্ব মা-মেয়ে দুজনে মিলে নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছি।

এত কষ্টের মধ্যেই এ বাড়ির কাজ করে আনন্দ পাই। মনে হয় এটা তো আমার নিজের বাড়ি। বাড়ির কোনো জিনিস যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে থাকে আমাদের দুজনের কড়া নজর। মা বলে, যে থালায় খাচ্ছো, সে থালায় হাগতে নেই। সে কথাটা মনে থাকে বলেই তো ঋতদার বাড়িকে নিজের বাড়ি ভাবি। সেদিনের ঘটনায় এক লহমায় মনে হল এ বাড়ি আমার নিজের বাড়ি নয়। আমি নিতান্তই কাজের মাসি। মাস মাইনের কড়ারে এ সংসারের জঞ্জাল সাফ করতেই আমাদের রাখা হয়েছে। জঞ্জাল সাফ হলে মাসের শেষে পয়সা নেব বাড়ি যাব। এ বাড়িকে নিজের বাড়ি ভাবার অধিকার কে আমাকে দিয়েছে। আমি মনে মনে সে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেছি। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে যাচ্ছিলাম। আমার দ্বিমুখী মনকে যে বাগ মানাতে পারছি না।

ঋতবান

এ আবার কেমন কথা — 'বামন হয়ে চাঁদে হাত'। ইন্দ্রাণী হঠাৎ এরকম একটা কথা বলতে গেল কেন। অপালার সঙ্গে সেদিনের ঘটনার পর ও আমাকে প্রায় এড়িয়ে থাকছিল। বুঝতে পারছিলাম ও আমাদের ঝগড়ার প্রায় সবটাই শুনেছে। তারপর থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ওকে গুটিয়ে যেতে দেব কেন? তাতে তো ওর যেমন (তি তেমনি আমাদেরও (তি। যদি অভিমান করে কাজে আসা বন্ধ করে দেয় — মা জিজ্ঞেস করলে কী জবাব দেব। সবচেয়ে বড়ো কথা মা যদি অন্যরকম কিছু সন্দেহ করে — যদি ভাবে হয়তো ওর শরীরে হাত দিতে চেয়েছি — তাই ও সরে গেছে। তাহলে তো মার কাছেই ছোটো হয়ে যাব। সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হচ্ছে অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য।

জানি এব্যাপারটা বেশ কঠিন। সেদিন অপালা এসে আমাদের প্রতিদিনকার ছন্দটাই নষ্ট করে দিয়েছে। ইন্দ্রাণীকে কখনও কাজের মেয়ে হিসাবে দেখিনি। আমার যখন ঠাট্টা-ইয়ার্কি করার ইচ্ছে হত আর কাকে পাব ওর সঙ্গেই সেসব করতাম। ও যে কাজের মেয়ে সেটা কখনোই ওকে বুঝতে দিতাম না। অপালা এসে সে আড়ালটা ভেঙে একেবারে বে-আব্রু করে দিয়ে গেল।

কঠিন, ভীষণ কঠিন, ইন্দ্রাণীকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা। কিন্তু আমার যে হাল ছাড়লে চলবে না। ওরা চলে গেলে কে সামলাবে মা-ছেলের সংসারের হাল। মাকে সকালে অফিসে ছুটতে হয় তারপর ফিরে এলে তার ক্লান্তি দেখে আমারই কষ্ট হয়। এরপর ওরা মা-মেয়ে যদি না থাকে তাহলে তো বিড়ম্বনার শেষ থাকবে না। মায়ের কথা যদি ভাবি তাহলে আমি অপালাকে ছাড়তে পারি — মা-মেয়েকে নয়। আমার যে কোনো উপায় নেই। মা-ছেলে দুজনেই ওদের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের সংসারের সব দায় তো ওরাই বইছে।

পৃথা

মানুষের জীবনে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে। সেরকম একটা ঘটনাতে অফিস কলিগ সুদেব-এর সঙ্গে হঠাৎ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। যদিও ঘটনাকে দায়ী করছি — আমার নিজের ইচ্ছেও যে কাজ করেনি তা নয়। সুদেব এসে বলল ম্যাডাম আপনাকে যে স্যালারি কম দিচ্ছে এটা আপনি জানেন? আমি অফিসের হিসেব অত বুঝি না। ও জোর করে ধরে নিয়ে গেল স্যালারি ডিপার্টমেন্টে। তারপর ক্লার্ককে কী সব বুঝিয়ে বলার পর দেখলাম ক্লার্ক মেনে নিল। বলল ঠিক আছে সামনের মাস থেকে এড্‌জাস্ট করে দেব। ব্যস এক লাফে আশি টাকা মাইনে বেড়ে গেল, আমার কী ভালো লাগছিল। টাকাটা বড়ো কথা নয়, কেউ যে আমার জন্য এরকম করে ভাবছে সেটা জেনে নিজেকে অনেক ভারমুক্ত(লাগছে। সারাজীবন যদি মাইনে কম দিত তাহলেও কোনোদিন জানতে পারতাম না।

সুদেব বলল ম্যাডাম খাওয়াতে হবে কিন্তু। বললাম সেটা তো আপনার পাওনা। ও বলল অপিসে নয় বাড়িতে যাব। সুদেব বাড়ি আসার কথা বলায় ভালো লাগছিল। কোনোদিন কেউ বাড়ি আসতে চায়নি। আমার এক চিলতে ঘর, কেউ এলে নিশ্চয় লজ্জা হত। সুদেব আসতে চাওয়াতে লজ্জা যেমন হচ্ছে আবার ভাবনাও হচ্ছে। সেটা ঘরের জন্য নয় — নিজের ঘর সেটা যেমনই হোক তোমার যদি ভালো না লাগে তাতে আমার কী?

আমি একটু শঙ্কিত হচ্ছিলাম, অবশ্য ঋত-র কথা ভেবে। এতদিন চাকরি করছি, কোনোদিন কেউ বাড়ি আসেনি। সুদেব যদি সত্যি সত্যি আসে তাহলে ও কেমন ভাবে নেবে। যদিও জানি আমার ছেলে অসম্ভব উদার। কোনো সংস্কার ওকে পিছু টেনে রাখতে পারে না। আমার আশঙ্কা সুদেবকে যদি ঋত ঠিকমতো গ্রহণ করতে না পারে তাহলে যে কষ্ট পাব। আমার কী হবে?

তবু নতুন পরদা কিনলাম, কিনলাম নতুন বেডশিট। ইন্দ্রাণীকে দিয়ে পরিষ্কার করালাম পুরোনো সব জঞ্জাল। ইস কতদিন ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখিনি। সবকিছু ঝকঝকে করে মনে একটু শান্তি পেলাম। ঘর সংসারের দিকে নিজের দিকে দেখা বোধহয় এই প্রথম।

হ্যাঁ এই প্রথম মনে হলো একটু সাহসী হওয়ার প্রয়োজন। নিজেকে যে কেবল বঞ্চনাই করছি সে কথা অনুভব করি। অফিসের অন্য মেয়েদের আচরণ চোখের সামনে চলে আসে। দেখি তো বেশীর ভাগ মেয়েই কতো নির্লজ্জভাবে পু(ষদের সঙ্গে মেলামেশা করে। কতো মেয়েকে দেখছি পু(ষ সহকর্মীদের কাছে কোন কিছু চাইতে একটুও দ্বিধা করে না। অবাক হয়ে ভাবি মেয়েরা কিভাবে এতো মর্য্যাদাহীন হয়।

মরে গেলেও কোনদিন কারো কাছে কিছু চাইতে পারবো না। কেমন করে যে মেয়ে মানুষ এতো ছোট হতে পারে সে কথা ভেবে দিশাহারা লাগে।

আমি তো সুদেবের কাছে কিছু চাইনি। সুদেব এসে বারবার আমার সঙ্গে কথা বলেছে — আমি শুনেছি, — এমন কি ভালো করে সুদেবের দিকে চোখ তুলে তাকাইনি পর্য্যন্ত।

ইচ্ছে হয়েছে — খুব ইচ্ছে হয়েছে — কিন্তু পারিনি। সুদেব খুব সহজ ভাবে কথা বলেছে, বলেছে ম্যাডাম অফিসে চাকরী করেন — অতো লাজুক হলে কি চলে।

নিজের অধিকার যে নিজেকেই বুঝে নিতে হবে। এই অধিকার বুঝে নেওয়ার কাজটাই কোনদিন পারবো বলে মনে হয়না।

মনে মনে সুদেবের প্রতি কৃতজ্ঞ হই। শুধু অফিসে নয় — বাড়ীতেও সুদেবের কথা ভেবে কপালে ঘাম জমা হয়।

ঋতবান

নিজের মাকেই আমি আজ চিনতে পারছি না। অফিসের সুদেব নামের একজন সহকর্মীর দৌলতে মা-র মাইনে বেড়ে গেল। সেজন্য মা আজ তাকে খেতে বলেছে। খেতে বলেছে ঠিক আছে, সে তো মাসি আর ইন্দ্রাণীকে বলেই দেওয়া হয়েছে কী কী রান্না করতে হবে। দু-রকমের মাছ, মাংস, দই-মিষ্টি সবই করা হচ্ছে। কিন্তু মা যেরকম অকারণ ছোটাছুটি করছে আর টেনশান নিচ্ছে তাতে ব্যাপারটা খুবই অবাক লাগছে।

আমার শান্ত স্বভাবের মা এত যে অশান্ত হতে পারে, না দেখলে তা বি(াস করতাম না। মাকে কয়েকবার বলেছি — মা তুমি চুপ করে ল(রাখো মাসী আর ইন্দ্রাণী ঠিক করছে কিনা। তুমি কেন এত ছোটাছুটি করছো। একজন মাত্র লোক খাবে তার জন্য তোমার এত টেনশন নেওয়ার কোনো দরকার নেই।

আমার শান্ত স্বভাবের মা, যে কখনও আমার উপর রাগ

করে না সে পর্যন্ত বলে উঠলো তুই বুঝবি না, এটা আমার প্রেস্টিজের ব্যাপার, তোকে নাক গলাতে হবে না।

ঠিক আছে বাবা নাক গলাব না। কিন্তু তোমার জন্যই তো কষ্ট হচ্ছে। সে ভদ্রলোক নিশ্চয় তোমার উপকার করেছেন তাকে নিশ্চয় যত্ন করে খাওয়ানো হবে। তিনি আসার আগেই তুমি খুব বেশি উতলা হয়ে পড়েছ সে কথা তোমাকে বলতে গিয়েছি। ঠিক আছে তোমার যদি ভালো না লাগে আর কথা বলব না। আবার অবাক না হয়ে পারছি না আমার শান্ত স্বভাবের ভালো মায়ের মনে যিনি এত ঝড় তুলে দিয়েছেন তিনি নিশ্চয় একটু অসাধারণ। আমি তো চাই আমার মায়ের জীবনে কেউ আসুক, যার উপর নির্ভরতা মাকে দেবে শান্তি।

আমার তো নিজেকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই। সব সমস্যায় মাকে নিয়ে। শৈশব থেকেই মায়ের ক(ণ মুখের দিকে তাকিয়ে ভেবেছি — কেমন করে মাকে সুখি করবো। সব সময় ভেবেছি মায়ের সুখই আমার সুখ।

সমস্যা হলো মা এতো বেশী সংস্কারের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয় যে আমার খুব অসুবিধে হয়। মাকে বলি মা অতো সংস্কার মানতে হবে না।

মা আমার কোন কথাই শুনতে চায় না। আত্মীয় পু(ষ মানুষের সঙ্গে পর্য্যন্ত মা কথা বলবে না। বাবা মারা যাওয়ার পর চাকরিতে জয়েন করাতেই আমার ঘাম ছুটে গেছে। কেবল বলেছে অতো সব পু(ষ মানুষের মধ্যে বসে কাজ করবো কেমন করে। কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। আমাকে তো বেশ কয়েকবার মাকে ধমক পর্য্যন্ত দিতে হয়েছে।

অফিস যাওয়ার প্রস্তুতিতে বারবার লম্বা ঘোমটা দিচ্ছিল। কতো কষ্টে যে সে ঘোমটা ছোট করেছি সে কথা বলে বোঝান যাবে না।

সবচেয়ে বড়ো কথা অপরিচিত পু(ষ দেখলেই ভয় পায়। কিছুতেই সামনে আসতে চায় না। মা মনে করে অপরিচিত পু(ষ মানেই খারাপ।

প্রথম প্রথম তো আমি বেশ কিছু(ণ অফিসের বাইরে অপে(া করেছি। কিছু(ণ পর পরই মা-র টেবিলে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। খুব ভাগ্য ভালো যে মাত্র কয়েকমাসেই মা-র মনোভাব বেশ কিছুটা পাল্টেছে বলেই আমি র(া পেয়েছি। আমার মায়ের সে বন্ধু বাড়ীতে আসছে এর চেয়ে বড়ো সুখ আমার কি হতে পারে।

পৃথা

আমি কি ধরা পড়ে গেলুম। সুদেব আসবে সেজন্য কিছুতেই নিজের চঞ্চলতা থামাতে পারছিলুম না। ইন্দ্রাণী আর ওর মাকে এটা হয়নি কেন ওটা হয়নি কেন আগে এটা সেরে ফেল বারবার এসব করতে থাকায় ঋত-কে একটু বিরক্ত(মনে হল। সত্যি তো বাড়িতে একটা লোক খাবে তার জন্য এত উতলা হওয়ার কী আছে। আমি উতলা না হয়ে পারছিলুম না। এটা সম্পূর্ণ আমার স্বভাবের বাইরে।

এখন বুঝতে পারছি এই আমাকে আমি চিনি না। সুদেবের প্রতি এই আকুলতা মোটেই স্বাভাবিক নয়। আমার তো কিছু করার নেই — হঠাৎ যে কী হল ওর প্রতি কেন এত আবেগ জন্মাল সেটা যদি বুঝতে পারতুম তাহলে তো হয়েই যেত। জানি না ঋত তি ভাবছে, ও যদি আর কোনো প্র(ে করে কী জবাব দেব জানি না। তারপর সুদেব যখন এল ওকে দেখে আমার বুকের ধুক্‌পুকানি গেল বেড়ে। এক লাফে আমার বয়স যেন কুড়ি বছর কমে গেল।

কী সুন্দর সেজে এসেছে। অফিসে যায় রোজ প্যান্ট-শার্ট পরে। আজ এসেছে গিলে করা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। ওকে দেখে ভীষণ ভালো লাগছিল। ভেতরে ভেতরে যতই ফুটতে থাকি বাইরে নিস্পৃহ থেকে ওকে ঘরে এনে বসালাম তারপর ঋত-র সাথে আলাপ করিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে বসলাম। দেখলাম মাত্র দুমিনিটেই সুদেব আর ঋত আড্ডায় মেতে উঠেছে। রান্নাঘর থেকে ওদের সব কথা শুনতে পাচ্ছিলাম।

রান্না থেকে রাজনীতি ওদের আলোচনায় কোনোকিছুই বাদ যাচ্ছিল না। আর রান্নাঘরে বসে সুখের আবেশে ডুবে যাচ্ছিলাম। বারবার ঈ(রকে ডাকছিলাম হে ঈ(র ঋত যেন সুদেবকে ভালোভাবে নেয়। শুধু ভালোভাবে নেয়নি — শুনতে পাচ্ছি ঋত বলছে — আমার মা-র কোনো বন্ধু নেই, আপনি ওকে দেখবেন। জবাবে সুদেব বলছে তুমি বি(াস রাখো আমি যতদিন আছি তোমার মায়ের কোনো অনিষ্ট কেউ করতে পারবে না। আমি এক ধরনের ভালোলাগায় ডুবে যাচ্ছিলাম।

এই ডুবে যাওয়া আমাকে অন্য একটা জগতের সন্ধান দিলো। নিজের প্রতি জন্মাল ভালবাসা। জীবনে বোধহয় এই প্রথম নিজেকে ভালবাসতে শু(করলাম।

জানি মানুষ স্বপ্ন নিয়েই বাঁচে। এতোদিন তো সেই গোপন স্বপ্নই ছিল আমার সম্বল। এই গোপনীয়তা আজ যেন আমাকে সাহস দিচ্ছে।

ঋত আর সুদেবের কথা শুনে অনুভব করছি — নিজের অধিকারের কথা। কখনো স্বপ্নেও যে অধিকারের কথা চিন্তা করিনি — আজ সেই অধিকার বোধ যেন যাদু মন্ত্রের মতো আমার মনে এসে বাসা বেঁধেছে।

নিজের ভেতরে খুশির একটা হাওয়া অনুভব করছি। কেবলি ভাবছি — ছেলে আমার। অথচ একেই আমি চিনতে পারিনি।

অকারণে ছেলের কথা ভেবে চোখে জল চলে এলো। সুদেবকে বলা ওর কথা ''আমার মায়ের কোন বন্ধু নেই আপনি মাকে দেখবেন।''

আমার মধ্যে যে পুলক সৃষ্টি করেছে তাতে মনে হচ্ছে আমি যেন অন্য একটা জীবনের স্পর্শ পেতে চলেছি।

জানিনা ভাগ্য আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে — তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে — এবার বোধ হয় বাঁচার মতো বাঁচবো।

অপালা

কেন যে ঋত অকারণে আমার থেকে এত দূরে সরে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। আগের সেই উষ(তা নেই, কী অসম্ভব শীতল ব্যবহার। আমার কোনো ভুল না থাকা সত্ত্বেও ওর কাছে (মা চেয়ে নিয়েছি। বারবার বলেছি আমার ভুল হয়েছে। ওর সেই একই জবাব সেদিনের ঘটনার জন্য মোটেই তোকে দোষারোপ করছি না। ওটা ভুলে গেছি। ভুলেই যদি গিয়ে থাকবে তাহলে আমার সঙ্গে ব্যবহারের এই পরিবর্তন কেন? আমি অসম্ভব জেদি মেয়ে একবার যদি ঠিক করি ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না তাহলে সেটা হবে চিরকালীন। মুশকিল হচ্ছে চেষ্টা করেও ঋত-র উপর রাগ করতে পারছি না। বরঞ্চ এক ধরনের অসহায়তা আমাকে গ্রাস করছে। কেন হঠাৎ ও আমাকে এত দূরে ঠেলে দিচ্ছে। জানি, জানি, ও যতই অস্বীকার ক(ক, সব সেদিনের ঘটনার জন্য। আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না সামান্য একটা কাজের মেয়ের জন্য ঋত-র এই শীতলতা এই নির্লিপ্ত মনোভাব আমাকে কেন ছিঁড়ে ফেলছে? আমার খাওয়াদাওয়া, ঘুম, পড়াশুনা সব নষ্ট হতে বসেছে। শেষ পর্যন্ত একটা কাজের মেয়ের কাছে হেরে যাব এই চিন্তায় আমার দিশাহারা অবস্থা।

যদিও ঋত বারণ করেছে তবু আর একবার ওদের বাড়ি যেতে হবে, দরকার হলে ওর মা'র সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমাকে সব-সব করতে হবে। আমি যে আমার জীবন থেকে ঋতকে হারিয়ে যেতে দিতে পারি না। ওকে ভালোবাসার পর আমার বাবা-মার অবহেলার কথা মনে রাখি না। জানি অর্থ আমাদের পরিবারে একধরনের অহমিকা এনেছে। যে অহমিকা সমস্ত দরিদ্র আত্মীয়কে দূরে ঠেলে দিয়েছে। ঋত-র মধ্যে আমি আবিষ্কার করেছি অহমিকাহীন একজন মুক্ত(মানুষকে। সেই মানুষটি আমার হৃদয়ের সমস্ত সত্তা জুড়ে বসে আছে। প্রতিনিয়ত ঋত-র প্রতি অনুরাগ আমাকে অসহায় করে দিচ্ছে। কেবলই ভাবি মা-বাবার আশ্রয় ছেড়ে কবে ওর ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেব।

সুদেব

মানুষ তো নিয়তির হাতের পুতুল। ভাগ্য সঙ্গে না থাকলে যে পৃথিবীতে কিছুই পাওয়া যায় না একথা ষোলআনা বিশ্বাস করি। পৃথাকে পাওয়া সেও ভাগ্যেরই সহায়তা। না হলে এতদিন এত চেষ্টা করেও যা করতে পারিনি সামান্য একটা ঘটনা আমাকে একেবারে পৃথার কাছাকাছি এনে দিল।

সেদিন ওর বাড়িতে এত অসাধারণ আপ্যায়ন পাব সেটা আমি ভাবতে পারিনি। মনের মধ্যে অনেক দ্বিধা আর সংকোচ নিয়ে ওদের বাড়ি গিয়েছিলুম। কিন্তু আমার আশঙ্কা ছিল অমূলক। মা ও ছেলের আন্তরিকতা শুধু মুগ্ধই করেনি মনে হয় আমার জীবনের আর একটা জানলা খুলে দিয়েছে।

পৃথা প্রায় আমার সমবয়সী, ওর এতবড়ো ছেলেকে দেখে আমি নিজেকে প্রায় গুটিয়ে নিচ্ছিলাম, পরে ভেবে দেখলাম হবেই তো মেয়েদের তো ছেলেদের বছর দশেক আগে বিয়ে হয়। আর ওর ছেলেটি ভারী চমৎকার। কথাবার্তা এবং আচরণও ভারী সুন্দর। কী সহজ বন্ধুর মতো আমার সঙ্গে সারা(ণ গল্প করে গেল। আসার সময় বারবার বলছিল কাকু আবার কিন্তু আসবেন। আমার মা ভীষণ একা। এই একা থাকতে থাকতে মা'র মনটাও কেমন বুড়িয়ে যাচ্ছে। কতদিন মা-কে বলেছি অফিসে কি তোমার একটাও বন্ধু হয়নি। শুনে ভালোলাগায় ভেসে যাচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম ছেলে চায় আমি যেন ওর মা'র বন্ধু হয়ে উঠি। আমিও তো তাই চাই। পৃথা সারাজীবনের মতো তোমার বন্ধু হতে চাই। আমি ঋত-কে আশ্বস্ত করেছি, বলেছি তোমার মায়ের সব কষ্ট আমি দেখব। তুমি চিন্তা করো না। আমি যে পৃথার দায়িত্ব নেবার কথা বলেছি একথা ভেবেই এখন আমার সুখ হচ্ছে। আমি এত ভীতু যে স্বপ্ন দেখতেও ভয় পেতাম। সেই আমি এখন পৌঁছে গেছি স্বপ্নের দরজায়। যেখান থেকে শু(হবে আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। নিজেকে ভালোবাসা কাকে বলে তা জানতাম না। পৃথার দিকে তাকিয়ে নিজেকে ভালোবাসতে শিখছি। যখন আমি স্বপ্নার প্রেমে পড়েছিলাম তখনও এত আবেগ আমার মধ্যে ছিল না। আমাদের সেই প্রেম ছিল খুবই সাদামাটা। আমি বুঝতেই পারিনি প্রেম মানুষকে কী গভীর অনুভবের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত করে। পৃথার প্রতি এই গভীর অনুভূতিই আমার জীবনের সম্পদ।

ইন্দ্রাণী

আমাদের কাজ করে খেতে হয়। সেজন্য স্বপ্ন দেখতে নেই। স্বপ্ন দেখলে শুধু শুধু কষ্ট পেতে হবে। দরকার কী এত কষ্ট পেয়ে। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে আমারও ইচ্ছা হয় না। মুশকিল হল 'তুমি যাও বঙ্গে তোমার কপাল যায় সঙ্গে'।

আমি যত বেশি ঋতদাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি ও ততই দেখি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি না পারছি এগোতে না পারছি পেছোতে। এ অবস্থায় একদিন মাকে বলেছিলাম মা আর একটা ভলো কাজ খুঁজে দেখ না। শুনেই তো মা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছে। কেন এ কাজটা খারাপ কীসে। এরা মাথায় তুলে রেখেছে তাই বুঝি তোর সহ্য হচ্ছে না। মৃদুভাবে বলার চেষ্টা করলাম কাজের তুলনায় এরা তো মাইনে বেশি দেয় না। মা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, কাজ, কাজ কোথায় রে, দুটি তো প্রাণী। এটা ছেড়ে সাত ভাতারের সংসারে গেলে তো চামড়া চুষে নেবে। রেগে গেলে মা-র মুখ দিয়ে এসব ভাষা বেরিয়ে আসে। মাকে আর বেশি ঘাটালুম না। আমার যে

সমস্যা সেটা সেখানেই রয়ে গেল। আসলে আমি নিজের কাছেই পালাতে চাইছিলুম। একধরনের অসহায়তা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। কী যে করব, কী যে করা দরকার সেটা ভেবে ভেবেই এলোমেলো চিন্তা আমার সুস্থ চিন্তাগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছিল। বোকার মতো ভাবছিলাম এখান থেকে পালানোর কথা। ঋতদার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। ওর প্রতি অনুরাগ আমাকে দূরের দিকে নিয়ে যেতে চাইছিল।

বুঝতে পারছি আমার কপালে অনেক দুঃখ আছে। লোকে বলে না তোর দুঃখে শেয়াল-কুকুরও কাঁদবে না। আমারও সেই অবস্থা হবে। আমার বাবা, মাকে ছেড়ে আরও দুবার বিয়ে করেছে। আমার সেই দুটো মাও লোকের বাড়ি কাজ করে খায়। আমার গতি কি আর তার চেয়ে ভালো হবে। আমি তো বসেই আছি কবে মাতালের ঘরে ঢুকব আর বছর না পেরোতেই কোলের বাচ্চা রেখে ছুটব বাসন মাজতে। আর গিন্নি না থাকলে শুতে হবে বাবুর বিছানায়।

ঋতবান

মানুষের বোধহয় সবচেয়ে বড়ো সমস্যা নিজেকে চেনা। আমার মনে হত নিজেকে সবচেয়ে ভালো বুঝি। আমার চাওয়া-পাওয়া-ভালোলাগা-না লাগা এগুলোর স্পষ্ট ধারণা আমার আছে। আমার মনে হচ্ছে আমি একটু ভুল অহমিকার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয়েছি। অপালার সঙ্গে সেদিনের পর থেকে প্রচণ্ড একটা অবসাদ আমাকে গ্রাস করেছিল। মানসিকভাবে এক ধাক্কায় ওর থেকে দূরে সরে গেছি, তাতে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না, সেটা নতুনভাবে অনুভব করছিলাম তা হল ইন্দ্রাণীর প্রতি একটা চোরা টান। আমি নিজেকে বারবার বি(েষণ করার চেষ্টা করেছি, এই টান আমার আগের থেকে ছিল না তো। আমি একশোভাগ নিশ্চিত হয়েছি ছিল না। ফলে অবসাদ আমাকে গ্রাস করছিল। ন্যায়-অন্যায়ের চাপের মধ্যে দিয়ে ভাবনাগুলো পরিচালিত হচ্ছে। অপালার বিষ ঝরানো গলায় কাজের মেয়ে, কাজের মেয়ে কথাটা আমাকে খানিকটা দিশেহারা করে দিয়েছে। ওর বারবার বলা ছিঃ শব্দটা আমাকে শঙ্কায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। সংস্কারের কাঁটা যেন আমাকেও বিদ্ধ করতে চাইছে।

নিজেকে বারবার প্র(করেছি কোথাও ভুল হচ্ছে না তো? না আমার ভুল হচ্ছে একবারও মনে হয়নি। নিজের মনের কাছে আমি পরিষ্কার হয়েছি। আমার যুক্তি(বোধ আমাকে মানবিক হতে সাহায্য করেছে। ইন্দ্রাণীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশে তাই দ্বিধার আশ্রয় নিইনি। একদিন দুপুরে জোর করে ওকে নিজের ঘরে এনেছি — বলেছি তুই আমাকে কেন এড়িয়ে চলিস। তুই বুঝিস না তোকে কী ভীষণ পছন্দ করি। তোকে ছাড়া চলবে কেমন করে। আয় আমাকে একটু আদর করে দে।

ইন্দ্রাণী

একী হল। এ যে আমার স্বপ্নেরও বাইরে। আমি এখন প্রচণ্ড সুখের আবেশে ডুবে যাচ্ছি। কোনোদিন ভাবিনি এত সুখ জীবনে আসতে পারে। যদি আর কোনোদিনও ঋতদা আমাকে কাছে না ডাকে তাহলেও কোনো দুঃখ থাকবে না। মৃত্যুও আমার কাছে এখন তুচ্ছ। কেমন করে কল্পনা করব ও আমাকে হাত ধরে এমন করে টেনে নেবে। কোমরে হাত দিয়ে যখন কাছে টেনে নিল ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি হতবাক্। তখন আমার দমবন্ধ হওয়া অবস্থা। মুহূর্তের মধ্যে দেখতে পেলুম পাগলের মতো ও আমার বুকে মুখ ঘষছে। কাপড় গেছে সরে, ব্লাউজের পল্কা বোতাম গেছে খসে। আমার শরীর সম্পূর্ণ ওর আয়ত্তে। নিজেকে ছাড়ানোর কোনো চেষ্টাই করিনি। ও যেমন ভাবেনি আমিও ভাবিনি দরজাটা খোলা আছে। ঋতদা হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দরজাটা বন্ধ করে এল, সে সময় আমার পালাবার ইচ্ছে হয়নি, ভালোলাগা, ভয় আর অসহায়তা মিশে তখন আমি প্রায় চেতনাহীন। ও এসে আমার ভারহীন শরীরটাকে খাটে তুলে নিল। জানি না আমার শরীরে কোনো আবরণ ছিল কিনা। ওর পাগলের মতো চুমু আমার চেতনাকে যেন বলছিল, দেখো, নিজেকে দেখো। শরীর জুড়ে ওর ওই আ(-য চুমুগুলো হঠাৎ আমাকেও জাগিয়ে দিল। আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। শরীর যে এত সুখ দিতে পারে, এত আনন্দ দিতে পারে, এত পাগল করতে পারে সেটা কি আর জানতুম। নিজের অজান্তেই দু-হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরেছি, ধরেছি প্রাণপণে যেন ও ছেড়ে না দেয়। ওর অজস্র চুমুর বিনিময়ে একটা চুমুও ফিরিয়ে দিতে আমার লজ্জা করছিল, ভয় হচ্ছিল। তারপর আস্তে আস্তে আমার শরীর জেগে উঠল। ওকে আঁচড়ে কামড়ে আমার সমস্ত বাসনাগুলো ঢেলে দিলুম। বুঝতে পারছিলাম ও প্রচণ্ড সুখ পাচ্ছে। আর আমি, একে সুখ বলে কিনা জানি না, এ জিনিস জীবনে একবারের বেশি পাওয়া যায় কিনা তাও জানি না। আমি আকণ্ঠ নেশায় ঋতদার শরীরের নীচে নিজেকে সমর্পণ করেছিলাম।

তারপর সেই প্রচণ্ড সুখ — যা এই স্বল্প বয়েসি জীবনকে সুধায় ভরে দিয়েছে তাকে সঙ্গ করে ক্লান্ত ঋতদাকে বিছানায় রেখে বাথ(মে ঢুকে গেলুম। এই প্রথম নিজের নগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলুম আমার বুকেও ভালোবাসার ফুল আছে। ঠিকমতো জল পেলে সে ফুলও তার নিজের গন্ধ নিয়ে জেগে ওঠে। নিজের শরীরের প্রতি ভালোবাসা জন্মাল। অবাক হয়ে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে রইলুম। এই শরীর যে এত সুধা দিতে পারে সেটা জেনে খুশিতে মন ভরে উঠল।

জানি না কত(ণ বাথ(মে ছিলাম, অবশ হয়ে বসে কেবল ভাবছিলাম ঈ(র কেন আমায় এ সুধা দিলেন। আমি কি এই ভার বহনের যোগ্য। বুঝতে পারছি হয়তো আজকের পর

ঋতদার থেকে দূরে, অনেক দূরে চলে যাব। তবু আমার দুঃখ হচ্ছিল না, সুখ আমাকে, আমার শরীরকে, মনকে এমনভাবে বেষ্টন করে ছিল যে মনে হচ্ছিল ঋতদার এই বেষ্টন আমার চিরসঙ্গী। এক জীবনে মানুষের কত প্রাপ্তি জানি না, আমার তো সবই পাওয়া হল।

ঋতবান

মানুষের মধ্যে যে একটা পশু লুকোনো থাকে সে কথা আমি জানি। যার জন্য বলা হয় 'ম্যান ইজ এ র‍্যাশানাল অ্যানিমেল'। কিন্তু সেদিন আমার র‍্যাশানালিটি কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল। ইন্দ্রাণী যদিও বাধা দেয়নি, কিন্তু আমি কী করে ওর ব্লাউজের বোতামে হাত দিয়েছিলাম, কীভাবে ওর শাড়িকে শরীর থেকে অবলীলায় খুলে ফেলেছিলাম তা ভাবলে এখন নিজের কাছে নিজেকেই অচেনা লাগছে। তারপর আমার সমস্ত বন্যতা নিয়ে যখন ওর বুকে মুখ ঘষছিলাম তখন দেখলাম হঠাৎ ওর শরীর জেগে উঠল। আমাকে হতবাক করে আঁচড়ে-কামড়ে অস্থির করে তুলছিল। আমি প্রচণ্ড সুখে ডুবে যাচ্ছিলাম। জীবনের প্রথম শরীরী সম্পর্ক। শরীর যে মানুষকে এত সুখ দিতে পারে সেটা কোনোদিন বুঝতে পারিনি। কেবলই ভেবেছি মন, মনই সমস্ত সুখের আধার। মানসিক সুখই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এখন বুঝতে পারি শরীরও মানুষকে শুদ্ধ সুখ দিতে পারে।

শুদ্ধ বলছি একারণে, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে যে সুখ ভাগ করে নিয়েছি তা আমার সারা জীবনের সম্পদ। সে সম্পদ কখনও হাতছাড়া করব না। ওকে আমার থেকে দূরে চলে যেতে দেব না। ওর যদি আপত্তি না থাকে তাহলে ওর সব দায়িত্ব তুলে নিতে এখনই রাজি। এ আমার কোনো আবেগের সিদ্ধান্ত নয়। আমার অবচেতন মনে ইন্দ্রাণীর প্রতি যে অনুরাগ ছিল ঘটনা প্রবাহে তার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। এই বহিঃপ্রকাশ আমার ভালো লাগছে। জানি অনেক প্রশ্নের সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে। আমার মা, পরিজন, পড়শি, বন্ধুরা মেনে নেবার জন্য কেউ তৈরি নয়। কী আসে যায়, ও তো ওদের কারও ঘর করতে যাবে না। মেনে নিলেই কী না নিলেই কী। আমাদের জীবন কোন্ পথে চলবে আমরাই ঠিক করব, কারও খবরদারি মানার জন্য তো আমি জন্মাইনি।

শুধু ইন্দ্রাণীকে নিয়ে ভাবনা হচ্ছে। ও যদি নিজেকে কাজের মেয়ের বাইরে ভাবতে না পারে তাহলে হবে সমস্যা। এসব নিয়ে কথা বলা খুবই কঠিন। কিন্তু কথা তো আমাকে বলতেই হবে। ওকে বোঝাতেই হবে কোনোরকম খারাপ ভাবনা নিয়ে ওকে গ্রহণ করিনি। ও যাতে ভেঙে না পড়ে আমার উপর বিশ্বাস রাখে সে ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে।

পৃথা

সুদেবকে বাড়িতে আপ্যায়নের পর থেকে ওর সঙ্গে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এখন প্রায় প্রতিদিনই অফিস থেকে বের হয়ে সামান্য কিছু(ণ এদিক-সেদিক ঘুরি, হয়তো কোনো দোকানে বসে সামান্য চা-বিস্কিট বা অন্য কিছু খাই, সে সময়টুকু খুব ভালো লাগে। তখন জীবনকে মধুর মনে হয়। যখন বাড়ি ফিরতে হয় তখন বুকের মধ্যে সামান্য কষ্ট হয়।

এটুকু পেতে গিয়ে অবশ্য আমাকে আর সুদেবকে অনেক অসুবিধের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে। অফিসে কানাকানি তো আছেই, কেউ কেউ বাতাসেও কথা ছুঁড়ে দেয়। যেমন একটা মেয়ে তো হাওয়াকেই বলছিল, হায়, আমাদের মাইনে বাড়াবার কাউকে যে কেন পাই না।

কোনোদিন সুদেব আগে আমি পরে অন্যদিন আমি আগে সুদেব পরে অফিস থেকে বের হয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দেখা করি। সেখান থেকে ময়দান, বাবুঘাট, রেসকোর্স হাঁটতে হাঁটতে সব পেরিয়ে যাই। আগে একটু হাঁটলেই আমার পা ব্যথা করত, এখন সুদেব-এর সঙ্গে মাইলের পর মাইল হাঁটি পা ব্যথা করে না বরং হাঁটা থেমে গেলেই ক্লান্তি এসে শরীরে ভর করে। ওই এক চিলতে ঘর যা ছিল আমার প্রিয় আশ্রয়স্থল সেখানে ফিরতে ইচ্ছে হয় না। বুঝতে পারি সুদেব আমার জীবনে একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আমি যেন নতুন করে নিজেকে চিনতে পারছি। দেরি করে বাড়ি ফিরলেও ঋত কোনোদিন জিজ্ঞেস করে না মা তোমার দেরি হল কেন? আমিই বরং কুণ্ঠিত পায়ে ঘরে ঢুকি, ঋত সামান্য চোখ তুলে স্মিতহাসি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, আমি তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে বাথ(মে ঢুকে অকারণ আত্মর(ার চেষ্টা করি।

কেন যে এটা করি বুঝি না। ঋত কিন্তু খেতে বসে কিছু জিজ্ঞেস করে না। সহজ এবং স্বাভাবিক কথাবার্তা বলে। ওর পড়াশুনার কথা বলে। এও বলে মা এই ছোটো ঘরটায় তোমার অসুবিধে হচ্ছে। আমাদের এবার একটু অন্য ঘরের ব্যবস্থা করা দরকার। মন দিয়ে ওর কথা শুনি। চোখের কোণ দিয়ে দেখার চেষ্টা করি আর একটা ঘরের দরকার আছে ঠিকই কিন্তু সে প্রয়োজন কার জন্য ওর না আমার।

ঋতবান

বেশ কিছুদিন থেকেই মায়ের পরিবর্তন আমি ল(করছি। দেরি করে ঘরে ফেরা কোনো ব্যাপার নয়। মার চোখে-মুখে একটা সুখী সুখী ভাব দেখতে পাই। এমনও হয়েছে। বাথ(মের ভেতর থেকে দু-এক কলি গানও ভেসে এসেছে। আমি তো রবীন্দ্রসংগীত শিখেছি মায়ের কাছ থেকে। সেদিন শুনলাম মা গাইছেন — তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই। আমার খুব ভালো লাগছে — মা যদি আনন্দময় জীবনে ফিরে আসে তাহলে আমার চেয়ে বেশি খুশি হওয়ার আর তো কেউ আমাদের নেই। আমি জানি না মায়ের এই খুশির উৎস কী? অনুমান করার চেষ্টা করি হয়তো সুদেব বাবু, হয়তো অন্য

কিছু। তবে সেটা যাইহোক, আমার দুঃখী মা যে সুখী হচ্ছে এর চেয়ে বড়ো প্রাপ্তি আর কিছু নেই। মাকে খুশি রাখাই তো জীবনের সবচেয়ে বড়ো কাজ।

শুধু ছোট্ট একটা কষ্ট পাচ্ছি, ঠিক এই সময়েই আমার জীবনে ঘটে গেছে একটা ঘটনা। সেই ঘটনা জীবনে নিয়ে এসেছে কিছুটা পরিবর্তন। মা যদি নিজের মধ্যে বুঁদ হয়ে না থাকত তাহলে নিশ্চয় এ পরিবর্তন বুঝতে পারত। শুধু আমার কেন, ইন্দ্রাণীর মধ্যেও তো এসে গেছে পরিবর্তন। সেই চঞ্চল ইন্দ্রাণী আর নেই, কি অসম্ভব শান্ত হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ওর চোখের কোণা ভিজে হয়ে আছে। আমি ওকে বলেছি — তোর কোনো ভয় নেই। আমরা দুজনে একসঙ্গেই বাঁচব। কী বুঝেছে জানি না, আগে কত কথা বলত, এখন কথা না বলে নীরবে সরে গেছে। মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছা হয় শারীরিক ভাবে ওকে গ্রহণ করতে, ওর চোখ দেখে বুঝতে পারি আমি হাত বাড়ালে আপত্তি করবে না। কিন্তু আমি হাত বাড়াই না, নিজেকে বলি আর একটু অপে(া করো, আর একটু। ও যে আমার উপর বি(াস রেখেছে, ভরসা করেছে সেই তৃপ্তিতেই মনটা ভরে আছে। শরীরের প্রতি (ুধা, শরীর পাওয়ার ইচ্ছা আমাকে প্রবলভাবে টানছে, কিন্তু সেই টান আমি সংযত রাখছি। যদি এই টানে ভেসে যাই তাহলে যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের জীবনে নেমে আসতে পারে বিপর্যয়। আমি সতর্ক খুবই সতর্ক।

যতো সতর্কই থাকিনা কেন — শুধু বুঝতে পারি খুবই বড়ো একটা সংকটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। সে সংকট আমার নয় — আমার মায়ের। নিজের সংকট কাটানোর মতো সাহস আমার আছে। আমার চারপাশের মানুষদের আমি ভালো ভাবেই চিনি। একজন মানুষও অন্য একজন মানুষের সুখে সুখী হতে শেখেনি।

অন্যকে অসুখী দেখতে পেলেই আমরা সুখী হই। কেমন করে এ রকম সামাজিক মনোভাব আমাদের সকলের মনকে বিষাক্ত(করে রেখেছে — সেটা ভেবে কষ্ট পাই। সবাইকে দেখেছি — কেউ কাদায় পড়লে অন্যরা হাসতে দ্বিধা করেনা। মানুষ যে কেমন করে এতো হিংস্র হয় সে কথা ভেবে অবাক হই।

আমি কেন ওদের মতো নই সে কথাও বেশ ভাবি। আমার দুঃখিনি মায়ের কথা ভেবেই কি আমার মন অন্যদের মতো হয়নি।

কি জানি — কিছুই বুঝতে পারিনা। অতোসব ভাবার মতো অবস্থাও এখন আমার নেই। আমার মায়ের কষ্ট দূর করতে পারাই এখন একমাত্র কাজ।

কিন্তু সেটা কেমন করে পারবো একই সঙ্গে মায়ের এবং নিজের জীবনের সংকট আমাকে দিশাহারা করে দিচ্ছে। জানি — বেশ ভালো করেই জানি এ দুটো সংকটের মোকাবিলা আমাকেই করতে হবে। মায়ের খুশি ভরা জীবনকে পূর্ণতা দিতে হয়তো আমাকেই মেনে নিতে হবে কোনো ত্যাগ।

সুদেব

আমি পৃথাকে চেয়েছিলাম। হ্যাঁ সত্যি ওর সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। শুধু আমি কেন যে-কোনো মানুষ ওকে পেতে চাইবে। ভেবেছিলুম সেই পাওয়াটা হবে (ণিকের। শুধু তৃপ্ত করতে চাইছিলুম আমার ইচ্ছাকে। সে ইচ্ছার গতিমুখ ছিল শরীর। ওর ওই সুন্দর শরীরের প্রতি টান আমি সংবরণ করতে পারছিলাম না। সেসময় স্ত্রীর শরীরের প্রতি আকাঙ(া আমার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বারবার শুনতে হত দুটো ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে — এখন আর অত বিরক্ত(করো না, আমাকে চূড়ান্ত (োভের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। শরীর আমাকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিচ্ছিল, অথচ আমার এমন সাহস বা অর্থ নেই যে শরীর দিতে রাজি মেয়েদের কাছে যাই।

দূর থেকে সুন্দর শরীরের মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আমার হতাশা বাড়ত। কেবলই মনে হত এ জীবনে কিছুই পেলাম না। নিজেকে অসম্ভব বঞ্চিত আর প্রতারিত লাগত। মনে হত স্ত্রী আমাকে আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। পাশ ফিরে শুয়ে আমাকে প্রতারণা করছে। রাস্তায় বা বাসের ভিড়ে আমি অন্যমনস্কতার অছিলায় মেয়েদের শরীর ছুঁয়ে যেতাম আর ত্র(মেশ আমার তৃষ(া লেলিহান হত।

আমার স্ত্রী স্বপ্না, আমারই সমবয়সী একসঙ্গে কলেজে পড়তাম, ভালোবেসেই বিয়ে করেছি। কেন যে এমন করে বুড়িয়ে গেল ভেবে অবাক হই। কই আমি তো বুড়িয়ে যাইনি, আমার শরীর তো এখনও প্রতিমুহূর্তে কথা বলে। আমি তাহলে কোথায় যাই। কোথায় যাই, কোথায় যাই করতে করতে পৃথার আবির্ভাব, যাকে পেয়ে উল্লাসে হাত মুঠো করে অদৃশ্য শত্রুর দিকে ঘুষি ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। আজ পৃথা আমার হাতের মুঠোয়, কিন্তু শরীর আর সেভাবে কথা বলে না। সেতারের টুং টাং সুর মনের মধ্যে বাজতে থাকে। ওর হাত আলতো করে ধরে ছেড়ে দিই। এই ধরা আর ছাড়ার মধ্যেই সুখ পেতে থাকি। এই সুখ আমার মধ্যে অন্য এক বোধের জন্ম দিয়েছে যার মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারি শুধু পৃথার শরীর নয় তার মনের দোসর হওয়াই আমার একমাত্র কাজ।

স্বীকার করছি কামনার মধ্যে দিয়েই পৃথার কাছে আসার জন্য সচেষ্ট ছিলাম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে মনোভাব একেবারে বদলে গেছে।

পৃথার সাহচর্য আমাকে নতুন একটা অনুভূতির জগতে নিয়ে গেছে। বেশ বুঝতে পারি হাত ধরার মধ্যে যে আনন্দ আমি পাই শয্যাতেও সে আনন্দ কখনো পাইনি। মনে হয় জীবন যেন অলৌকিক। এ অলৌকিকতার সন্ধান পাব সে কথা কোনদিন ভাবিনি।

জানি পৃথা আমায় বুঝতে পারছেনা। তার চাহিদা নিশ্চিতই অন্যরকম। সে অন্যরকম চাহিদা আমারও ছিল। কোন্ যাদুমন্ত্রে সেটা পাল্টে গেল সে কথা ভেবে নিজেই তো অবাক হচ্ছি।

সব মানুষের জীবনেই দু-ধরনের প্রাপ্তি থাকে — একটা হলো বস্তুগত অন্যটা ভাবগত। এতোদিন বস্তুগত চাহিদার মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করেছি। কেবলি ভেবেছি — নারীর শারীরই হলো সুখের আধার।

কি এক আশ্চর্য কারণে পৃথা যখন আমার উপর নির্ভর করতে শু(করলো তখনি হঠাৎ মনে হলো — না ওকে ভোগ নয় — র(া করাই আমার কাজ। আমার শরীর যেন কেউ এসে হাত বুলিয়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা করে দিল।

শরীর নয় — মনের ভাবনাতেই এখন আমি দিশাহারা। ওই ফুলের মতো নারীকে আমি কেমন করে র(া করবো।

আমি নিজেকেই র(া করতে জানিনা — অন্যকে র(া করার (মতা কি করে আয়ত্ত করবো — সে কথা ভেবে চোখে জল চলে আসে বারবার ঈশ্বরকে বলি — হে ঈশ্বর আমায় তুমি শক্তি(দাও।

ইন্দ্রাণী

একটা আশঙ্কার মধ্যে দিয়ে সময় বয়ে যাচ্ছে। ঋতদা প্রতিদিন মুখের ভাষায়, চোখের কথায় আমাকে আশ্বস্ত করে। কিন্তু আমার মন উচাটন হয়ে থাকে। কই সেদিনের পর তো আর কাছে টেনে নেয় না। সেদিনের মতো বলে না আয় আমাকে একটু আদর করে দে। অথচ ওর থেকে ওটা পাবার জন্য ওকে বুকের সুধা রসে ডুবিয়ে দিতে শরীর আকুল হয়ে থাকে। ইচ্ছা করে লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ি, বারবার বলতে ইচ্ছা করে আমাকে তুমি নাও, আমাকে তুমি নাও।

তৃষ(ায় শরীর আগুনের মতো পুড়তে থাকে, ইচ্ছা হয় শরীরের সব পোশাক খুলে ফেলে ওকে বলি দেখো শুধু একবার তাকিয়ে দেখো এ শরীর তোমাকে দেবার জন্য কত উদগ্রীব হয়ে আছে। সেদিন যে শরীরের আস্বাদ তুমি পেয়েছিলে আজ সে শরীর আরও তপ্ত আরও উন্মুখ তোমার অগ্নিলাভায় শুদ্ধ হওয়ার আকাঙ(ায়। আমি ভী(, বোকা, কেড়ে খেতে না জানা মেয়ে অসহায়ের মতো জ্বলতে থাকি। আমার শরীরে ফুটে ওঠা গন্ধময় ফুলটা বাসি হতে থাকে। নিজেকে বঞ্চিত মনে হয়। কেবলই ভাবতে থাকি আমার শরীর নিয়ে ওর কি কোনো অনুতাপ হচ্ছে। এসব আকাশ পাতাল ভেবে ঋত-এর প্রতি ভালোবাসা বাড়ে না। আমার কেবলই মনে হয় কাপু(ষ, কাপু(ষ, ঋত তুমি একটা কাপু(ষ। তুমি পালাবার মতলব করছ। আমার শরীরকে জাগিয়ে দিয়ে তুমি পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছ। একবারও তাকিয়ে দেখছ না তোমার সংযম একটা মেয়ের শরীর ও মনকে কতটা বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে।

কেবলই ভাবি ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলব কেন তুমি চোখ বুজে থাকো, চোখ খোলো, আমাকে দেখো। আমার দুই স্তন তোমার স্পর্শের আশায় আকুল, হাতে নাও, বুকে নাও, আমাকে বাজাও, আমাকে তুমি পিষে মেরে ফেলো, এত কষ্ট সহ্য করে আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না।

তোমার কাছে মিনতি করছি ঋত আমাকে গ্রহণ করো, গ্রহণ করে আমার শরীরকে তৃপ্ত করো। বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে কিছুই চাইব না। এমনকি আমাকে বিয়ে না করলেও আমার কোনো খেদ হবে না। শুধু আমাকে গ্রহণ করো। আমার শরীর তোমাকে দেওয়ার জন্য উন্মুখ।

পৃথা

আগে মাঝে মাঝে অফিস কামাই করতাম। এখন যত কাজই থাক এমনকি শরীর খারাপ হলেও কামাই করি না। এর একমাত্র কারণ সুদেব। সুদেবকে দেখতে পাওয়া, প্রতিদিন পাশাপাশি হেঁটে এই জনবহুল শহরে একা হয়ে যাওয়া এ আমার এখন নেশার মতো হয়ে গেছে। নিশিতাড়িত মানুষের মতো প্রতিদিন অফিসে হাজির হই, আর যত(ণ সুদেব না আসে কিশোরী বালিকার মতো বুকের ধুক্‌পুকানি নিয়ে ওর জন্য অপে(া করি। ও অফিসে এলে আমার সমস্ত টেনশন দূর হয়ে যায়। তারপর তো ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকানো কখন বাজবে পাঁচটা। অফিসটাকে জেলখানার মতো লাগে। সাজাপ্রাপ্ত আসামির মতো মুখের সমস্ত আলো নিভিয়ে প্রতী(া করি। বুকের মধ্যে দুন্দুভির মতো শব্দ সুদেব-সুদেব-সুদেব। অবাক হয়ে ভাবি এত কষ্ট কী করে সহ্য করতে পারি। ঈশ্বর আমাকে এত কষ্ট সহ্য করার (মতা দিয়েছেন সে কথা তো আগে জানতাম না।

প্রতিদিন সুদেবের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আর আকর্ষণ বেড়ে যায়। আমি চাই ও শক্ত(করে আমার হাত ধরে থাকুক। মাঝে মাঝে গাড়ি পাস দেবার ছুতোয় একেবারে ওর বুকের কাছে চলে যাই, সুদেব কখনও সুযোগ গ্রহণ করে না। সেজন্য কষ্ট যেমন হয় তেমনি আমার প্রতি ওর সংযমী আচরণ আমাকে ওর দিকে আরও টেনে নিয়ে যায়। কতদিন ইচ্ছে হয়েছে আউট্রাম ঘাটে গিয়ে সুদেবের সঙ্গে নৌকায় ভেসে পড়ি। নির্জন নৌকায় সুদেবকে আদর করার গোপন ইচ্ছা মনের মধ্যে লালন করি। হালকা করে ওকে বলেছি মাঝ নদীতে গিয়ে গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাস খেয়ে আসি। ও অদ্ভুত শান্ত ভঙ্গিতে বলেছে গরমের সময় যে-কোনো মুহূর্তে ঝড় উঠতে পারে। যাব, নিশ্চয় যাব, শীত আসুক। আমিও অপে(া করে আছি কবে শীত আসবে। আর গঙ্গার বুকে সুদেবের হৃদয়ের উষ(তায় দূর হবে আমার এত দিনের শীতলতা। অপে(া আমার সহ্য হয় না। জলের দিকে তাকিয়ে সুদেবের দিকে তাকিয়ে হতাশা আসে। শরীরের জ্বালায় আমার অস্থির অস্থির লাগে।

অপালা

ঋতবানের শীতল ব্যবহার সহ্য করে আসছিলাম কারণ ওর উপর আমার আস্থা আছে। কিন্তু আজ ও যে কথা বলল তাতে তো মাথায় আগুন ধরে গেছে। বলে কিনা তোর মতো বড়লোকের মেয়ের সাথে আমি তো জীবন কাটাতে পারব না। মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, ও মিথ্যা কথা বলছে। আমি জানি ওই কাজের মেয়ে ডাইনিটার জন্য আমার সঙ্গে ও সম্পর্ক ছেদ করতে চাইছে। আমি সহজে ছেড়ে দেব না। আমি ওর মা-র কাছে যাব। দরকার হলে ওর আর কাজের মেয়েটার সম্পর্কের কথা বলব, তাতে যদি ঋতকে হারাতে হয় তাতেও পিছপা হব না। ও আমাকে যখন যন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, আমি ওর কপালে কালি লেপে দেব। তারপর দেখব ও কেমন শান্তিতে থাকে। আমি তো ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম। একটা কাজের মাসি, যার জাতের কোনো ঠিক নেই, ঠিক নেই জন্মের, দুপয়সা দিয়ে যাকে পাওয়া যায়, তার জন্য ঋত আমাকে প্রত্যাখ্যান করছে। পু(ষে প্রয়োজনে কাজের মেয়ের শরীর নেয় এটা আমি জানি। এটাতো শরীর নেওয়া নয়, মনে হচ্ছে ঋত ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ওর এই হাবুডুবু খাওয়া শেষ করতে প্রয়োজনে যত টাকা লাগে দেব, ওই ইন্দ্রাণী বা ফিন্দ্রাণী ওকে আমার বাড়ির চাকরানি করে নিয়ে আসব, তারপর দেখব ঋত আমার বাড়ি এসে জল খায় কিনা। তোর যত ইচ্ছা ওই চাকরানিটাকে ভোগ কর আমি বাধা দেব না, তাই বলে বিয়ে ওকে করতে দেব না। ও মেয়ে বস্তির মেয়ে, কত ছেলে ওর শরীর নিয়ে খেলেছে ঠিক নেই, তোকে ও টোপ হিসাবে ব্যবহার করছে, আর তুই শি(িত ছেলে ওই টোপ গিলে নিলি। আমি গেলাচ্ছি তোকে ওই টোপ। ভাবিস তোকে এমনি এমনি ছেড়ে দেব। তোকে না পেলে তোর এমন বদনাম করে দেব যে এই সমাজে তোকে মাথা তুলে বাঁচতে দেব না। সামান্য একটা চাকরানির মোহে তুই আমার প্রেমে অপমান করবি এটা আমি কিছুতেই মেনে নেব না।

ঋত আমি তোর জন্য পাগল, আমাকে তুই দয়া কর, দয়া কর। আমি তোকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখছি। আমার স্বপ্নের সব দরজা তুই বন্ধ করে দিস্ না।

সুদেব

নিজেকে চিনতে না পারা বোধ হয় মানুষের সবচেয়ে বড়ো কষ্ট। কালকের আমি আর আজকের আমির মধ্যে কোনো সাযুজ্য নেই। পৃথাকে পেতে চাওয়া ছিল আমার শরীরের দাবি। হাতের মুঠোয় পৃথা আসার পর শরীর আর সেভাবে জেগে ওঠে না। স্বপ্নার অনাদর-অবহেলা আর তাচ্ছিল্য আমাকে অন্য নারীর প্রতি প্রলোভিত করেছে এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। আমি কোথাও একটা আশ্রয় চাইছিলাম। সেটাকে শরীর ভেবে ভুল করেছি। পৃথার কাছে আশ্রয় পাবার পর ঠিকভাবে নিজের দিকে তাকাতে পারছি। শরীরের প্রতি আমার নিশ্চয় আগ্রহ আছে কিন্তু সেটাই মূল নয় — মূলত আমি এমন একজন মানুষ শৈশবে এবং কৈশোরে যার আশ্রয়স্থল ছিল না। যৌবনে এসে সেটা স্ত্রীতে পরিবর্তিত হয়েছে। যে ইচ্ছা নিয়ে পৃথাকে পেতে চেয়েছিলুম এখন স্পষ্ট বুঝতে পারি পৃথা আমার সে ইচ্ছা পূরণ করতে চায়।

কারণে অকারণে শরীরের খুব কাছে চলে আসছে। পাশাপাশি হাঁটার সময় ওর সুডোল বুকের স্পর্শ প্রায় আমাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। জানি না কীভাবে আমি সংযত থাকছি। যে আমি পৃথাকে শারীরিক ভাবে পাবার জন্য ব্যাকুল ছিলাম সেই একই আমি নির্মোহের চাদর কী আশ্চর্যভাবেই না শরীরে জড়িয়ে নিয়েছি। আমার কি আর শরীর পেতে ইচ্ছা করে না, করে, করে, ভীষণ ভাবে করে, কিন্তু শরীরের চেয়ে এখন আমি বেশি আগ্রহী ওর সঙ্গ পেতে। সারাটা দিন অপে(া করে থাকি কখন বিকেল হবে। ওর সঙ্গে দু-ঘণ্টা, কখনও কখনও তিনঘন্টা কী মধুর সময় হাঁটাহাঁটির মধ্যে বয়ে যায় তার স্বাদ কি আগে কখনও পেয়েছি।

কেবলই মনে হয় পৃথার সঙ্গে ওটা একবার হয়ে গেলে ওর প্রতি আমার এত যে টান সেটায় ভাঁটা পড়বে। যদিও শরীরের প্রতি টানেই ওকে পেতে চেয়েছি — আজ আমি সেখান থেকে অনেকখানি সরে এসেছি। কেন যে সরে এলাম সেটাও কী আমি বুঝি।

স্বপ্না

হঠাৎ একটা উড়ো চিঠি পেয়ে আমি তো একেবারে হতবাক্। খবরের পাতায় আর গল্প উপন্যাসে উড়ো চিঠির কথা পড়েছি বটে, সেটা যে আমার জীবনেও ঘটবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। আমার অমন ল্যাদাপ্যাদা স্বামী, সে যে সত্যি এমন কাণ্ড করেছে তা জেনে অবাক হয়ে যাচ্ছি। মুশকিল হচ্ছে এ চিঠির কথা কাউকে বলতে পারছি না। তাতে তো আমারই সম্মান নষ্ট হবে। আমার বাপের বাড়ি বা শ্বশুর বাড়ির দুদিকের লোকজনই যথেষ্ট শি(িত, ভদ্র এবং প্রতিষ্ঠিত। তারা যদি এসব জানে তাহলে তো সবচেয়ে আগে আমার পায়ের তলার মাটিই সরে যাবে। বিয়ের দশ বছর পর এ কী সমস্যায় পড়া গেল। আমার তো বেশ সুখী জীবন। এই সুখী জীবনে সমস্যা কি নেই। সমস্যা কোন সংসারে নেই, ঘরে ঘরে এমন সব অবস্থা কাঁথা কানি চাপা দিয়েও সেসব লুকোনো যায় না। অন্যের বাড়ির সেসব ঘটনা শুনতাম আর স্বস্তিতে থাকতাম। কিন্তু আমার ঘরেই যে সাপ ঢুকে বসে আছে সেটা তো টের পাইনি। পরের ঘরে সাপ নিয়ে থাকার স্বস্তিই তো আমার কাল হল।

কার কাছে যাই, কার কাছে যাই ভাবতে ভাবতেই মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। আর চিঠির ভাষা কী বিচ্ছিরি। যারা এসব চিঠি লেখে, হাতের লেখা দেখে তো মনে হয় পড়াশুনো জানে, তাহলে এসব লিখতে কি হাত কাঁপে না। আমার স্বামী

অফিসে প্রেম করছে — সে পর্যন্ত ঠিক আছে তারপর যেসব কথা লেখা আছে তাতে মনে হয় যে ঘরে প্রেম করছে সে ঘরের চৌকির তলায় ওরাও বসে ছিল। না হলে আমার স্বামী সেই মাগিকে কী বলেছে জানবে কী করে। জানি ক্রে(াধ এসে আমাকে অসংযত করে দিচ্ছে, নিজেকে সামলাতে পারছি না, এ অবস্থায় কেই বা আর নিজেকে সামলাতে পারে। পু(ষ মানুষের শরীরের প্রতি লোভের কথা কি আমি জানি না। কতদিন আমার ইচ্ছার বি(দ্ধেও ওর খিদে মেটাতে হয়েছে। এখন অবশ্য ওকে মোটেই পাত্তা দিই না। শরীরের প্রতি আমার সব আগ্রহ মরে গেছে। ছেলেমেয়ে দুটো মানুষ করতেই যা পরিশ্রম হয় তারপর রাত্তির বেলা ওসব ইচ্ছা থাকে না। তাই বলে অন্য মেয়ের সঙ্গে ওকে এসব করতে দেব নাকি?

ঋতবান

মানুষ যে কত নীচ আর পরশ্রীকাতর হতে পারে একটা উড়ো চিঠি আর অপালাকে দেখার পর কিছুটা অনুমান করতে পারছি। অপালার মতো শি(িত মেয়ে যে ভাষায় আমাকে গালাগালি করেছে সে ভাষা একটা ছেলে হয়েও জানতুম না। হায় প্রেম, তুমি এত প্রতিহিংসাপরায়ণ যে অপালার মুখ দিয়ে বের করে আনো 'তোর মতো লুচ্চার পোঁদে আমি ..... ইয়ে ঢুকিয়ে দেব'। আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভেবেছি ইন্দ্রাণী কীভাবেই না আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এ মেয়েকে যদি বিয়ে করতাম সারাজীবন আমার পেছনে তাহলে ইয়ে ঢুকেই থাকত। না, আমি কোনো প্রতিবাদ করিনি মেনে নিয়েছি ইন্দ্রানী বেশ্যা, জারজ, খানকি, বারো ভাতারি, সব, সব। একটা সমস্যায় যখন জর্জরিত তখন এই উড়ো চিঠি। আমার মা সুদেব কাকুর সঙ্গে প্রত্যহ লীলা খেলায় মত্ত। এ চিঠিতেও এমন সব কথা লেখা আছে যা ছেলে হয়ে পড়লে যে কোনো ছেলের মাথা গরম হয়ে যাবে। হয়তো মাকে খুনও করে ফেলতে পারে। মাকে বেশ্যা, খানকি ইত্যাদিও লিখেছে।

আমার কিন্তু একটুও বিকার হয়নি। হয়তো হত যদি কয়েকদিন আগে অপালার মুখের ভাষা আর শরীরের আক্র(মণাত্মক চেহারা না দেখতাম। অপালা আমার একটা উপকার করে দিয়েছে। আমার মা-র ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারছি। সব খারাপের মধ্যেই যে একটা ভালো থাকে এটা তারই প্রমাণ। আমি একটুও বিচলিত হচ্ছি না। এ চিঠিকে গু(ত্ব দিয়ে আমার আর মার জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করব সেরকম বোকা আমি নই। আমার দুঃখিনী মা যদি কোথাও কোনো আনন্দের উৎস খুঁজে পায় সেখানে নৈতিকতার লাঠি নিয়ে নিজেকে হাজির করতে রাজি নই। প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজের শরীরকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করার অধিকার আছে।

নৈতিকতার মানদণ্ড নিয়ে ভালো ভালো কথা বলা যায়। তাতে শরীরের দাবিকে অবদমিত করা হয়। সেই অবদমন যদি স্বেচ্ছাকৃত না হয় তাহলে সৃষ্টি হয় সমস্যার। আমার মা-র সম্বন্ধে এ উড়ো চিঠিতে যা লেখা হয়েছে বি(্বাস করি তা অসুয়া প্রসূত। মা-র কোনো পু(ষ বন্ধুর প্রতি অনুরাগ আমার মোটেই খারাপ লাগছে না।

সুদেব

কী অদ্ভুত সমাজেই না আমরা বাস করি। কতদিন কত ভুল কাজ করেছি, কত অন্যায় করেছি, কত লোককে ঠকিয়েছি। এমনও মনে পড়ে দোকান থেকে জিনিস কিনে বিক্রে(তার অন্যমনস্কতার সুযোগে পালিয়ে এসেছি। এখনও মাঝে মাঝে কনডাকটার না চাইলে বাসের টিকিট কাটি না। তার জন্য কোনোদিন কোনো শাস্তি পেতে হয়নি। অথচ কোনো অন্যায় না করা সত্ত্বেও আমার পারিবারিক জীবনে নেমে এসেছে গভীর বিপর্যয়। স্বপ্নার দখলদারি আর তাচ্ছিল্য আমাকে পৃথার দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। হ্যাঁ, আমি এভাবেই বলতে চাই। যদি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার পেতাম, আমাকে যদি মর্যাদা দিত, আমার শরীরের সামান্য চাহিদা পূর্ণ করত, তাহলে নিশ্চয় এভাবে বয়ে যেতাম না। আমি তো বিয়ে করেছিলাম আনন্দময় মধুর একটা সংসারের স্বপ্নে।

জানি অফিসে যারা আমাকে সহ্য করতে পারছে না তারাই ওই নোংরা চিঠি স্বপ্নার কাছে পাঠিয়েছে। মারমুখী স্বপ্নাকে আমি ঠেকাতে পারিনি। অজস্র কিল, চড়, লাথি, ঘুঁষি মেরেছে। আমি শুধু আত্মর(ার চেষ্টা করেছি। তাতে স্বপ্না আরও ি(প্ত হয়েছে, ভেবেছে যখন প্রতিবাদ করছি না তখন সব সত্যি। হ্যাঁ সত্যি, সম্পর্কের কথা সত্যি, কিন্তু সত্যি নয় চিঠিতে লেখা একটা শব্দও। কামের ওরকম অ(ীল বর্ণনা অফিসের কে যে লিখতে পারে সে কথা ভেবেই পাচ্ছি না। সকলের মুখ মনে করার চেষ্টা করছি, কে পারে, কে পারে, এরকম একটা নোংরা চিঠি লিখতে, না কাউকেই চিহ্নি(ত করতে পারছি না। বুঝতে পারছি একটা গভীর খাদের মধ্যে আমাকে এখন জীবনযাপন করতে হবে। পৃথার সঙ্গ আমাকে ত্যাগ করতে হবে। পারব কি। পৃথাকে বাদ দিয়ে পুরোনো জীবনে ফেরা কি সম্ভব অথবা সব কিছু বাদ দিয়ে ওকে নিয়ে নতুন জীবন। না অসম্ভব, নতুন জীবন এ জীবনে আর হবে না। জানি আমি ভী(। স্বপ্না আমাকে কাপু(ষ বলে। সে যাই বলুক পৃথাকে কোনোভাবেই আমি ঠকাইনি। যৌনতার যেসব বর্ণনা চিঠিতে লেখা হয়েছে সবটাই কাল্পনিক। স্বপ্না সেই কষ্টকল্পনার উপর দাঁড়িয়ে আমাকে উৎপীড়ন করেছে। আমি নীরবে সব সহ্য করেছি শুধু পৃথার কথা ভেবে। নতুন কোনো অশান্তি এনে জটিলতা বাড়াতে চাই না।

পৃথা

আমি এখন একটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি। এই

৩৭/৩৮ বছরের জীবনে যা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। এই নতুন জীবন আমাকে নেশার মতো পরিচালিত করছে। এর আগে জীবনকে কখনও এত ভালোবাসিনি। জীবন যে এত সুন্দর এত মধুর তা ছিল কল্পনার বাইরে। সারাজীবন কষ্ট পেয়েছি নিজের দারিদ্র্যের কথা ভেবে। গরিব বাবা-মা গরিব স্বামী ছিল একমাত্র অবলম্বন। আজ বুঝতে পারি অর্থ ছাড়াও জীবনের একটা মধুর দিক আছে, তা হল প্রেম-ভালোবাসা।

নিজেকে বারবার প্র(করে দেখেছি — আমি কি সুদেবের প্রেমে পড়েছি। হ্যাঁ আমি ওর প্রেমে পড়েছি ওর প্রেমই আমাকে এমন রমণীয় করে তুলেছে। সাজতে ভালোবাসতাম, কোনোদিন সাজের উপকরণ কিনতে পারিনি। স্বামীর ঘরে এসেও সেই একই অবস্থা। সাজার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কী হবে সেজে, তারপর ঋত যখন বড়ো হচ্ছে তখন তো আরও উদাসীন হয়ে গেছি। সেই উদাসীনতাই ছিল এতদিন আমার জীবনসঙ্গী। সুদেব আসার পর এখন নিজের দিকে তাকাতে আমার স্বাদ হয়। আমি যে সুন্দর সেই বোধ এখন নিজের দিকে তাকাতে আমার স্বাদ হয়। আমি যে সুন্দর সেই বোধ এখন আমাকে নতুন ভাবে আবার নাড়া দেয়। সুদেবের চোখে আরও সুন্দর হয়ে উঠতে চেষ্টা করি। নিজেকে ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়। বুঝতে পারি অনেকের চোখের দৃষ্টি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়। নিজের প্রতি যে মমত্ববোধ আমার ছিল না তা জেগে ওঠে। ভালোবাসা পাবার জন্য মন আকুল হয়ে থাকে। সুদেবকে মুগ্ধ করার কথাও আমার মনে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি আমার সেজে ওঠার সবটাই তো সুদেব-এর জন্য। ওকে দিতেই তো এত প্রস্তুতি।

প্রতিদিন অফিস থেকে বাড়ি এসে সংসারের খুঁটিনাটি যেগুলো অসম্পূর্ণ থাকত সেগুলোর জন্য কাজের মাসি আর তার মেয়েকে বকাবকি করতাম। এখন বাড়ি ফিরে এসে সেসব দেখতে ইচ্ছা হয় না। সংসার তার নিজের নিয়মে শত অনিয়মে ঠিক চলে। আমি আমার ভাবনায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখি। ভাবি সুদেব-এর কথা, নতুন জীবনের কথা। ঋত এসে আমার ভাবনায় মাঝে মাঝে ছায়া ফেলে বটে, তার জন্য উৎকণ্ঠিত হই না। কোথা থেকে যে এত বেপরোয়া মনোভাব এল আমি বুঝতে পারি না। শুধু মনে হয় আমি পালটে যাচ্ছি। পুরোনো খোলস ছেড়ে যেন নতুন খোলসের পৃথার নবজন্ম হচ্ছে। আমার ভাবনায় ঋত আসে না। ওর অস্তিত্ব যেন আমার কাছে শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্না

আমার এত সাধের সাজানো সংসারে যে এভাবে আগুন লেগে যাবে স্বপ্নেও আমি ভাবিনি। এ আগুন আমাকে নেভাতেই হবে। সুদেবকে ছেড়ে বাঁচব কী করে, আমার দু'টো ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে তাদের কোথায় ভাসিয়ে দেব। ওকে যথেচ্ছ কিল-চড়-লাথি-ঘুঁষি মেরেছি বটে, তাতেই তো আর সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে না। ওর মতো এত সাধাসিধে গোবেচারি মানুষও যে এত বিচ্ছিরি ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে পারে সেটা আমার কাছে খুবই আশ্চর্যজনক। মেয়েরা সব পারে। পারে না শুধু নিজের স্বামীকে অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে। আমি পারব না কিছুতেই ওকে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে। তাহলে তো আমাকে পাগল হয়ে যেতে হবে। আমার কোনো চাহিদা নেই, শুধু একটাই চাহিদা আমার স্বামী আমারই থাকবে। সেখানে আমি কাউকে ভাগ বসাতে দেব না। ও আমার থেকে শরীর পায় না সেকথা আমি মানি। এখন থেকে চেষ্টা করব ওকে শরীর দিতে। তাই বলে অন্য কারোর শরীর ওকে আমি নিতে দেব না, দেব না।

একসঙ্গে কলেজে পড়ার সময় থেকে ওর সঙ্গে পরিচয়। খুবই সাধারণ স্বপ্ন দেখা একটা ছেলে। প্রথমদিন আলাপের পর আমাকে বলেছিল আমি খুব স্বপ্ন দেখতে ভয় পাই — কিন্তু স্বপ্ন-র সঙ্গে যদি স্বপ্না যোগ হয় তাহলে বোধ হয় ছোটো স্বপ্নও বড়ো হয়ে যায়। আমার খুব মজা লেগেছিল। ওর ওই সামান্য কথা আমার কাছে অসামান্য মনে হয়েছিল। আমিও তো সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, আমারও কি খুব বেশি স্বপ্ন ছিল। ছিল না বলেই তো সুদেব-এর হাত ধরতে আমার দ্বিধা হয়নি।

আমার মনে পড়ে সুদেবদের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যখন পরিচয় হয় ওর এক বউদি বলেছিল সুদেব-এর মতো ভী(ছেলেও যে প্রেম করতে পারে, সেটা দেখে ওরা অবাক হয়ে যাচ্ছে। তারপর তো অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেল, আমার কখনও মনে হয়নি ও খুব সাহসী। ওর বউদির কথাই ছিল সত্যি। ও সত্যি ভী(প্রকৃতির মানুষ। সেই সাধারণ ভী(প্রকৃতির মানুষটা কী করে এমন একটা কাণ্ড করে ফেলল আমার বুদ্ধিতে কিছুতেই তা কুলোচ্ছে না। কুলোচ্ছে না বলে বসে থাকলে তো হবে না, আমাকে তো খোঁজ নিতেই হবে যে সাপ আমার ঘরে ঢুকেছে সে সাপের বাসা কোথায়।

ঋতবান

মায়ের পরিবর্তন আমার বেশ চোখে পড়ছে। যেদিকেই অমনোযোগ থাকুক আমার প্রতি তার কোনো অমনোযোগ ছিল না। এখন দেখতে পাই মা কত উদাসীন। সংসারে ছোটোখাটো ভুলের জন্য মা ইন্দ্রাণী আর ওর মাকে কত বকাবকি করত। আর এখন বড়ো বড়ো ভুলও মা-র চোখ এড়িয়ে যায়। এমনও হয়েছে নুন বেশি হয়েছে বলে আমি তরকারি খেতে পারছি না, মা অবলীলায় উদাসীন ভাবে সে তরকারি খেয়ে নিয়েছে। মা-র ভেতরের পরিবর্তনটা বেশ বুঝতে পারছি। বাইরেরও বেশ কিছু গুণগত পরিবর্তন ল(করছি, যেমন মা-কে কোনোদিন সাজতে দেখিনি, এখন সাজার নানান উপকরণ ঘরে এসেছে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি মা প্রতিদিন নতুন নতুন শাড়ি পরে অফিস যাচ্ছে। এক শাড়ি দুদিন পরে এমন আমার মনে হয় না।

খুব সচেতনভাবে ল(না করলেও মনে হয় মা-র শাড়ির রংও পালটে যাচ্ছে। এসব অবশ্য আমার ভালো লাগছে। আমার দুঃখিনী মা যদি কোনোভাবে শান্তি পায় — সে যদি সুখ পায় তাহলে তো সব চেয়ে বেশি সুখী হব আমি।

আমার অবশ্য মনে থাকছে উড়ো চিঠিটার কথাও। সেটা নিয়েও আমার ভাবনা চিন্তা আছে। জানি এ সমস্যা মাকে যেমন বিব্রত করবে আমারও তেমনি বিব্রতর কারণ হচ্ছে। তবে যারা এধরণের কাজ করে বেসিক্যালি তারা কাপু(ষ, সুতরাং তাদের মোকাবিলা করা কঠিন কাজ নয়। সমস্যা হল তারা কাদা ছিটোচ্ছে। সে কাদা আমার মায়ের গায়ে এসে যখন লাগবে তখন আমার ভালো মানুষ মা-তো দিশাহারা হয়ে যাবে। সে তো আমার মতো শক্ত(মনের মানুষ নয়। তার উপর সেই পু(ষটি মায়ের বন্ধু, সুদেব বাবু — তারও তো সংসার আছে তিনি কী করে গোটা ব্যাপারটা সামলাবেন। দুটো পূর্ণবয়স্ক নরনারী নিজেদের প্রয়োজনে স্বাভাবিক ভাবে মেলামেশাও করতে পারবে না কিছু বিকৃত মানুষের আচরণে এর চেয়ে বড় বেদনা আর কী আছে। মানুষ যখন নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না সে তখন অন্যের ইচ্ছা পূরণেও বাধা সৃষ্টি করে। মানুষের এইসব নীচতার কথা ভেবে খুব কষ্ট হয়।

অপালা

আমি বোধ হয় হেরেই গেলাম। ওই ইন্দ্রানী মেয়েটা নিশ্চিতই ওকে শরীরের ফাঁদে বেঁধে ফেলেছে। পু(ষ মানুষের মন তো জানি। সুন্দরী মেয়ে পেলে তার আর কোন দিকে হুঁস থাকেনা। যদিও ঋতকে আমি অন্য রকম মনে করেছিলাম — এখন বুঝতে পারছি আমার আর কিছুই করার নেই।

কিন্তু যে ব্যাপারটা বুঝতে পারছিনা তা হলো একটা কাজের মেয়ের প্রতি ওর অনুরাগের তীব্রতা। কেমন করে মেনে নেবো যে ওই মেয়েটাকে ও শ্রদ্ধা করে। সে কথা শুনে তো আমার মুর্চ্ছা যাওয়ার অবস্থা।

আমি ঋতকে নির্লজ্জের মতো বলেছি তোর শরীরের প্রয়োজন — আমি তোকে সব দেবো। তোকে সব কিছু উজার করে দিতে পারলে আমি নিজেই ধন্য হয়ে যাবো।

ঋত আমার সে কথায় কান তো দেয়নি — উল্টে বলেছে — অসভ্যতা করিস না — তোর মতো শি(িত মেয়ের কাছে এটা আমি আশা করি না।

আমার তো মনে হয় ওকে ভুল কিছু বলিনি। কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আর কোন কিছু বলতে সাহস হয়নি। ওকে হারানোর ভয়ে ওর সব কথা আমাকে মেনে নিতে হচ্ছে।

কাছাকাছি থাকার সুবাদে ইন্দ্রানী যে ওকে অনেকখানি গ্রাস করে ফেলেছে সে কথা বেশ বুঝতে পারছি। একটা কাজের মেয়ের কাছে হেরে যাবো একথা ভেবে যে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।

কতো ঝগড়া করলাম — কতো বোঝালাম কিন্তু কিছুতেই ঋতর মনকে টলাতে পারছিনা। ঋত কেমন করে এত নিস্পৃহ কথা বলতে পারে সে কথা ভেবেও শঙ্কিত হচ্ছি। বুঝতে পারছি আমার আর কোন উপায় নেই — শুধু অবাক হয়ে ভাবছি — ওই ইন্দ্রানী মেয়েটা যে মন্ত্রে ঋতকে বশ করলো সে মন্ত্র আমি কার কাছে শিখি।

স্বপ্না

লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে আমি ওর অফিসে গিয়েছিলাম। আসলে মাথা ঠিক না থাকলে যা হয়। গিয়ে কার সঙ্গে কথা বলব, কী কথা বলব অথবা উড়ো চিঠির কথাই বা কাকে জিজ্ঞেস করব এসব চিন্তা আমার মাথায় ছিল না। মাথায় ছিল শুধু সেই সাপটা, যে সাপটা আমার স্বামীকে পেঁচিয়ে ধরেছে তাকে দেখা।

গিয়ে তো বসেছি ওর টেবিলে, ও খুব শঙ্কিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বারবার বলছে তুমি কেন অফিসে এলে, কেন এলে। ওর কথার জবাব না দিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলুম। দেখলুম প্রায় সব সহকর্মীই কাজ বন্ধ করে আড়চোখে আমাদেরই দেখছে। আর আমি খুঁজছি সেই সাপিনিকে, যাকে দেখে আমার স্বামী আমাকে ভুলেছে।

একজনকে অবশ্য সন্দেহ হল। নতমুখে কাজ করে চলেছে। একবারও আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না, দেখতে পেলুম তিনিই একমাত্র সুন্দরী যার প্রেমে আমার স্বামী পাগল হতে পারে। অন্য মেয়েদের চেহারার ছিরি দেখে মনে হল ওদের প্রেমে সুদেব পড়তে পারে না।

আমি ওকে নীচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, ওই মেয়েটা তো? দেখলাম সুদেব মাথা নীচু করে প্রচণ্ড ঘামছে। আমি যা বোঝার বুঝে নিলাম। অফিসের অতগুলো কৌতূহলী চোখের সামনে দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে এলুম। ওই মেয়েটাকে দেখে যা বোঝার বুঝে গেছি। সুন্দরী মেয়েদের প্রতি পু(ষের সেই চিরকালীন টান। সেজন্যই আমার মা বলতেন পু(ষকে কখনও আল্‌গা দিতে নেই। তা হলে সে অন্যের খেতের আলুটা-মুলোটা খেতে ছুটবে।

সুদেব

আমি কল্পনা করতে পারিনি স্বপ্না গিয়ে অফিসে হাজির হবে। ওকে দেখে ভয়ে হাত-পা কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল এ(ুনি আমার হার্ট ফেল হবে। আমি বেশি(ণ বাঁচতে পারব না। কী কষ্টে যে নিজেকে দমন করেছি তা ভেবে এখনও অবাক লাগে। আমার চোদ্দ পু(ষের ভাগ্য যে স্বপ্না সেখানে কোনো অশালীন ব্যবহার করেনি। শুধু পৃথাকে ইশারায় দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছে ওই সেই মেয়ে কিনা। আমি প্রবল আশঙ্কা নিয়ে মাথা নীচু করেছি, ভেবেছি অফিসে এ(ুনি একটা বিস্ফোরণ হবে। প্রচণ্ড

ঘামে গেঞ্জি-জামা ভিজে জবজবে হয়ে গেছে বুঝতে পারছি কিন্তু স্থাণুর মতো মাথা নীচু করে বসে ছিলাম। আমার অবাক লাগছে স্বপ্না কী করে পৃথাকে চিনতে পারল।

মেয়েরা বোধহয় সব পারে। এতগুলো মেয়ে তার মধ্যে ওর নজর ঠিক পৃথার দিকে। স্বপ্না অবশ্য কোনো বিস্ফোরণ ঘটায়নি, শুধু পৃথাকে শনাক্ত(করে চলে গেছে। আমি বুঝতে পারছিলাম পৃথা ছাড়া সারা অফিস যত(ণ স্বপ্না ছিল আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। বুঝতে পারছিলাম না পৃথা কিছু অনুমান করতে পেরেছে কিনা। আশঙ্কায় মাথা ঝিমঝিম করছিল। আমি চেয়ার থেকে উঠে এক গ-াস জল খাওয়ার কথাও চিন্তা করিনি, কারণ সেসময় চেয়ার ছেড়ে ওঠার সমস্ত (মতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার সমস্ত হাত-পা অসাড় লাগছিল। তবু স্বস্তি পাচ্ছিলাম একটা কথা ভেবে যে স্বপ্না শেষ পর্যন্ত অফিসে কোনো সিন্ করেনি। তা যদি করত তাহলে কাল থেকে অফিসে কী করে আসতাম। কী করেই বা পৃথার কাছে মুখ দেখাতাম। তাহলে তো এক লহমায় আমার কাছে পৃথিবী শূন্য হয়ে যেত।

পৃথা

কেউ আমাকে কিছু বলেনি। সহকর্মীদের বাতাসে ছুঁড়ে দেওয়া কথা তো গা সওয়া হয়ে গেছে। সেগুলো গায়ে মাখলে তো আমায় সুদেব-কে হারাতে হবে। এখন আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো, কানে দিয়েছি তুলো। সহকর্মীরা আমার সমস্যা নয়, ওদের খুব চিনি এক একটা ঢোঁড়া সাপ। বিষ নেই কুলো পানা চক্কর। ওতে আজকাল আর আমার কিছু হয় না। এখন আমি বুঝে গেছি সরকারি অফিসে চাকরি করি, চুরি না করলে, ঘুষ না নিলে চাকরি যাবে না। কাজ আর কেইবা করে। আমি তবু কিছু তো করি। অন্য অনেক মেয়ে, আর ছেলেদেরও দেখছি, শুধু আড্ডা আর ইউনিয়ন বাজি। এখন আমি ঢের সেয়ানা, কোনো কিছুকেই পরোয়া করি না।

এসবের পরেও যে অনেক কিছু আছে, সেটাই এখন মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন সুদেবের কাছে কে এসেছিল, সেই মহিলাকে দেখে সকলের কৌতূহলে বুঝতে পারছিলাম উনি সুদেববাবুর স্ত্রী, কেন এসেছিলেন সেটাই শুধু বুঝতে পারছি না। সুদেব-কে অনেকবার প্র(করেছি, ও কিছুতেই মুখ খুলছে না, কেবলই বলছে সে তোমার জানার দরকার নেই। ও জানার দরকার নেই বললেই তো আমার মনকে বশ মানাতে পারছি না। প্রবল একটা আশঙ্কা এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুদেব আমার থাকবে তো। দশ বছর আগে আমি একজনকে হারিয়েছি, আবার আমার জীবনে সে বিপর্যয় নেমে আসবে না তো? না এখন আমি কোনো বিপর্যয় মেনে নেব না। আমাকে যতটা নরম মনে করা হয় ততটাই নরম বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি আমার অধিকার ছেড়ে দেব না। সুদেবের কোনো অবহেলা মেনে নেব না। সুদেব-কে যে আমার চাই।

সুদেব

বাড়ি ফিরে আমি স্বপ্নার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। ওর গনগনে আঁচের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে আমশি। কোনোমতে জুতো খুলে, যা কোনোদিন করি না, সেই টিভি-র সামনে গিয়ে বসেছি। ভান করছি মনোযোগ দিয়ে টিভি দেখছি। আড়চোখে তো দেখতে পাচ্ছি স্বপ্না চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে।

অনেক(ণ পরে ঘরে ঢুকে বলল, কী আজ যে এত তাড়াতাড়ি অফিস থেকে চলে এলে। চা খাবে নাকি। আমার মুখ দিয়ে শব্দ বার হচ্ছিল না, কোনোরকমে ঢোঁক গিলে বলার চেষ্টা করলুম, খাব। স্বপ্না কী বুঝল জানি না, ঘর থেকে বের হয়ে গেল, বোধহয় চা করতে, আমি ছোট্ট একটা নি(শ্বাস গোপন করলাম। চা এনে ও আমার পাশে বসল, জিজ্ঞেস করল চায়ে আর একটু চিনি দেব কিনা দেখো। এসময় তো বাড়ি আস না, কিছু খাবে কিনা বলো, বানিয়ে দিচ্ছি।

আমি স্বপ্নার এ ব্যবহার মেলাতে পারছি না, প্রতি মুহূর্তে বিস্ফোরণের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে আছি। না কিছুই হল না, ও কিছুই করল না। যেন কিছু হয়নি, এমনভাবে আমার সঙ্গে টিভি দেখতে লাগল। আর আমি ভেতরে ভেতরে ঘামতে লাগলুম, কী হল, কী হল, ভাবনায়। আমি জানতাম না আমার জন্য অপে(া করে আছে আরও বিস্ময়। অন্যদিন আমি শোওয়ার অনেক পরে স্বপ্না শুতে আসত। তখন আমি ঘুমিয়েই পড়তাম। আজ প্রায় আমার সঙ্গে সঙ্গেই শুতে চলে এল। বুকে পিঠে চুলে হাত বুলিয়ে আমাকে জাগাতে চেষ্টা করতে থাকল। স্বপ্না যত চেষ্টাই ক(ক ভয় আর আশঙ্কায় আমার শরীর তখন কুঁকড়ে আছে। আমাকে জাগাতে না পেরে হতাশ স্বপ্না একসময় পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

স্বপ্না

আমার এখন মাথা গরম করলে চলবে না। পুরো ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। এরকম একটা ল্যাদাপ্যাদা লোক সত্যি কী ব্যাপারটা করেছে। অথবা পুরোটাই কোনো বদ লোকের কাণ্ড। আমাদের সুখী জীবনটাকে অনেকে তো ঈর্ষাও করে। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অনেকে আমাকে বলে স্বপ্না তোর কী ভাগ্য রে এরকম একটা শিবের মতো বর পেয়েছিস। হ্যাঁ, আমার শিবের মতো বর, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মুনিদেরও তো মতিভ্রম হয়। আর পু(ষ মানুষ তার রাশ আলগা করতে নেই। এটা আমার মায়ের কাছে শেখা। মা বলতেন তোর বাবাকে নিয়ে কতবার যে সমস্যায় পড়েছিলাম।

সেজন্যই বলছি — সমস্যা যাইহোক আমাকেই সেটা

সামলাতে হবে। এখন মাথা গরম করলে চলবে না। যদি ধরেই নিই যে ব্যাপারটা সত্যি, তাহলে তো আরও সাবধানী হতে হবে। আমি উলটোপালটা ব্যবহার করে ওকে দূরে ঠেলে দিতে পারি না, তাতে তো আমারই সর্বনাশ। দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব। আমাকে কে আশ্রয় দেবে।

আমার স্বামী যাই ক(ক, সে আমারই স্বামী, আমাকেই মাথা পেতে তার সব দোষ শুধরে নিতে হবে। মাথা গরম করে তো নিজেরই (তি করছি। মেয়ে মানুষের স্বামী ছাড়া যে ভগবান আর কোনো গতি রাখেনি। সেদিন বিছানায় ওকে জাগানোর কত চেষ্টা করেছি, কই ওর শরীর তো কথা বলেনি। ওর যদি ওরকম শরীরের খিদে থাকত তাহলে আমি ওরকম উজাড় করে দেওয়ার পরও আমাকে গ্রহণ করল না কেন? শরীর পেলে পু(ষ মানুষ ছেড়ে দেয় বাপের জন্মে এমন কথা শুনিনি। আমার ভালোমানুষ স্বামীর নামে এসব অপবাদ আমার বি(্বাস না করলেই হল।

কলেজ জীবনের সব কথা মনে পড়ে। সুদেবের সঙ্গে আলাপের আগে অন্য অনেক বন্ধুর সঙ্গে ছিল হৃদ্য সম্পর্ক। যেহেতু সুন্দরী ছিলাম সকলেই আমায় টানতো। কিন্তু কোন সম্পর্কই পরিণতি পায়নি। না পেলেও অনেকের কথা ভুলতে পারিনা। কারণ হাল্কা শারীরিক সম্পর্কের স্পর্শ তো তারা পেয়েছিল। ভুলতে পারিনা প্রশান্তের কথা, ওর সঙ্গে একবার সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, অন্ধকারে প্রশান্ত আমার বুকে হাত রেখেছিল, খুব অ(স্তি হলেও চুপ করেই ছিলাম। ওর হাত সরিয়ে দিইনি, ভেবেছিলাম যদি রাগ করে। সে সম্পর্কও টিকলোনা। না টেকার কারণ প্রশান্ত নিজেই। হঠাৎ রত্নার সঙ্গে ওর সম্পর্ক হয়ে যায়। আমার খারাপ লেগেছিল, কিন্তু মেনে নিয়েছিলাম। বেশ কিছুদিন মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত ছিলাম। সে বিপর্যয়ের হাত থেকে র(া পেয়েছিলাম সুদেবের সঙ্গে আলাপের পর। বুঝেছিলাম সুদেবই হলো ঠিক প্রেমিক। ওর সঙ্গে কাটানো মধুর-মুহূর্ত গুলোর কথা ভাব্লে আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

সেই সুদেব অন্য কারো প্রেমে মগ্ন- কেমন করে বি(্বাস করবো?

ঋতবান

একদিকে অপালা, অন্যদিকে ইন্দ্রাণী দুটো মেয়েকে সামলাতে হিমসিম্ খাচ্ছি। অপালার ব্যাপারটা বুঝতে পারি, ও যে সত্যি আমাকে ভালোবাসে সেটা ওর সহস্র উগ্র ব্যবহার সত্ত্বেও বুঝি। বেচারা আমাকে ভালোবাসে বলেই তো আমাকে পাওয়ার জন্য অত কাণ্ড করে। ভাবে, আমি শরীরের খিদেতেই মরে যাচ্ছি। সেজন্য বারবার আমাকে বলছে তুই আমার শরীর নে, আমি তো তোরই।

বেচারি বুঝতে পারছে না শরীর আমাকে সেভাবে টানে না। যদি টানত তাহলে তো ইন্দ্রাণীকে নিয়ে সমস্যা হত না। সেদিনের পর থেকে যেহেতু ইন্দ্রাণীকে আমি আর নিচ্ছি না ওরও ধারণা হয়েছে আমি বোধহয় ওকে আর পছন্দ করছি না। না পারছি অপালাকে বোঝাতে না পারছি ইন্দ্রাণীকে। শরীরের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই বা চাহিদা নেই একথা তো ঠিক নয়। কিন্তু শুধু শরীরী চাহিদার জন্যই তো ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নয়। প্রত্যেকটা সম্পর্ককে আমি আলাদা চোখে দেখি। সব সম্পর্কের মধ্যেই আমি শরীর খুঁজি না।

আমার কলেজে অবশ্য অনেক ছেলে আছে যারা মেয়ে মানেই বোঝে শরীর। সারা(ণ মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে ওদের শরীর পাবার আশায়। আর মেয়েগুলোও তেমনি ওই আদেখ্লা ছেলেগুলোর সঙ্গেই সারা(ণ হা-হা আর হি-হি। অন্যরকম মেয়েও আছে, অন্যরকম ছেলেও আছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা বড়ো কম। এসব দেখে খুব আশঙ্কা হয়, একদিন হয়তো সব বাদ দিয়ে আমরা শুধু শরীরের জন্যই বাঁচব।

পৃথা

সুদেবের মধ্যে একটা পরিবর্তন ল(্য করছি। ওর স্ত্রী যেদিন আমাদের অফিসে এসেছিল তার পর থেকে ও আমার সঙ্গে বেশি(ণ থাকতে চায় না। কেবলই বাড়ি যাওয়ার জন্য ছটফট করে। আগে আমি বাড়ি যাওয়ার কথা বললে বল্ত আর একটু আর একটু থাকো, এভাবে কত দিন যে রাত দশটা পেরিয়ে গেছে সে হিসেবও রাখতাম না। তার চেয়ে বড়ো কথা বেশ একটা দূরত্ব নিয়ে আমার সঙ্গে হাঁটে। গঙ্গার ধারে, ময়দানে নির্জনতায় কত দিন ওর গায়ের গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকতাম, আলতো করে ও আমার হাত ধরে কত কথা বলত, সেসব বোধহয় এখন আর ওর মনে পড়ে না। ওকে বারবার জিজ্ঞেস করি কী হয়েছে তোমার, তোমাকে তো আগে এত অন্যমনস্ক দেখিনি। ও কেবলই বলে ও কিছু না। তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। আমি চিন্তা না করে পারি না। আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখন সুদেবের মন আমার দিকে নেই। ওর কথাবার্তা, চালচলন সবকিছুর মধ্যে একটা অবসাদ এসে ভর করেছে।

আমার চঞ্চলতা, ভেসে যাওয়া মন, উন্মুখ শরীর ওর দরজায় গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে। নির্লজ্জের মতো কতবার ওর হাত জড়িয়ে ধরেছি, ও হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছে, এ-রকম করো না কেউ দেখে ফেলবে। কে দেখে ফেলবে। কার ভয়ে সুদেব এত কাঠ হয়ে থাকছে। সুদেব তো এরকম ছিল না। একটা অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে। সুদেব-এর হাত ছাড়তে ইচ্ছা হয় না। ইচ্ছা হয় ওকে বলি আমি কোনোকিছুর পরোয়া করি না। পর(ণে সে ইচ্ছা দমন করতে হয়। আমার কথা শুনে ও যদি আমাকে খারাপ ভাবে, যদি ভাবে যেন তেন প্রকারণে ওকে দখল করতে চাইছি, তাহলে সেটা হবে আমার

প(খুব লজ্জার। আমি পারি না, কিছুই করতে পারি না। যে আনন্দ এত(ণ আমাকে ঘিরে ছিল সেটা মুহূর্তে উবে যায়। আমার আর হাঁটতে ইচ্ছা করে না। বাড়ি ফেরার জন্য মনটা আকুল হয়। কিছু কথা না বলে ওর সঙ্গে দূরত্ব রেখে হাঁটতে থাকি। জানি না কবে শেষ হবে এই হাঁটা।

ইন্দ্রাণী

সময় যত গড়িয়ে যাচ্ছে ততই ভয় এসে আমার বুকে বাসা বাঁধছে। এ বাড়ির লোকগুলো তো এমন ছিল না। ঋতদার মা সন্ধে-সন্ধে ঘরে চলে আসত। তারপর সারাদিন আমরা কী কাজ করলাম তার হিসাব নিত। তারপর শু(হত গল্প। কখনও কখনও আমার মা এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। তারপর রাত্তির একটু গড়িয়ে ৯টা বাজলেই আমরা মা-মেয়ে আমাদের (টি-তরকারি নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিতাম। শু(হত তার পরের দিনের প্রতী(া। এখন ঋতদার মা আসে কত রাত্তির করে, বসে বসে আমার আর মার চোখে ঢুলুনি আসে। দশটা বাজলেই আমরা উঠে পড়ি। তখনও ফেরেনা ঋতদার মা।

অথচ ঋতদাকে কখনও উদ্বিগ্ন দেখিনি, মা কেন দেরি করছে সে জন্য উৎকণ্ঠার কোনো ছাপ ওর মুখে দেখি না। আমার খুব অবাক লাগে। কেউ যে তার মায়ের ব্যাপারে এত নি(দ্বেগ থাকতে পারে ওকে না দেখলে বুঝতে পারতাম না। অথচ আমার মা যদি সব বাড়ির কাজ সেরে কোনোদিন ফিরতে দেরি করে আমার ভীষণ চিন্তা হয়। কেবলই বারবার ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াই। ঋতদা জিজ্ঞেস করে কী-রে বাইরে কী করছিস। আমি বলি মা আসছে কিনা দেখছি। ও কথা না বলে নিজের বইতে মুখ ঢাকে। এখনও ওর সেই একই মনোভাব, মা-র জন্য ওর কোনো চিন্তা নেই। আমার খুব ভয় করে যে ছেলে মায়ের জন্য কোনো চিন্তা করে না তার কথা বি(াস করি কী করে। ও আমাকে কেবলই বলে কিছু ভাবিস না আমি তো আছি। এই আমি তো আছি লোকটা ওর মায়ের জন্য আছে, আমার মনে হয় না। মায়ের জন্য কেউ না ভেবে পারে নাকি।

একথা আমার বি(াস হয়না যে ঋতদা মায়ের জন্য ভাবেনা। ভাবে নিশ্চয়, কিন্তু সেটা আমার চোখে পড়ে না। কারণ ঋতর মা যখন বাড়ী ফেরে তার দিকে তাকিয়ে আমার অবাক লাগে। একটা মানুষ অফিস থেকে ওরকম আলু থালু হয়ে কেমন করে ফেরে সে কথা ভেবে পাইনা। আমার তো কিছুতেই মনে হয় যা ওরকম বিধ্বস্ত চেহারা অফিস থেকে হতে পারে।

বুঝতে পারি মানসিক একটা চাপের মধ্যে দিয়ে উনাকে যেতে হচ্ছে। যে মানসিক চাপের জন্য সংসারের কোন দিকেই উনার মনোযোগ নেই। প্রতিদিন কি রান্না হবে বাজার হবে — কোন কিছুই উনি আর দেখেন না।

এমনকি খেতে বসেও মনে হয় কি খাচ্ছেন সেটা জানেন না। সমস্ত কিছুতেই উনার উদাসীনতা আমি আর মা দেখতে পাই।

আমার মা বলে — চাকরীতে নিশ্চয় কোন গণ্ডগোল হচ্ছে — তাই ওঁর এই অবস্থা। হয়তো চাকরীটা চলে যাবে তাই এরকম উদ্‌ভ্রান্তর মতো আচরণ।

আমার কিন্তু তা মনে হয়না। কারণ আমি শুনেছি চুরি না করলে সরকারী চাকরী সহজে যায় না। উনি তো নিশ্চয় চুরি করেন না। করলে নিশ্চয় বাড়ীঘর দোরের পরির্বতনে সেটা আমরা বুঝতে পারতাম।

সে সব নিশ্চিতই কিছু নয়। কারণ সে সব হলে ঋত নিশ্চয় বুঝতে পারতো। আমার শুধু অবাক লাগছে একথা ভেবে যে, সব কিছু দেখেও ঋত কেন মায়ের ব্যাপারে এতো উদাসীন — কেন? কেন?

অপালা

কাউকে নিজের করে পেতে চাওয়ার নামই কি ভালোবাসা। ভালোবাসার অন্য কোনো অর্থ আছে কিনা জানি না। ঋত-কে ভালোলাগার পর অন্য কোনোকিছুই ভাবিনি। শুধুই আমি ওকে পেতে চেয়েছি। ছোটো থেকে যখন যা চেয়েছি তা আমি পেয়েছি। আমার মা, বাবা আমার কোনো সাধই অপূর্ণ রাখেননি। শুধু বড়ো হয়ে বুঝেছি আমাদের যেহেতু অনেক টাকা সেহেতু সমস্ত সম্পর্কগুলোই কেমন ছাড়া ছাড়া। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এলে আপ্যায়ন কিছু হোক বা না হোক অঢেল খাবার দাবারের আয়োজন করা হয়। সেজন্য বাড়ির চাকর-বাকররা চায় আমাদের যেন সবসময় আত্মীয়স্বজন আসে। সে সময় ওদের খাটাখাটনি বেশি হয় বটে, তবে প্রচুর খাবার বেঁচে যায় সেটা ওদের খুব কাজে লাগে।

মজা হচ্ছে আমাদের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন আসে খুব কম। আর এলেও বেশি(ণ থাকে না। আমাদের প্রায় সব আত্মীয়-স্বজনই গরিব। সেজন্য তারা আসতেও চায় না। সবচেয়ে বড়ো কথা আমার মা, বাবার দিকের কোনো আত্মীয়কেই পছন্দ করে না। মা-র ওরকম নাক উঁচু ভাবের জন্য বাবার দিকের অনেক লোককে চিনিই না। তাই হঠাৎ কেউ এলে নিকট সম্পর্ক জেনে আমি অবাক হই। এভাবেই তো এতদিন কাটিয়ে এলাম। আমার জীবনটা একেবারেই একার জীবন। অন্য বন্ধুদের মুখে যখন তাদের কাকা, জ্যাঠা, মামা, মাসি, মেসোদের কথা শুনি তখন আমার মধ্যে কোনো অনুভূতি কাজ করে না। ওই সম্পর্কগুলো তো আমার কাছে নিতান্তই অচেনা। সেজন্য কিনা জানি না, আমি খুব একরোখা আর জেদি। যা চাই তা যদি না পাই তাহলে আমার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এখন যেমন ঋত-কে না পেয়ে হয়েছে। আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব। আমার কপালে বোধ হয় পাগল হওয়াই লেখা আছে।

পাগল হই আর না হই। কিন্তু ঋতকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না। নারী পু(ষের ভালবাসায় যেমন শরীর থাকে — তেমনি ভালবাসা ছাড়া পু(ষ যেমন পতিতালয়ে যায় নারীরও কখনো কখনো সে প্রয়োজন হয়। পু(ষের প্রয়োজন মেটে। কিন্তু নারীকে সতী থাকতে হয়। তার প্রয়োজন কখনো মেটে না।

আমি তো আমার মা বাবার সম্পর্ক ছোট থেকে দেখে আসছি। দু-জন মানুষ সম্পূর্ণ দু প্রান্তে বাস করে। আমি বি(াস করিনা — ওরা কেউ কাউকে ভালবাসে।

নিতান্তই উপায় নেই তাই একসাথে থাকে। ডির্ভোস করলে পরিজন এবং সমাজের কাছে নিন্দিত হবে সে আশঙ্কাতে সব কিছু মেনে নিয়ে সংসার করে।

কিন্তু ওদের মধ্যে যে ভালবাসার অস্তিত্ব নেই সেটা বেশ বুঝতে পারি। মনে হয় অর্থের প্রাচুর্য্য এবং বিলাস ওদের মানসিক অবস্থানকে সম্পূর্ণ নড়বড়ে করে দিয়েছে।

বিলাসের বাইরে গিয়ে বাঁচার কথা ওরা ভাবতেই পারে না। এই বিলাসের মধ্যে দিয়েই আমার জীবনও পরিচালিত।

কিন্তু ঋতর সঙ্গে পরিচয়ের পর ওর সহজ সরল জীবন আমাকে অন্য একটা জীবনের সঙ্গে পরিচিত করেছে। বিলাস নয় — ঋতর মতো সহজ-সরল জীবনের স্বাদ আমি পেতে চাই।

সুদেব

আমার এখন ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমির অবস্থা। কী যে করি কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা উড়ো চিঠি এসে জীবনটাকে একেবারে এলোমেলো করে দিয়েছে। কে যে আমার সঙ্গে এ শত্রুতা করল। আমি তো কারও পাকা ধানে মই দিই না। কারও কোনো (তি কোনদিন করিনি। চিরকাল চেষ্টা করেছি অন্যের উপকার করার। অবশ্য আমার সাধ্যই বা কী? তবু তার মধ্যে যতটুকু পেরেছি অন্যের জন্য আমার চেষ্টার ত্রুটি থাকত না।

স্বপ্না প্রথমদিকে আমার উপর খুব অত্যাচার করেছে বটে, এখন কিন্তু একেবারে শান্ত হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে খুব বেশি ঝামেলা করে না। শুধু অফিস বেরোবার সময় বলে দেয়, দেরি করে বাড়ি ফিরবে না কিন্তু। ওর ওই একটা কথাতেই তো আমার সর্বনাশ হয়ে যায়। সকাল সকাল বাড়ি আসতে গেলে পৃথাকে পাব কেমন করে। ইদানীং মাত্র আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট থাকছি বলে ওর অনুযোগের শেষ নেই। পাঁচটার আগে অফিস থেকে বে(তে পারি। মুশকিল হল রোদ্দুরে কোথায় ঘুরব। আর ফটফটে দিনের আলোয় ওকে নিয়ে ঘুরতে ভয় করে। আগে তবু একরকম ছিল, এখন উড়ো চিঠি পাওয়ার পর আমার ভয় বেড়ে গেছে। স্বপ্না এখন কিছু বলছে না বটে তবে আবার কেউ যদি লাগিয়ে দেয় তাহলে এবার যে বিরাট ঝামেলা হবে সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। ওরে বাবা সে চান্স নিতে পারব না। তার চেয়ে অল্পেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। মুশকিল হচ্ছে পৃথাকে নিয়ে, দিন দিন ওর তৃষ(া যেন বেড়ে যাচ্ছে। কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চাইছে না। কী যে করি।

পৃথা

আমি বুঝতে পারছি সুদেব কোনো একটা সমস্যার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। বারবার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও কিছু বলছে না। কেবলই বলছে বলব, বলব, একটু ধৈর্য ধরো। কত আর ধৈর্য ধরব। প্রায় দু-মাস হয়ে গেল, প্রতিদিন মাত্র আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট ঘোরার পর বলবেই আজ একটু কাজ আছে, কাল আবার হবে। কাল আবার হবেতে আমার মন মানে না। কাল কী হবে। আজকাল তো হাতটাও একটু ধরে না। অথচ ওকে সবকিছু দেবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছি। যে দ্বিধা-সংশয় একসময় আমাকে পিছু টেনে রেখেছিল সেগুলো হঠাৎ কী করে যে দূর হয়ে গেল সে কথা ভেবে নিজেই অবাক হই।

আমার শরীর এখন সুদেবের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। ওকে কতদিন বলেছি চলো অফিস কামাই করে কোথাও ঘুরে আসি। আভাসে ইঙ্গিতে ওকে বুঝিয়েছি আমার সবকিছু তোমার। তোমার যেমন ইচ্ছে তেমন করে আমাকে নাও। আমার আকুতি প্রথমদিকে ওর কাছে প্রশ্রয় পেলেও এখন একেবারেই সুদেব নিস্পৃহ হয়ে
গেছে।

আমার মধ্যে হতাশা এসে বাসা বাঁধছে। আমার ভেতরের আগুনটা জ্বালিয়ে দিয়ে কেন যে ও এরকম হয়ে গেল সেটা ভেবে চোখ ফেটে জল আসছে। একদিন ওর বউ আমাদের অফিসে এসেছিল বটে, সেটা কী কারণে কেউ জানে না। ঠিক মনে করতে পারছি না, তারপর থেকেই সুদেব কেমন ঝিমিয়ে গেছে। এখন আমি কোথায় যাই, হা ঈ(র আমিও যদি ওর মতো ঝিমিয়ে পড়তে পারতাম তাহলেই তো বাঁচতাম। আমি পারছি কই। ভালোবাসা নিয়ে কখনও ভাবনাচিন্তা করিনি। যখন আমার বিয়ে হয় তার আগে অনেক ছেলে আমাকে পেতে চেয়েছে — সেটা আমি বুঝেছিলাম, কিন্তু আমি কাউকে পেতে চাইনি। সেরকম পু(ষ আমার জীবনে কাউকে পাইনি।

তারপর যখন বিয়ে হয়ে গেল — তখন তো ব্যাপারটা চুকেই গেল, বছর না ঘুরতেই ঋত-র জন্ম, ভালোবাসতে হয় স্বামীকে। সেটাই এতদিন জেনে এসেছি। ছেলেমানুষ করো, রান্না করো, আর খাও — এসবের মধ্যেই ছিল জীবন সীমাবদ্ধ। অন্য কোনো পু(ষ যেমন জীবনে আসেনি, অন্য কোনো ভালোবাসার উন্মেষও আমার জীবনে হয়নি। এসব তো শু(হল সুদেব আসার পর, যখন নিজের দিকে তাকাতে শু(করলাম। সাজতে ভালোবাসতাম, সেটা যে অন্য পু(ষের মনোরঞ্জনের জন্য কখনও তা মনে হয়নি। সুদেব-এর মুগ্ধ চাউনি আমার চেতনায় সঞ্চার করেছে নতুন ভাবনা। সেটা ভালোবাসা কিনা জানি না।

শুধু বুঝতে পারি প্রবল এক তৃষ(া নিরন্তর আমাকে দগ্ধ করছে। কেবলই ইচ্ছা হয় সুদেবের কাছে চলে যাই। ওর বুকে মুখ রাখি। বলতে ইচ্ছে হয় সুদেব তুমি আমাকে নাও, আমাকে নাও।

স্বামী যখন বেঁচে ছিলেন তখন কিন্তু এরকম কোনো তৃষ(া বা আবেগ ছিল না, পু(ষের শরীর বা মন কোনোটার প্রতি আসক্তি(আমি অনুভব করিনি। স্বামীর সঙ্গে শরীরী মিলনে অংশ নিয়েছি কিন্তু সেটা ছিল বোধহীন। এইপরিবর্তিত আমি আমার নিজের কাছেই অচেনা। মানুষ তো অন্য মানুষকেই চিনতে পারে না। নিজেকেও যে চেনা যায় না সেটাই এখন বুঝতে পারছি। শরীরের প্রতি একটা তৃষ(া আমার মনকে টেনে নিয়ে চলেছে এটাই এখন মনে হয়।

আগে যেগুলোকে অন্যায় মনে করতাম — সেগুলোকে এখন অন্যায় মনে হয় না। নিজেকে এখন আমি প্র(া করি প্রতিটি প্র(ের উত্তরেই দেখি আমার আগের ভাবনাগুলো সব ভুল। মনে হচ্ছে এতদিন আমি ভাবতেই শিখিনি। অন্যদের ভাবনা, বি(াস, বেঁধে দেওয়া নিয়ম তার মধ্যেই আমি চলতে শিখেছি। সেই শেখা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। এই নতুন ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছি অদৃশ্য একটা জাল আমাকে জড়িয়ে আছে, যেটা আমি কিছুতেই ছিঁড়তে পারব না। মাঝে মাঝে সে জন্য ঘুমের মধ্যে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে, বিছানা থেকে উঠে জল খাই। শরীর অসম্ভব জ্বালা জ্বালা করে — জল আমার তৃষ(াকে নিবারণ করে, শরীরের জ্বালাকে দূর করতে পারে না।

যত বেশি আমি সুদেব-কে আকঁড়ে ধরার চেষ্টা করি, সুদেব ততই দূরে সরে যায়। ওকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকার তৃষ(া বাড়তেই থাকে। আমার ভেতরের সবরকম সংযম টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙতে থাকে। ওকে বলতে ইচ্ছে হয় কেন তুমি আমাকে স্বপ্নের দরজা থেকে ফিরিয়ে দিতে চাইছো। আমার ভেতরটা সারা(ণ কাঁপতে থাকে। সমস্ত ভাবনাচিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। কোন্ কথার পর কোন্ কথা বলব বুঝে উঠতে পারি না। অসহায়ের মতো ওর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ(াস গোপন করি। বুঝতে পারি না কতদিন আমাকে এই গোপন জীবনযাপন করতে হবে।

আমার এমন কেউ নেই যাকে বলতে পারি এই যন্ত্রণার কথা। আমার একমাত্র আপনজন ঋত। তার সঙ্গে তো এসব নিয়ে কথা বলতে পারি না। আছে, আর একজন আছে। কতবার ভেবেছি তাকে বলব। তাকে বলব বলেই তো এতসব ভাবনা আমার মধ্যে কিলবিল করে। সমস্ত কাজ ভুলে অন্যমনস্ক হয়ে শুধু মনে মনে হাজারবার মহড়া দিই তাকে কী কী কথা বলবো।

তারপর যখন তার সান্নিধ্যে আসি, আমার সব কথা হারিয়ে যায়। কেবল নীরবতার মধ্যে তার হাত ধরে হাঁটতে ভালো লাগে। আমার মুখে কোনো কথা আসে না। আমি শুনি, কেবল শুনি — শুনতে শুনতে মিনিট ঘন্টা পার হয়ে যায়, নিজের কথা আমার মনে থাকে না। অবশ মন নিয়ে পরের দিনের প্রত্যাশায় ফিরে আসি। ফিরে আসি স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা নিয়ে। কেন যে সুদেব আমার প্রত্যাশা মেটায় না বুঝতে পারি না। বুকের ভেতর ভয়ানক একটা শূন্যতা তৈরি হয়। বাঁচার আশায় মনে মনে সুদেবকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরি।

স্বপ্না

আমার স্বামী একটা ভুল করেছিল, মনে হয় সেটা শুধরে নিয়েছে। এখন তো মোটামুটি ঠিক সময়েই বাড়ি আসে। আর তো কোনো কথা শুনতে পাই না। উড়ো চিঠি যারা দিয়েছিল তারাও চুপচাপ। যাক বাবা, ভালোয় ভালোয় অল্পের উপর দিয়ে বেঁচে গেছি। এবার একদিন মায়ের থানে গিয়ে পুজো দিয়ে আসতে হবে। মা-কালীই তো আমাকে র(া করেছেন। আমাদের মতো মেয়েদের জীবনে স্বামী ছাড়া আর কী আছে। তাকে বাঁচানোই তো একমাত্র কাজ। নিজের স্বামীকে যে মেয়ে আঁচলে বেঁধে রাখতে পারে তার মতো সুখী আর কে আছে।

আমি তো জানি আমার স্বামী আমার আঁচলেই বাঁধা। কখন যে গিট আলগা হয়ে গেছে সে কথা বুঝতেই পারিনি। স্বামীর দিকে এই যে অমনোযোগ এটাই হয়েছে আমার কাল। প্রথমে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল বটে, আর আমি একটু দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলুম, সেজন্যই ওর উপর অমন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম। এখন তো দেখি দিব্যি সকাল সকাল বাড়ি আসে। আগে তো ছেলেমেয়েগুলোকে মোটেই দেখত না। এখন রীতিমতো ওদের দেখভাল করে। একটাই মুশকিল, আমাকে অসম্ভব ভয় পায়। সেজন্য আমার সামনে মোটেই মুখ খোলে না। আমার কোনো কথার প্রতিবাদ করে না। এই যে আমাকে ভয় পায় এটাই তো আমার সহ্য হয় না। পু(ষ মানুষের একটু আধটু দাপট না থাকলে মানায় নাকি। সেজন্যই তো ওকে বলি তোমার মতো ল্যাদাপ্যাদা লোক আমি আর দেখিনি।

সে যাইহোক, আমি এরকম একটা লোককে নিয়েই সুখী। আমার কোনো চাহিদা নেই। ওকে পেলেই আমার সব সুখ। শুধু একটাই কষ্ট, আমি দিতে চাইলেও শরীরের প্রতি ওর কোনো টান দেখি না। সে না থাক, ওকে তো ফিরে পেয়েছি, সেই আমার ঢের।

সুদেবকে ফিরে পেলেই বুঝবো আমার সব পাওয়া হলো। এই বয়সে শরীর যখন আর কথা বলেনা তখন কেমন করে একটা পু(ষ মানুষকে সুখি করবো তাতো বুঝতেই পারছিনা। বিয়ের পর সেভাবে সুদেবের দিকে ফিরে তাকাইনি। তাকাইনি কারণ জানি তো সুদেব আমারই আছে।

সুদেব আমার নেই — এ আতঙ্ক আমাকে দিশাহারা করেছিল। জানতাম না কেমন করে এ আতঙ্কের হাত থেকে মুক্তি(পাবো।

খুবই আশ্চার্য্যজনক ভাবে মুক্তি(পেয়ে নিজেকে খুব হাল্কা লাগছে। কিন্তু বুঝতে পারছি এবার আমাকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ পু(ষ মানুষের মন পদ্ম পাতায় জলের মতন। কখন গড়িয়ে পড়বে তার কোন ঠিক নেই

নিজের জন্য ভাবিনা, দু-বেলা দু-মুঠো জোগাড় করার মতো বিদ্যে আমার পেটে আছে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের মানুষ করবো কেমন করে। ওদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তো সারাদিন 'সমস্ত সময় আমার কেটে যায়।

সুদেবের দিকেও যে তাকাতে পারিনা সে তো ওদেরই কারণে। দেখেছি তো কতো মেয়ের কতো চাওয়া থাকে। আমার কোন চাওয়াই নেই। ঠাকুরের কাছে দু-বেলা আর্জি জানাই — শুধু ছেলেমেয়েদের মানুষ করে দাও।

ওরা যদি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায় — তাহলে সুদেব তাড়িয়ে দিলেও আমার চিন্তা নেই। ভালবাসায় কখনো আগল খুলে রাখতে নেই।

তোমাকে ভালবেসে বি(াস করে আগল খুলে রেখেছিলাম। তাই তুমি সাপের মতো দংশন করতে পারলে। ওই মেয়েটা নয়। আমার জীবনে তুমিই সাপ। মরে যাবোনা। শুধু কষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

সারাজীবন এ কষ্ট বুকে নিয়েই বেঁচে থাকবো। হ্যাঁ তোমাকেও একই কষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

আমি যেমন তোমার অবহেলা ভুলতে পারবে না, তেমনি তুমিও তো আর ওকে পাবেনা।

হয়তো এটাই আমাদের দু-জনের নিয়তি।

সুদেব

আমি যে একটুও সাহসী নই সে কথাটা জানি। সেজন্য বড়ো কোনো স্বপ্ন আমি দেখতে পারি না। ভয় সবসময় আমাকে পিছু টেনে রাখে। ভালো করে কারও সাথে ঝগড়া পর্যন্ত করতে পারি না। সেজন্য স্বপ্না প্রায়ই বলে তোমার মতো ল্যাদাপ্যাদা লোক বাপু আর একটাও দেখিনি। সত্যি কথা আমার এই ল্যাদাপ্যাদা স্বভাবের জন্যই কোনোদিন বড়ো কিছু করে উঠতে পারিনি। এতদিন সেজন্য কোনো দুঃখ ছিল না। আমি বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছিলাম।

'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার হেলে গো(কিনে'। আমার অবস্থা হয়েছে এখন সেরকম। পৃথার প্রেমে না পড়লে তো এই অবস্থা হত না। এখন খেতে পারি না, ঘুমুতে পারি না, পারি না মাথা ঠিক রেখে কোনো কাজ করতে। সবাই দেখছে আমি বেশ সুখী, হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছি। স্বপ্না তো আমাকে দেখে খুব খুশি। এখন মাঝে মধ্যে বিছানায় আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। বলতে চাইলে কী হবে, আমার শরীরে হাত দিয়ে বুঝতে পারে আমার শিথিলতা, নি(াস ফেলে পাশ ফিরে শোয় আর আমার খুব মজা লাগে। মজা লাগে এইজন্য যে স্বপ্নার সঙ্গে ওসব করতে ইচ্ছে হয় না। ওর শরীর কোনোভাবে আমাকে টানে না। ওর প্রতি ভয় আমার শারীরিক ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ শিথিল করে দিয়েছে।

আমার কেবলই পৃথাকে পেতে ইচ্ছা করে। ইদানীং পৃথাকে এড়িয়ে মাঝে মাঝে অফিস থেকে পালিয়ে আসি। পালিয়ে এলে কী হবে মনে মনে ওর কথা ভেবে শরীরের উষ(তা টের পাই। সে উষ(তা ভয়ানক কষ্ট দেয়। আমার সংসার থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পালাব কোথায়। বুঝতে না পেরে চুপচাপ যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকি। সব কাজ ভুল হতে থাকে। বুঝতে পারি স্বপ্না আমাকে খুঁটিয়ে দেখে, কিন্তু কিছু বলে না। বলে না বলেই নিজেকে আরও অসহায় লাগে।

স্বপ্নার প্রতি দায়িত্ববোধ আমাকে সজাগ রাখে। আমি স্বপ্না বা ছেলেমেয়েদের কথা কখনো ভুলিনা। কিন্তু আমার মন, তাকে কোন মতেই বশে রাখতে পারিনা। প্রতিদিনে বেঁচে থাকার ক্লান্তি তাকে বিদ্রোহী করে রাখে। সে জানে এ সমাজের কঠিন বাঁধন গুলোকে অস্বীকার করে একদিনও বেঁচে থাকা যাবে না।

তবু সে অন্যরকমভাবে বাঁচতে চায়। এই অন্যরকম বাঁচায় রয়েছে অজস্র কাঁটা। প্রতিনিয়ত সেই কাঁটা তাকে (ত বি(ত করে। তবু সেই (ত মেনেই অন্য একটা জীবনের স্পর্শ সে পেতে চায়।

জানি সে স্পর্শ সেই পায় যে মানুষ সাহস করে হাত বাড়াতে পারে। আমার মতো ভীতু দুর্বল মানুষ, কখনো সে নতুন জীবনের স্পর্শ পেতে পারেনা তা বেশ অনুভব করতে পারি।

পৃর্থার সমর্পণ অনুভব করেও তাই আমাকে পিছিয়ে আসতে হয়। পৃথার কষ্ট আমি সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারি।

কিন্তু আমার যে কোন উপায় নেই — বাধ্য হয়েই আমাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। ওর আকুলতা জেনেও বলতে হয় — প্লি-জ একটু অপে(া করো। আমি তো তোমারই আমি তো তোমারই এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আমাকে যন্ত্রণা দেয়। তবু এই মিথ্যার মধ্যেই আমাকে বাস করতে হয়।

জানি বেঁচে থাকতে হবে দুঃখ নিয়েই। যে সামাজিক আচরণ আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তার বাইরে যাওয়ার কোন উপায় আমাদের নেই। এই সমাজের সমস্ত কু-আচরণকে মানুষ ধর্মের নাম দিয়ে পবিত্রতায় পরিণত করেছে। আমরা সকলেই সে-সব জানি কিন্তু সমবেত ভাবে সে গুলো পরিত্যাগ করার জন্য যে জ্ঞান যে সাহস দরকার আমাদের কারোর তা নেই। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিপ-বের জন্য লাঠি হাতে নিতে অসুবিধে হয়না — কিন্তু সামাজিক কুসংস্কারের বি(দ্ধে সামান্য গলা তুলতে আমাদের হৃদয় কাঁপে। কাঁপে কারণ সমস্ত কুসংস্কার গুলোকে ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত(করণ করা হয়েছে। যে ধর্ম হলো শাসকের অস্ত্র আর বোকার আশ্রয়।

পৃথিবীর সমস্ত শাসকরাই ধর্মের নামেই শাসনযন্ত্র পরিচালনা করে। শুধু আমি নই কোনো মানুষই কোনদিন সুস্থ জীবনের স্পর্শ পাবেনা।

সমাজ নির্দেশিত এবং নির্দ্ধারিত ব্যক্তি(কেই ভালবাসতে হবে — তারই সঙ্গে জীবনযাপন করতে হবে — এটা জীবনের চরমতম লজ্জা বলে মনে হয়।

জানি পৃথাকে গ্রহণ করা হয়তো সম্ভব হবে না। এক সাথে দুজন মানুষ এই সামাজিক অবিচারের শিকার হয়ে বেঁচে থাকবো।

ঋতবান

ছোটোবেলা থেকে আমার একটা অদ্ভুত (মতার কথা আমি জানি। কিন্তু সে (মতার কথা জেনেও উদাসীন থাকি বলে সেটা আমাকে কষ্ট দেয় না। কোনো মানুষের আচরণ নিয়ে যদি আমি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে তার আগামী দিনগুলো মনশ্চ(ে দেখতে পাই। একবার আমার এক বন্ধু আত্মহত্যা করেছিল। ওর আত্মহত্যার আগে সে কথা একজনকে বলেছিলাম। পরে সে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল তুই কী করে বুঝতে পেরেছিলি। আমি শুধু ওকে বলেছিলাম ওর হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যাওয়া আমাকে একটু অবাক করেছিল। সেজন্য ওকে কিছুদিন নিবিড়ভাবে পর্যবে(ণ করেছিলাম। সেজন্যই তোকে বলেছিলাম। ও বলেছিল নিবিড় পর্যবে(ণে এসব বলা সম্ভব নাকি! ওর কথার আর কোনো জবাব দিইনি। এরকম আরও অনেক ঘটনা আছে যেগুলোর পরিণতি আগে থেকে বুঝতে পারি।

ইদানীং আমার মা-র আচরণ আমাকে খুব শঙ্কিত করে তুলেছে। আমার শান্ত মা যখন সুদেব বাবুর সংস্পর্শে এসে চঞ্চল হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ সাজগোজ করা, দেরি করে বাড়ি আসা এগুলো খুব স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম আমার মা একটা নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে। মা যাতে সেই জীবনের আস্বাদ নিতে পারে সেজন্য আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। মাকে কোনোদিন আমি প্র(ে করিনি। নির্মোহ আর উদাসীন থেকে মা-র উৎসাহকে গতি দিয়েছিলাম। আমি মা-র জন্য কিছুই করতে পারিনি, সেজন্য আমার দুঃখিনী মায়ের সুখ আমাকে আনন্দ দিচ্ছিল। দুই নারীকে নিয়ে আমার যন্ত্রণা যাতে মা-কে কোনোভাবে বিব্রত না করে সেজন্য খুবই সজাগ ছিলাম। ভয় ছিল অপালা বা ইন্দ্রাণী কেউ যদি মায়ের কানে কোনো কথা তোলে তাহলে মার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে। আমার সাবধানতা সেদিক থেকে মাকে র(া করেছে বটে, কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি মা-র জীবনে একটা ভয়ানক বিপর্যয় নেমে আসছে। সে বিপর্যয় ঠেকানোর (মতা আমার নেই। নিয়তিতাড়িত মানুষের মতো আমাকে তা মেনে নিতে হবে।

সুদেব

ভালবাসা মানুষের জীবনবোধ কেমন করে বদলে দেয় সে কথা এখন আমি বেশ অনুভব করতে পারি। কতো সাধারণ একটা জীবনের বৃত্তে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলাম সে কথা ভেবে বেশ অবাক লাগে। হ্যাঁ স্বপ্নাকে ভালবেসেই বিয়ে করেছিলাম। তারপর কোন্ আশ্চর্য যাদুমন্ত্রে জীবন হয়ে গেল গতানুগতিক। কোন রকম বৈচিত্র জীবনে যে আছে সে কথা গত দশ বছরে মনেও করতে পারিনি।

প্রতিদিন অফিস করেছি বাড়ী ফিরেছি স্বপ্নার সঙ্গে শুয়েছি, সব করেছি, কিন্তু কোন কিছুর মধ্যে যে উষ(তা আছে, আবেগ আছে, বেঁচে থাকার আকুলতা আছে সে কথা অনুভব করিনি।

মাঝে মাঝে স্বপ্না না করতো বটে, তবু স্বপ্নার শরীর তো পেয়েছি, — কিন্তু সে পাওয়ার মধ্যে যে আগুন আছে — তা কখনো অনুভব করিনি।

প্রতিদিন পৃথাকে পাওয়ার জন্য আমার শরীর এখন আগুনের মতো জ্বলতে থাকে। অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বই আর সহ্য হয়না। কেমন করে যে দিন আর রাত্রি গুলো পার হয়ে যায়। সেটা বুঝতেই পারিনা বেঁচে থাকি যন্ত্রের মতো, সব কিছুই করি। যেমন করে যন্ত্র, কিন্তু মন পড়ে থাকে পৃথার কাছে।

বিকেলের দু-ঘন্টা সময়ের জন্য আকুল হয়ে প্রতী(া করে থাকি। পৃথা এলে শরীরের আগুন যায় নিভে। জেগে ওঠে মনের আগুন।

পৃথা সে কথা বুঝতে চায়না। দীর্ঘদিনের অব্যক্ত(এক যন্ত্রনা হঠাৎ যেন বন্দি দশা থেকে মুক্তি(পেয়েছে, সে আমার হাত জড়িয়ে ধরতে চায়। আমার হাত সরিয়ে নেওয়াকে সে নিষ্ঠুরতা মনে করে। তাকে বোঝাতে পারিনা — চতুর না হলে, কুশলী না হলে এ সমাজে বেঁচে থাকা কঠিন।

আমার চতুরতা সে মেনে নেয়না। তার দ্বিধাহীন সমপর্ণে সে অবিচল থাকে। তাকে আমি বুঝতে পারি — কিন্তু বুঝেও তাকে সরিয়ে রাখতে হয়।

কিন্তু এই সরিয়ে রাখা যে এতো বড়ো বিপর্যয়ের কারণ হবে তা যদি বুঝতে পারতাম তাহলে নিশ্চয় অন্য কিছু করার কথা ভাবতাম।

শরীরের নানা রোগ সারানোর জন্য হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক প্রতিদিন গবেষণার মাধ্যমে প্রস্তুত করছেন হাজার হাজার ঔষুধ। কিন্তু মনের এই রোগ সারানোর জন্য কেউ কিছু করছেন কিনা তা আমার জানা নেই।

শুধু বুঝতে পারি অসহায়ের মতো নিয়তির হাতে সমর্পিত হওয়ার জন্যই আমরা জন্মেছি। হৃদয়ের চর্চা মানুষকে যে গভীর সঙ্কটে ফেলে দেয় সে কথা বুঝতে পেরে নতুন করে নিজেকে প্রস্তুত করছি। শরীর তখন আর আমাকে যন্ত্রনা দেয় না। এক অলৌকিক সুখ এসে আমার মনে বাসা বাঁধে।

পাশাপাশি হাঁটার সময় পৃথার শরীরের সামান্য ছোঁয়া আমাকে তৃপ্তির সাগরে নিয়ে যায়। কোথা থেকে যে সংযম এসে আমাকে পৃথার শরীর থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে তা আমি জানিনা।

আমি তো তখন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। ওর সামান্য ছোঁয়া আমাকে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের অধিকারী করে দেয়।

বুঝতে পারি সে সময় পৃথা কি বিপুল আকুতি নিয়ে আমার হাত ধরতে চায়। আমারও ইচ্ছা হয় — সে ভয়ানক ইচ্ছার কাছে সমর্পিত হওয়ার জন্য ছটফট করি, কিন্তু আশ্চার্য্য এক সতর্কতা আমাকে সজাগ রাখে।

জানি এই ছোট্ট পৃথিবীতে আমার চারপাশে শুধু পরিচিত লোকেরাই চলাফেরা করছে। তাদের সমস্ত শাণিত দৃষ্টি কেবল আমাদের দিকেই।

আমিও তো তাই — এক জোড়া নারী পু(ষ পাশাপাশি হাঁটছে দেখলে বারবার ফিরে তাকাই। এ হলো আমাদের সমাজের আজন্ম, লালিত একটা অভ্যাস। এর থেকে আমরা কেউ মুক্ত(নই।

জানিতো অজস্র চোখ আমাদের প্রতিনিয়ত অনুসরণ করছে। সেই অনুসরণের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাকে সতর্ক থাকতে হয়।

পৃথা

সুদেব আমার জীবন থেকে সরে গেছে এটা মেনে নিতে পারছি না। ওর যদি আমাকে ভালো না লাগে সে কথা বলতেই পারে, তাতে অন্তত কষ্টটা কম হবে। ও কেন রোজ রোজ অফিস থেকে আগে আগে পালিয়ে যাচ্ছে জানি না। অফিসে তো ওর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়। কথা আমি বলতে পারি, কিন্তু ভয় হয় কথায় কথায় যদি ঝগড়া শু(হয় তাহলে তো খুব কেলেঙ্কারি। ঝগড়া করার মতো মানসিকতা অবশ্য আমার নেই কিন্তু ইদানীং ওর বিরহ আমার সবকিছু এলোমেলো করে দিচ্ছে। আমাকে যদি এভাবেই পরিত্যাগ করবে তাহলে কেন, কেন আমাকে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখাল। এখন আমি কোথায় যাই।

আমি জানি ওর স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে — সব আছে। আমি তো ওদের কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিইনি। শুধু সন্ধেবেলা কয়েকটা ঘন্টা ছিল আমার প্রার্থনা। ওর কাছে থেকে কত কিছু চেয়েছিলাম, কিছুই তো আমাকে দেয়নি। নিজে থেকেই ওর কাছে আমি সমর্পিত হয়েছিলুম। ও বলেছিল হবে, হবে। সে হবে-র আশ্বাসে নিজেকে সংযত রেখেছিলাম, ওকে বিশ্বাস করেছিলুম। আমার সঙ্গে সুদেব প্রতারণা করেছে, সে প্রতারণা সহ্য করতে পারছি না। আমি সব ভুলে যাচ্ছি, কোনো কিছু মনে রাখতে পারছি না। অফিস যাওয়ার সময় ভুল বাসে উঠছি, ফেরার সময় ভুল বাসে উঠছি, এভাবে বেশিদিন আমি বাঁচতে পারব না। এমন অনেক কাজ করেছি যেগুলো দেখে অফিসের লোকজন অবাক হচ্ছে। একদিন তো সেনবাবু এসে বললেন, মিসেস দাস, আপনি এরকম রোজ রোজ একা একা হাসেন কেন? আমি একা একা হাসি নাকি? কই সেটা তো আমি জানি না।

তাহলে কি আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমি তো পাগল হতেই চাই। সুদেব তুমি না বলেছিলে এই পাগলিটা তোমার মনের মতন।

হ্যাঁ সুদেবকে আমার চাই। জানি ওর স্ত্রী আছে - আছে ওর ছেলেমেয়ে, সব আমি জানি। আমি তো সুদেবকে ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছিনা। জানি সুদেব ওদের ভালবাসে ওরাই সুদেবের জীবন।

সেখানে তো প্রবেশের কোন চেষ্টাই আমি করিনি। আমি শুধু ওকে একজন ভালো বন্ধুর মতো পেতে চেয়েছি। আগে আমি অন্ধ ছিলাম। জীবনের ঘাত প্রতিঘাত কিছুই বুঝতামনা।

ন্যায় অন্যায় বোধ গুলো আমার কাছে স্পষ্ট ছিলনা। কাজের জগতে এসে অনেক কিছু শিখে গেছি। এখন আমি জেনেছি আপন স্বার্থের খাতিরে সব মানুষই সব অন্যায়কে ন্যায়ের নামাবলি চাপিয়ে দেয়।

সব মেয়েদের দেখছি-মুখে নীতিকথা বলে — আর সুযোগ পেলে পু(ষ বন্ধুদের গায়ে ঢলে পড়ে।

কে অন্যায় করে না। বড়বাবু যখন আমাকে প্রমোশনের লোভ দেখায় আর লোভি চোখ দুটো আমার বুকের উপর রাখে তখন কি আর আমার কিছু বুঝতে বাকী থাকে।

কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় সেটা বুঝতে আর আমার অসুবিধে হয়না। অসুবিধে হয় শুধু মুখ ফুটে কথা বলতে না পারায়। এই অফিসে কতো যে নষ্টামি আছে তা বলে শেষ করা যাবে না। কোন রকম নষ্টামিই আমার চোখ এড়ায় না। শুধু পু(ষ নয় মেয়েরাও এই নষ্টামির শরিক।

আমার তো অপরাধ কেবল সুদেবকে পেতে চাওয়া। আমি তো কারো পাকা ধানে মই দিই-নি। কোনরকম নষ্টামি করছি বলেও আমি মনে করিনা।

হ্যাঁ সকলে বলে বটে পরপু(ষের সঙ্গে সম্পর্ক অনৈতিক। কিন্তু কে সেটা মানে। আমি তো কাউকে দেখতে পাইনা। সকলেই সুযোগ পেলে অন্যের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক রাখছে। আমি যেহেতু মুখ তুলে কথা বলতে পারিনা, পারিনা সাহস করে চাইতে তাই কি সবার এতো হিংস্রতা। হয়তো আমাকে সব পরাজয় মেনে নিতে হবে। তবু আমি হাল ছাড়বোনা। এমনিতেই আমি মরে আছি। নতুন করে মৃত্যু আর কি হবে।

আমার সবচেয়ে বড়ো বাধা ঠিক মতো সাজিয়ে কথা বলতে না পারা। যদি সুদেবকে বুঝিয়ে বলতে পারতাম নিশ্চয় তাহলে সুদেব বুঝতো।

এখন যা কিছু হোক না কেন আমাকে ওর সব কথা মেনে

নিতে হয়। ওর কোন কথাতেই আমি না বলতে পারিনা।

আমি যে ওর কাছে সমর্পিত সে কথা পর্য্যন্ত বুঝিয়ে বলতে পারছিনা। কেবলি আমাকে আশ্বাস দেয় — হবে পৃথা সব হবে। একটু সবুর করো। আর কতো সবুর করবো। আমার শরীর প্রতিদিন আগুনের মতো জ্বলতে থাকে। সহ্য করতে পারিনা, একেবারেই সহ্য করতে পারিনা। কিন্তু শরীরের এই আগুন নিয়েই প্রতিদিন আমাকে বেঁচে থাকতে হয়।

জানি এ আগুনে পুড়তে পুড়তেই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে, তবু হাল আমি ছাড়বো না। সুদেবকে ছেড়ে দিলে আমি বাঁচবো কি নিয়ে।

হ্যাঁ বিপর্যয়ের কথা ভেবে সুদেব আমাকে শান্ত থাকতে বলেছে। কিন্তু সুদেবকে না পাওয়ার চেয়ে বড়ো বিপর্যয় আর কি হতে পারে।

কোন কিছুর বিনিময়েই আমি সুদেবকে ছেড়ে দেবোনা, দেবোনা, সুদেব তোমাকে আমার চাই। সে জন্য যেকোন বিপর্যয় মেনে নিতে আমি প্রস্তুত। এই অবস্থায় হঠাৎ কয়েকদিন যাবৎ দেখছি-সুদেব কিছুতেই আর আমার সঙ্গে দেখা করছেনা। তাহলে কি সুদেব আমার জীবন থেকে সরে গেল। এই সরে যাওয়া কি চিরদিনের জন্য?

যে পাগলীটা ছিল তোমার মনের মতন, যাকে তুমি নিজের হাতে গড়েছ — যে ফুলটা শুধু ফুটে উঠেছে তোমারি জন্য — আজ তার দিকে ফিরে তাকানোর সময় তোমার নেই। তোমার সামান্য হাতের ছোঁয়াতেই কতোবার কেঁপে উঠেছি — নির্লজ্জের মতো চেয়েছি ধরতে তোমার হাত, বারবার সন্তর্পনে কেন যে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছ সে কথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনা।

কোনদিন আপন স্বামীকে দেওয়ার জন্য যে আগ্রহ আমার ছিল না তোমাকে তা দেওয়ার আকুলতা বুঝতে পারনা এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করবো।

সুদেব আমার শুধু মন নয় — শরীরও তোমাতেই সমর্পিত। তুমি চাইলেই কোন কলঙ্কের ভয়ে আমি তোমাকে ফেরাবো না। বুঝতে পারি সে সবের ভয়ে তুমি গুটিয়ে থাকো, কই আমি তো এখন আর পরোয়া করিনা।

চোখ তুলে কখনো তাকাতে পারতাম না — এখন পারি। আমার তাকানো দেখে বুঝতে পারি অনেকেই এখন ভয় পায়। আমার কাছাকাছি আসেনা। যা কিছু করার দূর থেকেই করে। আমার এই সাহসী আচরণ — সে তো কেবল তোমারি জন্য।

পৃথিবীর সমস্ত অবহেলাই আমি সহ্য করতে পারবো। পারবো না সইতে শুধু তোমার অবহেলা। সুদেব আমি পাগল হয়ে যাবো। বাঁচাও, আমাকে তুমি বাঁচাও

ইন্দ্রাণী

আমি বসে আছি আমার কপাল হাতে নিয়ে। ঋতদা গেছে ওর মাকে নিয়ে রাঁচিতে, হাসপাতালে ভর্তি করতে। গত দুটি মাস কী অবস্থার মধ্যে যে আমাদের দিন কেটেছে তা ভাবলেই শিউরে উঠছি। শুনেছি জেলের মধ্যে মানুষকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। ঘরের মধ্যেও যে কাউকে শেকল বেঁধে রাখতে হয় তা দেখে চোখের জলে ভেসেছি। শুধু ভগবানকে ডেকেছি আর বলেছি এ শাস্তি কি আমার পাপের জন্যই তুমি ঋতদাকে দিলে। ওর মায়ের এ অবস্থা তুমি কেন করলে।

এর আগে কখনও কাউকে পাগল হতে দেখিনি। ঋতদার মাকে তো চোখের সামনে দেখলাম, উঃ, কী ভীষণ কষ্ট। একটা সুস্থ মানুষ কী অদ্ভুত আচরণ করছে। না দেখলে বিশ্বাসই করা যাবে না। তারপর যখন খুব বাড়াবাড়ি শু(হল তখন তো শেকল পরিয়েই রাখতে হল। একটা মানুষের (ণে (ণে কাঁদা, হাসা আর বীভৎস চোখ নিয়ে তেড়ে আসা দেখে একটুও ভয় পাইনি। বেদনায় আমার হৃদয়টা দুমড়ে যাচ্ছিল। ঋতদার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। বেচারা কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে মায়ের সেবা করছিল। কেন যে আমার নিজেকে কেবলই অপরাধী মনে হচ্ছিল জানি না। শুধু মনে হচ্ছিল আমার পাপেই ঋতদার মায়ের এই অবস্থা। আর দেখলাম বটে আমার মাকে। সেসময় আমার মা সব বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়ে দিনরাত শুধু ঋতদার মায়ের সেবা করেছে। তখন মনে হত আমার মায়ের দুটো সন্তান, আমি আর ঋতদা। কী অসীম মমতায় আমার মা যে এই বিপর্যয়ের মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমাদের সামলেছে তা সারাজীবনের মতো আমার কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।

আমি জানি ঋত-দার মায়ের মতো আমার জীবনেও নেমে আসছে বিপর্যয়। যে মানুষটার জন্য কখনও আমার মনে হয়নি আমি ও বাড়ির কাজের মেয়ে — আমাকে আপন করে গ্রহণ করেছে — বারবার বলেছে তোর কোনো চিন্তা নেই, সে অসহায় মানুষটা কী অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছে। আমি আর মা জানি আমাদের কাজের বাড়ির অভাব হবে না, তবু মা আর আমি গভীর সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। আমাদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, সেটা আমাদের কারণে নয়, কেবলমাত্র ঋতদার কারণে। ওর মা-র পাগল হওয়া আমার মা মেনে নিতে পারছে না।

আমি তো জানি যে পাঁকের মধ্যে থেকে এসেছি সেখানেই ফিরে যাব, কিন্তু ঋত-দা, সে কোথায় যাবে? একদিন আমি স্বপ্ন দেখতে শু(করেছিলাম ও আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে — আমি সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে ওকে সুখী করব। চারপাশের মানুষজনের ব্র(মাগত আনাগোনা আর কথাবার্তায় সে স্বপ্ন আমার মিলিয়ে গেছে। ইচ্ছে থাকলেও ঋতদা আমায় গ্রহণ করতে পারবে না। এ সমাজ, প্রতিবেশী মানুষজন — এতদিন যেসব নিকটজনের দেখা পাইনি — সেই সব নিকটজন, কেউ কিছুতেই ঋত আমাকে গ্রহণ করবে সেটা সহ্য করবে না। এ সমাজে কাজের মেয়ের সঙ্গে বাবুদের বিয়ে হয়। সেটাকে সবাই ভয়ানক কেলেঙ্কারি নামে অভিহিত করে। তারা বেঁচে থাকতে এটা তারা

ঘটতে দেবে না এটাই তাদের অভিমত। ও যেখানেই যাবে - সেখানেই একদিন আমাদের অতীত সামনে আসবে, তখন, তখন সকলেই ওকে আর আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলবে।

পৃথিবী জাতের বৈধতা স্বীকার করে, প্রেমের বৈধতা স্বীকার করে না। শ্রমের মর্যাদা নিয়ে ঋতদা কতদিন আমাকে সচেতন করেছে, আজ চারপাশের কথাবার্তায় বুঝতে পারি শ্রমেরও শ্রেণিবিভাগ আছে। কাজের মেয়ে সে শ্রেণিবিন্যাসে ভীষণ অন্তজ। তার অধিকারের সীমারেখা সমাজ স(ভু(র মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে।

প্রয়োজনে কাজের মেয়ের শরীর নিতে পারো কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি কোনোমতেই নয়। জানি নিজের সমস্ত ইচ্ছার বি(দ্ধে ঋতদা আমাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে এবং আমাকেও তা মেনে নিতে হবে। ঋতদা আমাকে বলেছে — ইন্দ্রাণী আমি প্রচণ্ড শঙ্কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি, যে কোনোদিন তোর আর আমার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে'।

আমি ওর একথা সম্পূর্ণ মেনে নিই-নি, কারণ বিপর্যয় আমার নয় — নেমে আসবে শুধু ওর জীবনে। আমি ফিরে যাব মায়ের সঙ্গে নতুন কাজের জগতে, দুবেলা দুমুঠো ভাতের চিন্তায় প্রেমের বিলাস আমার মন থেকে হারিয়ে যাবে। হয়তো অন্য পু(ষের শরীরের চাপে নিষ্পেষিত হতে হতে মনে মনে ওকেই ভাবব — সেটাই হবে আমার একমাত্র প্রাপ্তি।

ঋতবান

ঈ(রে স্থিতিশীল কোন বি(াস আমার নেই। তথাপি জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে ঈ(রকে স্মরণ করেই আপন অভিযোগ নিবেদন করতে হয়।

সামান্য পড়াশোনা করে জেনেছি এই সমাজ এবং তার সকল রীতিনীতি ধর্ম থেকে উদ্বুদ্ধ। ধর্মই জীবনের মূল চালিকা শক্তি(। সেই ধর্ম নাকি মানুষের জীবনে পবিত্রতা এবং শান্তি আনে।

আমার মা — যিনি জীবনে কোন অন্যায় কাজ করেননি, শান্তিপ্রিয় ধর্মভী(মানুষটি শুধুমাত্র জীবনের প্রয়োজনে সুখ চেয়ে যে পরিণতি পেল তা যে কোন্ ধর্ম বা ঈ(রের ক(ণায়, সে কথাই শুধু বুঝে উঠতে পারছিনা।

বুঝতে পারি মায়ের এই অবস্থার জন্য দায়ী আমাদের সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্মের তথাকথিত নিষ্ঠুর নিয়মাবলী। ঈ(র যদি সত্যি থাকেন তাহলে একজন অবলা নারীর প্রতি তার এই অকারণ নিষ্ঠুরতা মেনে নিতে খুবই অসুবিধে হচ্ছে।

বুঝতে পারি মায়ের চারপাশের লোকজন যারা আছেন — তারা কেউ সুস্থ মানবিক বোধের দ্বারা পরিচালিত নন। সকলেই আপন (ুদ্র স্বার্থের কারণে অন্যকে আহত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না।

নিজে যা পাইনি — তা অন্য কাউকে পেতে দেব না এই আপ্ত বাক্যকে জীবনের পরম ধন হিসাবে গন্য করে। বুঝতেই পারিনা প্রতিদিন কতো অমানবিক সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন পরিচালিত হয়।

এই অমানবিক মনোভাব আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিরাজ করে। ফলে কেউ কারোর কাছে মানবিক ব্যবহার পাইনা বা প্রত্যাশও করিনা।

আমার মা এই অমানবিকতার শিকার। জানি শুধু আমার মা নয় সমাজে আরো ল(ল(মা প্রতিদিন এই নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থার চাপে দিশাহারা। অদৃষ্টকে দোষারোপ করা ছাড়া অন্য কোন পথ তাদের জানা নেই মানুষ এখনো জানেনা কেমন করে সুখী হতে হয় বা কেমন করে সুখী করতে হয়।

আমার মায়ের মতো সহস্র সরল বোকা মা জীবনের অন্ধি সন্ধি কিছুই বোঝেনা। ফলে চতুর লোকদের ফাঁদে পড়ে নির্যাতিত জীবন হয় তাদের
সঙ্গী। আজ আমি নিজেও এই নিয়তির হাতে সমর্পিত। মা আর ইন্দ্রানী এই দুই নারীর সরলতার কারণে তাদের জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়।

সুদেব

একটা উড়ো চিঠি কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো আমার সমস্ত ভাবনাগুলো পরিবর্তিত করে দিয়ে গেল। ন্যায়, অন্যায়, বৈধ, অবৈধ এসব সম্বন্ধে আমার সাধারণ একটা যুক্তি(পূর্ণ মনোভাব থাকলেও কখনও গভীরভাবে বিষয়গুলো নিয়ে কারও সাথে আলোচনা করিনি।

পৃথার সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমার কাছে নতুন করে উঠে এল। স্বপ্নার সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্ক যখন শীতল হয়ে এসেছিল, তখন এক ধরনের হতাশা আমার মধ্যে জন্ম নিচ্ছিল। সেসময় পৃথার আবির্ভাব আমার কাছে ম(ভূমিতে মরূদ্যানের মতো। আমার সান্নিধ্য পৃথাও মরূদ্যানের মতোই মনে করতো। এই উড়ো চিঠি আমাদের দুজনকেই আবার নি(ে প করেছিল সেই ম(ভূমিতেই। স্বপ্নার সঙ্গে আমার মন মেলে না, শরীরের কোনো সম্পর্ক নেই, শুধু পাশাপাশি শুয়ে থাকার জন্য আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। জানি না এ সংসারে আমার মতো হতভাগা আর কোন পু(ষ আছে কিনা। গভীর রাত পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম আসে না, আমি জেগে অনড় শুয়ে থাকি, পাছে স্বপ্নার ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

পু(ষের যখন যৌন (ুধা জাগে সে তখন অর্থের বিনিময়ে কিনে নিতে পারে কোনো নারী শরীর, আমিও তা পারতাম। কিন্তু আমার সে রকম (চি কখনও হয়নি। জানি নারীর প্রতি প্রবল আকাঙ(া, তাকে কু(ি গত করার বাসনা, মানুষকে চতুর এবং মিথ্যেবাদী করে। আর যারা তা পারে না তারা বলপূর্বক অথবা অর্থ দিয়ে নারীকে কব্জা করে।

আমার (ে ত্রে এর কোনোটাই হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই

নিজেদের প্রয়োজনে আমরা কাছাকাছি এসেছিলাম। অবচেতনভাবে হয়তো শরীরের দুরন্ত পিপাসা আমাদের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করেছিল। তাসত্ত্বেও আমরা দুজনেই কিন্তু সংযত ছিলাম। অনেকদিন এমন হয়েছে যে পৃথা খুব ঘনিষ্ঠভাবে শরীরের খুব কাছাকাছি থেকেছে, তথাপি কষ্টে অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছিলাম। সে শুধু পৃথার স্বার্থের কথা ভেবেই। যখন ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তখন কল্পনায় ওর শরীরের কথা অনেকবার ভেবেছি। সেই ভাবনা আমার চেতনাকে উষ(করেছে। ওকে কাছে পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তারপর ওর সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর — সে সম্পর্কের মধুর দিকটা আমাকে বেশি অভিভূত করেছিল, নিজেকে ত্র(মশ ওর স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলাম।

সেজন্য পৃথার অনেক ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিইনি। আমার ভয় ছিল ওকে নিয়ে কোনো নির্জনতায় সময় কাটাতে গেলে শরীর আমার বশে না-ও থাকতে পারত। একবার শারীরিক সম্পর্ক হলে, আমাদের মধ্যেকার আড়ালটা সরে গেলে, আকর্ষণ কমে যাওয়ার ভয় আমার মধ্যে কাজ করছিল। ফুলটা ছিঁড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাসি করতে চাইনি। আমার ধারণা ছিল এই মধুরতার মধ্যেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো। ওর আজকের পরিণতি দেখে বুঝতে পারি ওর প্রত্যাশাটা ছিল অনেক বেশি। আমাদের সম্পর্কটা আমি নিজের মতো করে উপভোগ করতে চেয়েছি। কখনও ওকে জিজ্ঞেস করিনি আমার কাছে তুমি কি প্রত্যাশা করো। একটা জিনিস অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম ও আমার উপর নির্ভর করতে চেয়েছিল — আমারও ধারণা ছিল ওকে নির্ভরতা দিতে পারব। এখন স্বীকার করছি, আমার বয়স হয়েছে, কিন্তু এ সমাজের নির্মম দিকটা আমার দেখা হয়নি। প্রচলিত জীবনযাত্রার বাইরে কেউ কিছু পেতে চাইলে সমাজ তা মেনে নেয় না। সুখী থাকতে হবে সংকীর্ণ জীবনযাপনের মধ্যে।

পৃথা পাগল হয়েছে — বাকি জীবন আমি পাগল না হলেও সুস্থ জীবন যাকে বলে তা পাব কি। আমি জানি আমি তা পাব না। আমার সবচেয়ে বড়ো সান্ত্বনা পৃথা, সে যেখানেই থাকুক্ মনে মনে আমি সারা(ণ তার সঙ্গেই বিহার করব। তাকে কিছু দিতে পারিনি, আমার জীবনকে সে-যে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে, সেটা তো কোনোদিন আর ভুলতে পারব না।

অফিস থেকে অন্যদের সঙ্গে পৃথাকে রাঁচি নিয়ে যাওয়ার আগে আমিও দেখতে গিয়েছিলাম। সবাই আহা-উহু করছিল। আমি ভেতরে ভেতরে চোখের জলে ভাসছিলাম। বুঝতে পারছিলাম আমার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। পৃথার ওই অবস্থা দেখে সশব্দে কাঁদিনি কেন সেটাও অবাক হয়ে ভাবি। আমি জানি আমার অপরাধের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। পৃথিবীর কোনো আদালতে আমার বিচার হবে না। আমি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখে কালাতিপাত করব আর আমারই মনের খিদে মেটাতে গিয়ে একজন নিরপরাধ নারীকে ভোগ করতে হবে আমৃত্যু নরকযন্ত্রণা।

আমার স্ত্রীর অবহেলা আমার শরীর আর মনকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল, নিজেকে নিষ্পেষিত মনে হত। আমার মনের আর শরীরের একটা জানালার দরকার ছিল, যেখান থেকে সুন্দর করে বেঁচে থাকার একটা রসদ খুঁজে পেতাম। পৃথার সঙ্গে আমার কোনো শারীরিক সম্পর্ক হয়নি, তবু সারাজীবন পৃথাই থাকবে আমার মানসিক সঙ্গী। ওর শারীরিক সৌন্দর্যের আকর্ষণেই ওর প্রতি অনুরাগ জন্মেছিল, কিন্তু সে অনুরাগ শরীরেই সমাপ্ত হয়নি তা পৌঁছে গেছে আমার মনের গভীরে।

স্বপ্না যদিও এখন আমার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার করে, মাঝে মাঝে শরীর মেলে দিতে চায়। হয়তো ও বুঝতে পেরেছে ওর কোথাও ভুল হয়েছে। আমার ভুলের যেমন কোনো সংশোধন হবে না তেমনি ওর ভুলেরও আর কোনো সংশোধন হবে না। এখন আমার সমস্ত মন জুড়ে থাকবে পৃথা, সেখানে কেমন করে গ্রহণ করবো স্বপ্নার শরীর। স্বপ্নার শরীর পাশে নিয়ে শুয়ে থাকি, কোনোরকম উষ(তা আমি অনুভব করি না। শুধু শরীরের প্রত্যাশী তো আমি নই। কিন্তু আমাকে বাঁচতে হয় শরীর নিয়ে। বলতে ইচ্ছে হয় দুটো লাশ পাশাপাশি শুয়ে থাকে, একজনের মন অন্য নারীর দিকে আরেকজনের জানি না কোন্‌দিকে। শুধু বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে থাকতে হয়। আমি আমার অসারতা নিয়ে বেঁচে থাকি।

ঋতবান

আজ মাকে হাসপাতালে দিয়ে ফিরে এসেছি। ওটা কি একটা হাসপাতাল। সবাই বলে মানসিক রোগীদের জন্য হাসপাতাল। লোকে তো হাসপাতালে যায় চিকিৎসার জন্য। আমার মাকেও দিয়েছি চিকিৎসার জন্যই। কিন্তু হাসপাতাল থেকে তো মানুষ ফেরে হয় সুস্থ হয়ে না হয় মৃত্যু নিয়ে। ওখানকার যা পরিবেশ দেখলাম, তাতে তো আমার মনে হল মা যতদিন বাঁচবেন মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়েই বাঁচবেন। মাত্র কয়েকদিন ছিলাম তাতেই আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি। ডাক্ত(ার, নার্স এবং আরও অন্যান্য স্টাফরা কী করে এই পরিবেশে কাজ করে তা ভেবেই শিউরে উঠছি।

শেষপর্যন্ত চাইনি আমার মা ওখানে থাকুক। কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে আসার কোনো উপায় ছিল না। ওই যন্ত্রণার মধ্যে, নরকের মধ্যে, মৃত্যুর মধ্যে মা-কে একা ফেলে আমি চলে এসেছি সুস্থ জীবনের প্রত্যাশায়। আমার দুঃখিনী মা, যাকে সুখী দেখতে চেয়ে মায়ের সবকিছু মেনে নিচ্ছিলাম তাকে ঠেলে দিয়েছি নরক আর মৃত্যুর দিকে।

আমি যদি আমার মায়ের স্বপ্ন দেখায় বাধা দিতাম, যদি বলতাম, মা তুমি বিধবা, একবারের বেশি প্রেমে পড়ার অধিকার তোমার নেই, যদি বলতাম বদনাম শুধু তোমার নয়, তোমার ছেলেরও, তাহলে, তাহলে কি আমার মা-র এই অবস্থা হত। আমি কেন মা-কে সুখী দেখতে চেয়েছিলাম। মা-ই তো আমাকে

সুখী দেখতে চাইবে। আমার সুখের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করবে, নিজেকে রাখবে জনম দুঃখিনী, এটাই তো সামাজিক নিয়ম। আমার মা কেন এই সামাজিক নিয়মটাকে মেনে নেয়নি, সে কেন আত্মসুখের জন্য ভালোবাসার অবৈধ জানলা খুলতে গিয়েছিল। আমার অবলা মা, বোকা মা জানত না আত্মর(ার জন্য পু(ষের হাজারটা দরজা আছে। বিপদ বুঝলে সে পালিয়ে বাঁচে।

আমার সঙ্গে সুদেববাবুর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। অসহায়ের মতো আমার হাত ধরে উনি কান্নাকাটি করেছিলেন। এটা আমি সুদেববাবুর ব্যক্তি(গত দোষ হিসাবে দেখছি না। ঈশ্বর নাকি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে এই অবৈধ ভালোবাসার মতো আবেগ তিনি মানুষকে কেন দিয়েছেন। আর যদি দিয়েই থাকেন তাহলে নারীকে কেন এই অবৈধ ভালোবাসার বলি হতে হয়। সমস্ত কলঙ্কের ভাগীদার হয় কেবল নারী।

আমার বুদ্ধি দিয়ে অনেক কিছু বুঝতে পারি না। যেমন অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি কে আমাকে উড়ো চিঠি দিয়েছিল। সে কী চেয়েছিল। সুদেব বাবুর স্ত্রীকেই বা কে দিয়েছিল উড়ো চিঠি। আমার মায়ের অপরাধের কথাও সকলকে জিজ্ঞেস করেছি। জানি না আমার পাগল মায়ের অবস্থা দেখে কিনা, মায়ের অপরাধের কথা কেউ বলেনি, বরং আমার নতমুখী মায়ের সকলেই প্রশংসা করেছে। শুধু একজন, মাত্র একজনই আমার হাত ধরে স্বীকার করেছে, মায়ের এ অবস্থার জন্য তিনিই দায়ী। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তিনি আমায় বলেছেন ঋত, তুমি আমায় হত্যা করো, হত্যা করো, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্।

আমি বুঝেছি শুদ্ধ ভালোবাসার যন্ত্রণায় উনি দগ্ধ হচ্ছেন। বিবাহিত মানুষের অন্য কোনো নারী বা পু(ষকে ভালোবাসার অধিকার নেই। তিনি সেই অধিকারের সীমা লঙঘন করেছেন তাই বারবার আমাকে বলেছেন আমাকে হত্যা করো, হত্যা করো। আমি পাপমুক্ত(হই।

কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য সে বিচার করার বোধ এখনও আমার জন্মায়নি। সে বিচার করতে আমার মনও চায় না। পাপ-পুণ্যের বিচার করতে করতেই মানুষের অর্ধেক জীবন শেষ হয়ে গেল। কোনো সিদ্ধান্তে আসা গেল কি? আমি বি(াস করি যতদিন মানুষের মন থাকবে সে মুক্ত(আকাশে বিহার করতে চাইবেই। শেকল দিয়ে শরীরকে আমরা বাঁধতেই পারব, কিন্তু মন, তাকে কেমন করে বাঁধব?

কামনা বাসনা সুস্থ মানুষের নিত্য সঙ্গী। যারা জোর করে এটা দূরে সরিয়ে রাখতে চায় প্রকৃতি খুব সহজে তাদের একাজ মেনে নেয় না। সেজন্য প্রায়শই মানুষকে বিচ্যুতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। শরীর দিয়ে আমরা সবকিছু ছুঁতে পারি না, মন দিয়ে ছুঁতে তো কোনো অসুবিধে নেই। সেটাকেও যারা পাপ মনে করে তারা তো নিজেদেরই ঠকায়। নিজেকে কষ্ট দেওয়ার একটা সামাজিক অনুশাসন আমরা মেনে চলি। এটা এখন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এই প্রচলিত অভ্যাসের বাইরে কেউ যেতে চাইলেই সমাজের স্বঘোষিত মাতব্বরেরা (যারা সর্বশক্তি(মান) তর্জনী তুলে নিয়মিত শাসন করে। সেজন্য প্রেমের (ে ত্রে সব মানুষকেই গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে হয়, হোক না সে প্রেম বৈধ অথবা নিষ্কাম।

এই গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে হয় বলে প্রেমকে মানুষ পাপ মনে করে। আমার মা প্রেমকে পাপ মনে করেছেন। আমরা তো ভালোবাসি নিজের তৃপ্তির কারণেই, সেখানে অকারণ মহত্ত্ব আরোপ করে বড়ো হতে চাওয়ার তো কোনো প্রয়োজন নেই।

এই যে বাঁচা কখনও ভেবে দেখেছি কি নিজেদের ইচ্ছা মতোই আমরা ঠিকঠাক্ বাঁচি কিনা। বুঝতেই পারি না অন্যদের ইচ্ছা মতন অদ্ভুত সব সামাজিক নিয়মের হুকুম মতো আমাদের বাঁচতে হয়। কোনোদিন অনুসন্ধান করে দেখিনি এসব অদ্ভুত নিয়মের মধ্যে শেকল পরে বাঁচব কেন। একজন সাধুর হঠাৎ পদস্খলন হয়, সে কিশোরীকে ধর্ষণ করে, একজন কবি হাতে তুলে নেয় কলমের বদলে অস্ত্র, একজন খুনি অস্ত্র ছেড়ে কলম হাতে কবি খ্যাতির অধিকারী হয়।

মনের এই যে বিচিত্র গতি, আমার তো এটাকেই স্বাভাবিক মনে হয়। অথচ মানুষকে ছকের মধ্যে বেঁধে ফেলার কত শৃঙ্খলই না মানুষ বানিয়েছে। এই সমাজে আমরা সম্ভ্রমহীন — মে(দণ্ডহীন হয়েই বেড়ে উঠি। অপালার আচরণ আমার সম্ভ্রমহীন মনে হয়েছে। উড়ো চিঠির লেখকদের মে(দণ্ডহীন মনে করি। আমার নিজের দ্বিধাময় আচরণও আমাকে শঙ্কিত রাখে। সামান্য সংখ্যক মানুষ ছাড়া বেশিরভাগ মানুষই মনের দিক থেকেও খুব সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বিচরণ করে। পরিবারের বাইরে কোনো মানুষকেই আপন ভাবে না। বহু মানুষ আছে আপন স্ত্রী-পুত্র ছাড়া এমন কি মা-বাবাকেও বোঝা মনে করে। পরিজনদের স্বার্থের কথা ভাবে এমন মানুষও খুব কম। এব্যাপারে যখনই কেউ প্র(্ন করে তখন স্বীয় যুক্তি(কেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। বেশিরভাগ মানুষের ন্যায় অন্যায় বোধগুলো কেবলমাত্র স্বার্থের সঙ্গে সংগতি রেখে বদলে যায়।

ইন্দ্রাণীকে নিয়ে সুখী হওয়ার স্বপ্ন আস্তে আস্তে আমার কাছে অলীক হয়ে যাচ্ছে। সারাজীবন ওকে নিয়ে সুখী হওয়ার ভাবনা লুপ্ত হতে বসেছে। এমনও হতে পারে শেষপর্যন্ত ইন্দ্রাণী আমার জন্য অপে(া করতে পারল না। অথবা পরিস্থিতির চাপে আমি ওকে গ্রহণ করতে পারলাম না। সে(ে ত্রে আমিও তো সত্যবান থাকব না। সত্যবান মানুষ কি পরিস্থিতি অস্বীকার করতে পারে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে মেনে না নেওয়া মানুষকে তো নির্বোধই বলে।

আমি সাহসী নই — নির্বোধও নই, তাই নীরবে মায়ের বিপর্যয় মেনে নিয়েছি। মেনে নিতে হবে আমার এবং ইন্দ্রাণীর জীবনেও যদি নেমে আসে কোনোরকম বিপর্যয়। বেশিরভাগ মানুষের জীবনে বিপর্যয়ের মূল কারণ প্রেম। এই প্রেমের প্রত্যাশা যদি না থাকত, সমাজ আমাদের চাওয়া পাওয়ার ইচ্ছাগুলোকে

যেভাবে বেঁধে দিয়েছে সেভাবেই মন যদি গ্রহণ করত তাহলে কোনোদিন কোনো বিপর্যয় কারও জীবনে ঘটত না।

সুখী হওয়া কত সহজ, শুধুমাত্র মনের কারণে জীবনে তৈরি হয় নানা জটিলতা। মন যে কেন নিরন্তর ডানা মেলে আকাশে উড়তে চায় সে রহস্য কে জানে। এই অসীমের দিকে উড়তে চাওয়া মনগুলোর জীবনেই বারবার নেমে আসে বিপর্যয়।

আমার দুঃখিনী মা, সে তার মন নিয়ে উড়তে চেয়েছিল, একরাশ স্বপ্ন ছিল তার সঙ্গী। আকাশ তাকে নিশ্চয় কয়েকদিন আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু সে আকাশও তো হাজার বিধিনিষেধের জালে তার পরিধিকে সীমিত করে রেখেছে। সকলেই বলবে মা ভুল করেছিল — সে ভুলের শাস্তি সে পাচ্ছে। তার যদি ওড়ার ইচ্ছে না হত, যদি সে ডাল-(টির মধ্যে নিজের জীবনকে সীমিত রাখতে পারত, তাহলে তার জীবনে নেমে আসত না এত বড়ো বিপর্যয়।

বিপর্যয় তো শুধু তার জীবনে আসেনি, তার চারপাশের নিকটজনের জীবনেও নেমে এসেছে আংশিক বিপর্যয়। তারা হয়তো সে বিপর্যয় কাটিয়ে উঠবে। সকলেই হয়তো সবকিছু ফিরে পাবে, নিয়মের মধ্যে, শৃঙ্খলের মধ্যে, ধরাবাঁধা জীবনে সকলেই সুখী থাকবে। সুখী থাকাই তো একমাত্র কাজ। সময়ের স্রোতে সকলের মন থেকেই একদিন মুছে যাবে আমার মায়ের কথা।

আমিই শুধু মায়ের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে প্র(করব, মা কেন তোমার এত ওড়ার সাধ হয়েছিল, হাজার হাজার স্বামী হারা নতমুখী মায়ের মতো কেন তুমি নিরাপদ জীবন বেছে নিলে না, তাহলে তো এত বড়ো বিপর্যয় নেমে আসত না তোমার জীবনে।

ভালবাসা এবং নৈতিকতা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। কিন্তু কিছুতেই সিদ্ধান্তে আসতে পারিনা। কারণ ভালবাসার বিচরণ হলো অবাধ। সে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকে না। আজ যাকে ভালবাসে স্বার্থের পরিবর্তনের কারণে কাল তাকে ভালবাসেনা। সবচেয়ে বড়ো কথা মানুষের মন চিরকালই বৈচিত্রমুখি। একজনের মধ্যে সে ভালবাসার সব উপকরণ খুঁজে পায় না সেজন্য বিভিন্ন লোকের মধ্যে তার ভালবাসা ছড়িয়ে যায়। সে বিভিন্ন নারী-বা বিভিন্ন পু(ষের মধ্যে আপন তৃপ্তির সন্ধান করে। এটাকে ইংরেজিতে পলিগেমি বলে। এই পলিগেমি মানুষের সহজাত। এই সহজাত প্রবণতাকে (দ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে সামাজিক নিয়ম। এই সামাজিক নিয়মকে যে মানুষ অস্বীকার করতে চায় তার জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। প্রকৃতির নিয়মকে যে মানুষ অব(দ্ধ করতে পারেনা সমাজে তাকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়।

এটা সত্য যে সামাজিক শৃঙ্খলার কারণে বেশীরভাগ মানুষই প্রকৃতির প্রদত্ত প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে। কিন্তু যারা পারে না সমাজ এবং রাষ্ট্র তাদের শাস্তি দেয়।

আমার মা নৈতিকতার বেড়া ভাঙ্গার উপত্র(ম করেছিল, ফলে তার মনো জগতে যে আলোড়ন এসেছে তা তাকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ইন্দ্রানী যেহেতু অন্তজ সমাজের নারী যে জন্য সামাজিক নিয়মে অন্ত্যজ সমাজেই তাকে নিজের অবস্থান স্থির করতে হবে।

আমিও সেই নৈতিকতায় কোনরকম পরিবর্তন আনতে, পারবোনা। সমাজ আমার সে কাজ আপন স্বার্থেই সমর্থন করবেনা। সুতরাং ভালবাসা এবং নৈতিকতার সংঘাত অনিবার্য। সে সংঘাতে ভালবাসা বারবার পরাজিত হয় এবং নৈতিকতা জয় লাভ করে। ভালবাসার জয় গান চলে শুধু কাব্যে, সাহিত্যে সঙ্গীতে। জীবেন ভালবাসার স্থান বড়ো (ুদ্র। এইবোধ আমার মধ্যে এনেছে বেদনা, কিন্তু সে বেদনা মুক্ত(হওয়ার কোন উপায় নেই।

বেদনাময় জীবনই মানুষের চিরসঙ্গী।

তাপস বৈদ্য-র ৩টি কবিতা

শূন্যতা

অহেতুক দূরত্ব বাড়িয়ে নিলে মাঝখানে
জমতে থাকে হাজার বছরের শূন্যতা।
আকাশ শূন্যতার সঙ্গে প্রেম করে ঠিকই
তবে বুকে আগলে রাখা অনন্ত আকাশ
রঙহীন অসীম মেঘে আবিল করে মনপাশ।

রঙের অনুপস্থিতি মানেই অন্ধকার নয়,
শুধু তোমার সঙ্গে আর দেখা না হওয়া।

অনুমোদন

আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে মানেই
মনটাও যে বিপ্রতীপে ঘুরে গেছে তা
জোর করে মোটেও বলা যায় না বলে
জীবন সংসারে এত টানাপোড়েন...।

মনের গতিবিধি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা
সাধনা সাপে(। তাই কিছু বলার আগে
মনের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক।

ধ্যানবিন্দু

তোমাকে ছুঁয়ে থাকা একপ্রকার ধ্যান।
আমার ধ্যান ভাঙাতে তোমার পা
নূপুর স্পর্শ করলেই আমার জন্য
একটা অন্যরকম তাণ্ডব অপে(া করে।
তোমার চলে যাওয়ার পথচিহ্(
আমার অভিধানে নদীরূপ পায়।
ওপারে তোমার রাধা-জীবন
এপারের ধ্যানবিন্দুতে মিশে যেতে থাকে।

প্রকাশের পথে

মানসকুমার ঠাকুরের

কাব্যগ্রন্থ

কাঁচা মাটি

প্রকাশক
রোহিণী নন্দন
১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন, কোলকাতা - ১২
যোগাযোগ- ৯২৩১৫০৮২৭৬

BEEKAY IRON & STEEL

Specialists in Boiler Quality Platcs of all grades
Iron & Steel Merchants & General Order Supplier

27, Brabourne Road, 1st Floor,
Room No.- 106, Kolkata - 700 001 (W.B.)
(033) 4068-2089
(+91) 9831091765 / 933983215
E-mail: bekayironsteel@yahoo.com

ADVOCATE

ARUN KUMAR BHOWMICK

ADVOCATE
Calcutta High Court

MIBILE: 9830038790
TELEFAX: 25602531

63/21, Dum Dum Road, (Surermath),
P.S.- Dum Dum, Kolkata - 700 074
E-mail: arun_bhowmik@yahoo.com

RM ENTERPRISE

Mechanical & Civil Contractor

77/(48/A),
Dr. N.N. Bagchi Road,
Barrackpore,
Kolkata-700120

+91 8335003149
rmenterprise26@gmail.com

SHUKLA LIGISTICS PVT. LTD.

(an ISO 9001:2015 certified company)

Fleet Owners & Transport Contractor

93331595572
93310778988

83, Bentinkck Street, 1st Floor, Kolkata - 700 001

Tel.: 033-40725024

E-mail: ibmishra@suklalogistics.com

www.shuklalogistics.com

AFCONS

Shapoorji Pallonji

May Maa Durga illuminate your life
With countless Blessings of Happinesst
Joy and good fortune ....!!!

AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED
T-49B TUNNEL PROJECT

Village & Post Office- Nachlana Tehsil Khari, Distt- Ramban (J & K)

M/S. S. D. CONSTRICTION (PVT.) LTD.

AA-73, Salt Lane City, Sector-I,
Kolkata - 700 064

With Best Compliments from...

WELL WISHER

SUBHANKAR SAHA

With Best Compliments from...

WELL WISHER

Indranil Mukherjee

With Best Compliments from...

WELL WISHER

Arjun Chakraborty

Mr. K. G. Tripathi
M.Com, LLB

9836041430
9007373125

ADVOCATE
HIGH COURT
CALCUTTA

ADVOCATE

PROPERTY
CONSULTANT

Chamber at:

AB-130,
Street No. 92,
New Town,
Kolkata - 700163

With Best Compliments from...

WELL
WISHER

শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা অভিনন্দন

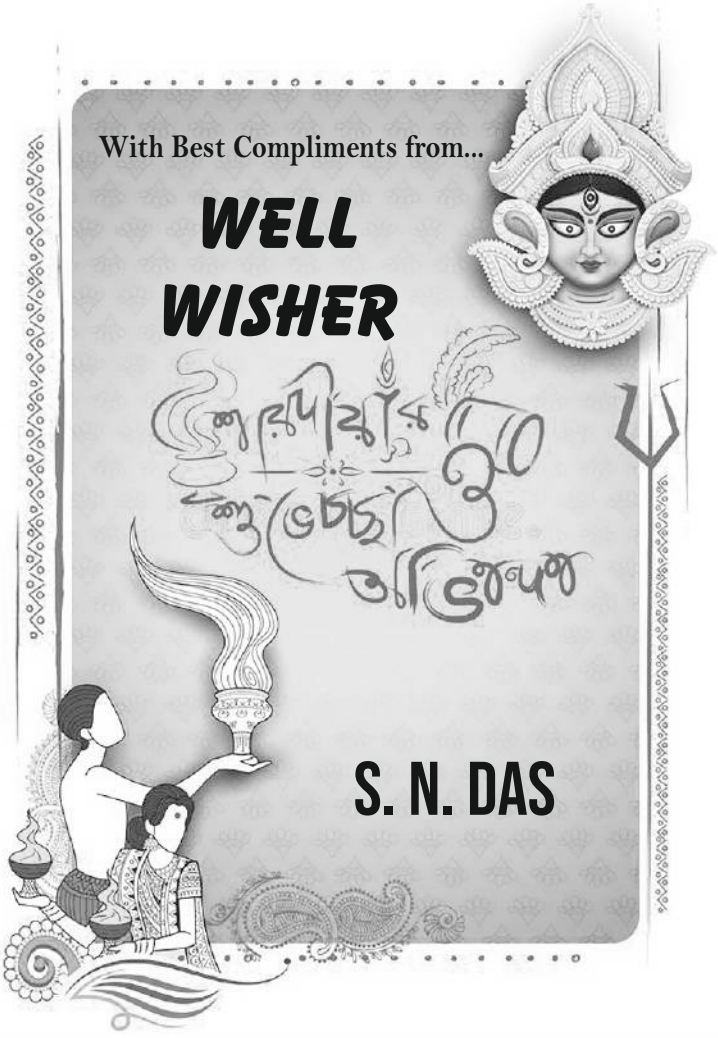

S. N. DAS

IIAS

INITIATE
IMBIBE
INSPIRE

With Best Compliments from...

WELL WISHER

ROYEL INFRA

With Best Compliments from...

WELL WISHER

KAUSHIK

প্রকাশের পথে

মধুমিতা বেতাল-এর উপন্যাস

জঙ্গলিপি

রীতা দে - এর

ভাগবতের গল্প

প্রকাশক
রোহিণী নন্দন
১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন, কোলকাতা - ১২
যোগাযোগ- ৯২৩১৫০৮২৭৬

মানসকুমার ঠাকুরের
এক অনন্য কবিতার বই

মানসী

প্রকাশক
রোহিণী নন্দন
১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন, কোলকাতা - ১২
যোগাযোগ- ৯২৩১৫০৮২৭৬

রূপকথা

এক নতুন পথ চলা।
আমরা ছিলাম, আছি ও থাকবো।
"বাংলা ভাষা ও বাংলার সংস্কৃতি"

প্রধান অতিথি

আয়েত্রী ঠাকুর

বিশেষ অতিথি

- স্বামী কৃপাকারানন্দ মহারাজ
সেবক রামকৃষ্ণ মিশন ,বারাণসী
- ড. সুজাতা বাগচী ব্যানার্জী
উপাচার্য মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়

অতিথি

- শান্তারাণী ঘোষাল
- নীতীশ বিশ্বাস
লেখক ও সমাজ ভাষা গবেষক
- অনুসুয়া মুখোপাধ্যায়
চলচিত্র ও থিয়েটার জগতের
স্বনামধন্য অভিনেত্রী

পরিচালক - মানস কুমার ঠাকুর

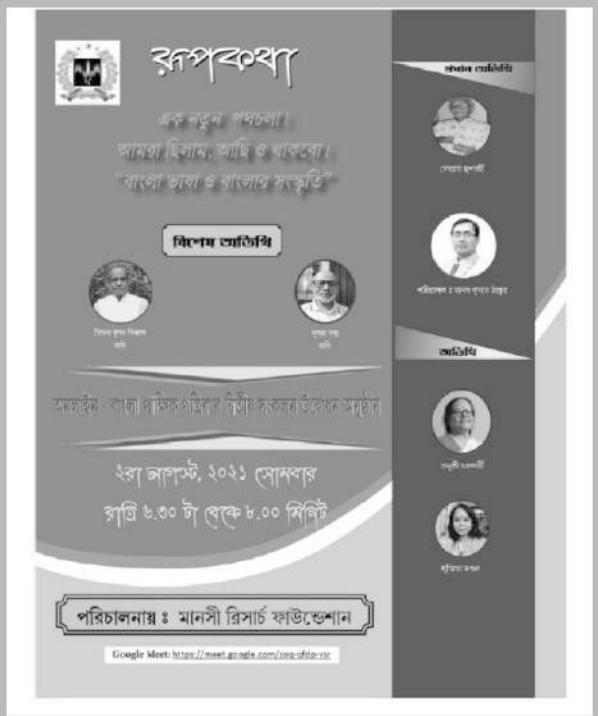

বিশেষ অতিথি

- বিমল কৃষ্ণ বিশ্বাস
কবি
- সুবল দত্ত
কবি

অতিথি

- তনুশ্রী চক্রবর্তী
- সুস্মিতা মন্ডল

প্রধান অতিথি

দেবব্রত মুখার্জী

পরিচালক - মানস কুমার ঠাকুর

রূপকথা

এক নতুন পথ চলা।
আমরা ছিলাম, আছি ও থাকবো।
"বাংলা ভাষা ও বাংলার সংস্কৃতি"

প্রধান অতিথি

সুবিমল সরকার

অতিথি

- বর্ণালী মুখোপাধ্যায়
- উপগুপ্ত বন্দোপাধ্যায়
- রামণীকান্ত পাত্র
- পূবালী চট্টোপাধ্যায়।

পরিচালক - মানস কুমার ঠাকুর

প্রধান অতিথি

পদ্মশ্রী ডঃ অজয় রায়
বিশিষ্ট বিজ্ঞানী

অতিথি

- দেবব্রত মুখার্জী
- বিমালেন্দু ব্যানার্জী
- প্রণব কুমার সেন
- দেবাশীষ চ্যাটার্জী।
- সমীর পন্ডিত
- অঞ্জন দে

পরিচালক - মানস কুমার ঠাকুর

প্রধান অতিথি

অভিনেতা শঙ্কর ঘোষ

অতিথি

- রীনা ভৌমিক
- নুরুল মোর্তাজ
- সৌমিত্র বিশ্বাস
- কৌশিক ঘোষ

পরিচালক - মানস কুমার ঠাকুর

অতিথি

- সুবল দত্ত
- তনুশ্রী চক্রবর্তী
- অতনু পাল
- মানস রঞ্জন দত্ত

পরিচালক - মানস কুমার ঠাকুর

Why Glides Only?

Glides is striving to bring about a systemic change in the commerce education by blending Commerce education with technology and professional acumen.

Commerce for us is not just a subject or a business, rather a Cause.

Vision:

To provide optimal solutions for all stakeholders involved in commerce domain.

Mission:

To be the most vibrant partners for Commerce Education in India by 2025

Glides Fintellect Pvt Ltd
CIN:U80902WB2021PTC247385
www.glidesfintellect.com
email:
glidesfintellect@gmail.com
info@glidesfintellect.com

Registered Head Office

22/4 Verner Lane
Belgharia, Kolkata-700056

Contact:9874081422,8918610280

Branch:

319, Asansol Sentrum Office Block,
Shristinagar,Asansol:713341

Glides Fintellect Pvt Ltd.

....Carving a distinctive Career in Commerce

'An investment in knowledge always pays the best interest.'
-Benjamin Franklin

Values

- Improving learning outcomes.
- Imparting Commerce education in socially desirable manner with strong moral commitment.
- Conceptualizing value education similar to value investing.
- Believe in Partnership with our employees, customers, Investors, governing councils and other stakeholders to strengthen the sustainability of the ecosystem.

TECHNOLOGY

Technology that removes structural barriers and mixes possible processes like adaptive learning, virtual classrooms online textbooks, repositories, rapid content under cloud based systems to store large amount of data.

CURRICULAM

Optimal Curriculum as per CBSE/ISC pattern for holistic development with

- Quality
- Material
- Lesson Plans
- Method
- Focus
- Assessment
- Goals

PHILOSOPHY

Mentoring Commerce Aspirants for the professional edge required for courses like CA, CMA,CS, CFA,CIMA and MBA from an early stage, for smooth progression from academics to profession.

DRIVING FORCE

- Professional Faculty-CA/CMA/CS
- Technology
- Content
- Delivery
- Hardware
- Service and support
- Feedback Sessions

ONE STOP SOLUTION

- Ease of Access
- Real Time Communication
- Career Counseling
- Parents Section
- Score Alerts
- E-Library
- Personalized Interaction
- Motivational Sessions
- Physical Classroom
- Tab Based Audio visual Content
- Scholarships
- ERP

ACADEMIC COUNCIL

To make our Approach more pragmatic and Comprehensive, we have teamed up with some of the most Eminent Educationists, Chartered Accountants, Cost Accountants, Company Secretaries, Doctors, Lawyers, Retired Bureaucrats and Industry Leaders in our Strive to Better the Best.....

GSM

Bharatiya Vidya Bhavan
Institute of Management Science, Kolkata

(Approved by ACITE & Affiliated to MAKAUT)

2 Years Full Time MBA

Eligibility

Graduates in any disicipline with valid MAT / JEMAT score

3 Years Full Time BBA

Eligibility

Cleared 12th Standard exams with valid CET score

For more information please call - 7003073066 / 8336068302 / 7596898015

Block - FA, Sector - III, Salt Lake, Kolkata - 700 097
E-mail: admin@bimskol.org, Website: www.bimskol.org

Manasi Research Foundation

Rupkatha
by monthly Magazine

Vocational Training
for
employment opportunity

Vision

Self Sustainable model within the backward class and under privilege citizen as well as need based people.

Mission

- To face the challenged and convert any threat to opportunity situation.
- Provide minimum educational support, soft skill and health awareness.
- Imparting appropriate academic training for specific needs.
- Appropriate Vocational skills to take employment opportunity as well as entrepreneurship.
- Create necessary social and physical support that empowers the people to lead a life of independence and dignity in adulthood.
- Provide motivational training for Self – Sustainability

Main Objects

Enhancement of all educational Research, Health research, Other Research and its evaluation as well as performance for the (a) Government, (b) Economy and (c) Society.

Income Tax benefit under: 80G , 12AA

REACH US
Website - http://manasiresearch.org
E-MAIL ID –
MANASIMRF2014@GMAIL.COM

"please join with us for the movement of capacity Building of Societ

THE INSTITUTE OF SKILLS

(Under Management and Control of Manasi Research Foundation)

ONLINE VOCATIONAL TRAINING CLASS / CLASSES

Employment after completion of course

Do the Best Exciting Careers 2021

SMART ACCOUNTANT	Huge demand in MSME
OFFICE MANAGEMENT PROCEDURES AND PROTOCAL	Office will not move without you
HOSPITALITY MANAGEMENT SERVICE	Business success depends upon – ethical and justifiable services
E-COMMERCE - BPO - KPO - LPO	Huge demand in India & Abroad
COMMUNICATION SKILL	Essentiality

Reach us

Website

www.manasiresearch.org

E-mail: manasimrf2014@gmail.com

Phone

7980272019 /9874081422

ADMISSION OPEN
1st November 2021

CLASS WILL START
January 2022

Build Your Capacity, Build your Career